এক

কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে কেষ্টদাস পালের স্ট্যাচুর নিচে চৌধুরী কম্পানির খেলার সরঞ্জামের দোকান। টেনিস র‍্যাকেটে তাঁত পরাতে দিয়েছিলাম। সেদিন বিকেলে ইডেন হিন্দু হস্টেল থেকে বিজয় আর আমি বেরিয়েছি ব্যাট আনতে। নিয়ে ফিরছি. ফুটপাথের পুরোনো বইওয়ালা ইয়াকুব হেঁকে বলল,

—লাণ্ডর এসে গেলো এক কাঁপি।

ইয়াকুব পুরোনো আলাপী। ল্যাণ্ডরের সিলেক্‌সনস্ খোঁজ করতে বলেছিলাম ওকে। পেয়ে গেছে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাতা ওলটাচ্ছি। বিজয় ছোঁ মেরে বইটা নিয়ে Ianthe প্রশস্তি বার করে পড়ল—

There is flower I wish to wear,
But nor until first worn by you—
Heartsease-of all earth's flowers most rare ;
Bring it ; and bring enough for two

ওঃ! নিয়ে নে, নিয়ে নে। কিন্তু ছেঁড়া যে রে! পেছনের পাতা আবার উইয়ে খাওয়া—

ইয়াকুব বলল,—লেকিন আস্‌লি মাল। পোঁকে কাট্‌ল বলেই ত কদর কিতাবের, বিলকুল খানদানী চীজ্। দেখেন না কোন পুরানা মালিক কেৎনা পেন্‌সিল লোট লিখেছে মারজিন মে। ইয়ে বটতলাকা হালি কিতাব থোড়াই আছে. একদম ম্যাক্‌মিলান কী মাল। কেয়া বঢ়িয়া ফোটো এন্‌গ্রাভুর—

বিশবছরের ওপর কলেজ পাড়ায় পুরোনো বইয়ের ব্যবসা করে ইয়াকুব ইংরেজি বুক্‌নি, বিলিতি প্রেস্ পাবলিশারের নাম, উড্‌কাট, লিথোপ্রিন্ট, ফোটো এন্‌গ্রাভুরের বৈশিষ্ট্য, কোন সওদার কি চাহিদা, অথরের ঠিকুজি সব ওয়াকিবহাল হয়ে গেছে। বলল,

—একঠো রুপেয়া বখ্‌শিশ মিলে বাবিকদার, মেহন্নৎ কা সওদা—

পকেটে হাত দিতে যাচ্ছি। ইয়াকুব চোখ টিপ্‌ল। আড় চোখে দেখি একটা রোগা পট্‌কা মুসলমান ছোঁড়া—কানে বিড়ি মুখে সান গ্লাস—রকের ওপর জুত করে বসল। বুঝলাম। বিজয়কে বললাম।

—জিজ্ঞেসানন্দ, দু'আনা পয়সা দে ত।

বিজয় এমনিতেই হাড় রোগা, তার ওপর একমাথা ঝাঁকড়া বাবরি চুলের ভারে বেঁকে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো হয়ে গেছে। ওকে সহপাঠীরা হয় কবি, না হয় জিজ্ঞেসানন্দ বলে ডাকে।

হুঁশিয়ার ছেলে বিজয়, কবি হলে কি হয়। পাঞ্জাবির নিচে ফতুয়া, তার বুক পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে বলল,

—সেদিন একটা, আজকে একটা, দুই অধুলিতে মিলে একটঙ্কা পুরোপুরি হোলো, বুঝলে দাঁড়ি বাবাজি।

আমি শুধু রোগা নই; বে-মানান ঢ্যাঙা। তবে তির্‌তিরে সোজা। হস্টেলে আমার চলতি নাম থেমে থাকলে দাঁড়ি, হাঁট্‌লে চিম্‌টে।

ইয়াকুবের দাম মিটিয়ে ধীরে সুস্থে রকে বসা কানে-বিড়ির কান টেনে উঠিয়ে দিয়ে বললাম,

ইয়াকুব, রুমালটা নে ত ছোঁড়ার তলা থেকে—

দু'টি ডবল পয়সা বাঁধা রুমাল সব শার্টের সাইড পকেটে রাখতাম, বিশেষ করে বিকেলের ভিড়ে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে বেরো-নোর সময়। অল্পসল্প রেস্ত কাছার খুঁটে বেঁধে রাখতাম। আজ পর্যন্ত রুমাল খোয়া যায় নি। এই প্রথম জবর হাত সাফাইয়ের কসরত

দেখিয়ে ঐ ছোঁড়া রুমাল সরিয়ে তাই পেতে রকে বসে ছিল। মনে মনে তারিফ করলাম ছোঁড়াকে, ইয়াকুব ইশারা না করলে ধরতেই পারতাম না।

এমন আচমকা ধরা পড়বে, ছোঁড়া ভাবে নি। ওরও মনে হলো শাগরেদির মেয়াদ চলছে, পোক্ত হয়ে ওঠে নি। থতমত খেয়ে তোৎলাতে লাগল।

—হেই বাবা, আমি কুছ্-ছু জানে না। রুমালটা পাকিট্‌সে আপ্‌সে পড়ে গেলো, আমি কুছ্ না জেনে বইঠ্‌লাম তার উপর—হেই বাবা—

দেখলাম ছোঁড়ার বাঁ চোখ কানা, বাঁ হাতটাও অকেজো, মুড়িয়ে ওপর হাতের সাথে জোড়া, নামাতে পাঁরে না। এক চোখ, এক হাতেরই দৌড় এত।

ইয়াকুবকে সুধোলাম,

—কি করি রে এটাকে নিয়ে?

—লিয়ে যান, সাঁথে লিয়ে যান। স্-আলা হারামি আছে। আমি কেতো চোখ মারছি, থামুশ—ব্যাস রোখ্ যা, জেব্‌পর হাঁথ ডালিস না,—তা শুন্‌ল নেই। এখন লিয়ে যান খোকাবারিকে—

ইডেন হিন্দুকে খোকাবারিক, হার্ডিঞ্জকে জামাইবারিক আর মিলিটারী মেডিক্যালস্‌কে গোরাবারিক বলত তখনকার ফুটপাথের দোকানদারেরা।

—সেই ভালো। বলে ছোঁড়ার ডান কব্জি পাক্‌ড়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে প্রেসিডেন্সী কলেজের গেটে ঢুকে পড়লাম আমরা। নন্দলাল, আমাদের দারোয়ান, খাটিয়া পাতবে বলে জলের ছিটে দিচ্ছিল ভুঁয়ে। এক নজর দেখে নিজের কাজে মন দিল। আজ মনে করতে কষ্ট হয়, পরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় নন্দলাল খুন হয়েছিল।

গেট দিয়ে ঢুকে সে আমলে ডাইনে কলেজ, বাঁয়ে হেয়ার স্কুল

ছিল। লাইব্রেরীর কাছ বরাবর অ্যাসট্রলজির ল্যাবরেটরি, পেছনে টেনিস মাঠ, তার পর ছিল ছোটোখাটো ফুটবল মাঠ বেকার-ল্যাবরেটরির উত্তরে। তার পশ্চিমে বোধহয় রামকমল সেন স্ট্রীট আর তার পশ্চিমে গ্যাড়াতলা পার্ক—এখন বুঝি মহম্মদালি পার্ক। পার্কটা রাস্তার লেভেল থেকে উঁচু, ওখানে বস্‌লে ইডেনের দু' নম্বর ওয়ার্ডের ঘরগুলো দেখা যায়। হালে অনেক অদল বদল হয়ে গেছে প্রেসিডেন্সীর ভেতরটা।

ছোঁড়াকে নিয়ে আমি আর বিজয় গ্যাড়াতলা পার্কের একখানা বেঞ্চিতে বসলাম। সুধোলাম,

—কি নাম তোর ?

—ফজল।

এক নিশ্বাসে দেদার প্রশ্ন করে গেলাম দু'জনে। বাড়ি কোথা, কে কে আছে, কি কত্তিস্ আগে, কদ্দিন এ লাইনে এসেছিস্,—

একটিরও জবাব পেলাম না। বিজয় বলল,

—চ' তবে দরোয়ানের জিম্মা করে দিগে। নন্দলাল ত রেতে গেট ছেড়ে বেরোতে পারবে না; ভোর নাগাদ পুলিশে হ্যাণ্ডোভার করে দেবে। তামাম রাত সিদ্ধিঘোঁটা ডাণ্ডা দিয়ে তোকেও ঘুঁটবে। সে বেশ হবে।

হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল ছোঁড়া। সব ভাঁওতা, এক ফোঁটা জলও বেরোয়নি চোখ দিয়ে। কিন্তু বিজয় কবি মানুষ, নিপীড়িতের দুঃখে বিগলিত হৃদয়। যেন অপ্রতিভ হয়েই বলল,

—দে তবে ছেড়ে। কি আর হবে—

—থামলি তুই ? ধমকে উঠলাম আমি। ছোঁড়াকে বললাম,—এই ফজ্‌লে, শোন। তোর ডেরা দেখিয়ে নিয়ে এলে তবে ছাড়ান পাবি। চ', কোথায় থাকিস তুই, দেখে আসব।

—সেখেনে আপনারা যেতে পারবেন না।

—কেন ? সেখানে কি ?

—বস্তি হুজুর, নোংরা বস্তি। রাজাবাজারের আগখানটায় যে কেরেস্তান হস্টেল আছে, ওয়াই-এম-সি নাকি, তার সামনে কালোয়ার পাড়া। তারই পেছনে বস্তির মধ্যে লেংড়ি বিবির আস্তানা। সেইখেনে থাকি হুজুর।

বুঝলাম মেছোবাজার ওয়াই-এম-সি-এর কথা বলছে। পেত্যয় হলো। তবু বললাম,

—ঠিক বলছিস ত?

—সাচ্ বাত হুজুর।

—আচ্ছা, যাব'খন একদিন। আজ সন্ধে হয়ে এল। হস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

টেনিস র‍্যাকেট আর Landor বেঞ্চিতে রেখে, কাছার খুঁট খুলে, দুটি সিকি বার করে ফজলকে দিলাম। বললাম,

—একটায় গোস্ত্ রুটি খাস্, একটা বাড়িউলিকে দিস্। আর শোন্, কখনো কারো পকেট মারিস্ নে। বিকেলে ঐ হোতা আসিস্ খেলার গেন্দা কু-ড়াবি, রোজ চার আনা করে পাবি বুঝলি?

বলে কলেজের টেনিস মাঠ দেখিয়ে দিলাম।

খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে ছোঁড়া এইবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এবার মেকি নয়, ঝরঝর করে জল পড়ছে চোখ দিয়ে। কানা চোখটায় দেখতে হয়ত পায় না, কিন্তু কাঁদলে ঠিক জল বেরোয়। সিকি দুটো নেবার লোভে আদৌ হাত বাড়ায় না।

তাজ্জব বনে গেলাম। এ আবার কেমন পকেটমার রে! পয়সার জন্যে পকেট মারে, জেলে যায়, কিন্তু যেচে দিলে নেয় না!

কাঁদ্‌চিস্ যে বড়? পয়সা নিচ্ছিস না কেন?

উর্দু বাংলা খিস্তিতে যা বলল তার বিগলিতার্থ এই যে, খয়রাতি পয়সা নিয়ে খানাপিনা করলে আর রক্ষে নেই, ওর হাড় মাস আলাদা করে দেবে লেংড়ি বিবির চেলারা। ইয়া ইয়া ডাকু আর জোয়ান গুণ্ডারা লেংড়ি বিবির তাঁবেদার। তাদের দিল-এ-দরদ

বলে কিছু নেই, দুশমনের যাণ্ড শালারা। ভিখ্ নিলে ওর বাকী চোখটাও ছ্যাঁকা দিয়ে কানা করে দেবে, তা'পর পথের মোড়ে ঝগ্‌ড়ু ভিখনদের সাথে বসিয়ে দেবে। দিন ভোর "একটা আধ্‌লা দিয়ে যাও বাবা, অন্ধ ভিখিরি বাবা," বলে চিল্লাতে হবে।

—তুই পয়সা নিবি এইখেঁনে, এই গ্যাঁড়াতলায়, ওরা তার হদিস পাবে কেমন করে।

—জিন্ পৌরির নজর আছে লেংড়ি বিবির ওপর। গুণে সব জানতে পারে। তা ছাড়া, রোজগারের পয়সা খরচা করার এক্তিয়ার নেই কারো। সব সর্দারনীর কাছে জমা দিতে হবে।

—যদি মোটা রোজগার করে পালিয়ে যায় ?

—কোথায় পালাবে হুজুর ? এক রাত্তিরও পোয়াবে না, গঙ্গাজীতে লাশ ভেসে উঠবে।

বাক্‌রোধ হয়ে গেল শুনে। এ কোন রাজ্যের কথা বলছে ফজল, যেখানে শাসন এমন কড়া ? চোখ এত সজাগ ? শাস্তি এমন নির্মম ?

ঠাহর করে ভেবে একটা যুক্তি এল মাথায়। বললাম,

—আচ্ছা, রোজগারের পয়সা হলে ত কেউ কিছু বলবে না ?

—না, হুজুর।

—তবে চল আমাদের সাথে।

ওকে নিয়ে কলুটোলা পোস্ট গ্রাজুয়েট মেসের নিচের বড়ুয়ার দোকান থেকে চা কেক্ খাইয়ে সেই ডবল পয়সা বাঁধা রুমালে সিকি দুটো বেঁধে রুমালটা ওকে দিলাম। বললাম,

—নিয়ে যা। বলিস্ আজকের রুজি। কাল বিকেলে ঠিক এই সময়টা এইখেনে আসিস্, আমরা থাকব। বুঝলি ?

কি বুঝ্‌ল, ফজলই জানে। কিন্তু একচোখে কানা কুকুর বাচ্চার মতো খুশিভরে একবার তাকিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

আমরা হস্টেলের পথ ধরলাম।

দুই

আমি আর বিজয় বি. এ. পাস করেছি সেবার। ১৯২৩ সাল যায় যায়। এম্ এতে নাম লিখিয়ে তখনো হিন্দু হস্টেলে আছি, পোস্ট গ্রাজুয়েট কিংবা অপর কোনো মেসে যাইনি তখনো। বিজয়ের মামা হেম দত্তগুপ্ত হস্টেলের সুপারিণ্টেডেণ্ট। বিজয় থাকত তাঁর কোয়ার্টারে, আমি পঁচিশ না সাতাশ, মনে পড়ছে না, নম্বর ঘরে দু'নম্বর ওয়ার্ডে থাকতাম।

বিজয় ছিল সাহিত্যিক। তখন রীতিমতো খ্যাতি রটে গিয়েছিল তার। বাঁশরী, অঞ্জলি, এম্নি নানান কাগজে ওর কবিতা বেরত। কবিজনোচিত আকৃতি ও বাগিয়ে ফেলেছিল। রুগ্ন শীর্ণ দেহ, বাব্‌রি কাটা চুল, শামলা রং, হাটু পর্যন্ত পাঞ্জাবি, দু আঙুলে টিপ্ করা নস্যি সর্বদা নাসাগ্রে উদ্যত, ঠোঁটে স্মিত হাসি, চাউনি স্বপ্নালু, গলার আওয়াজ সুরেলা। বনেদী ঘরের ছেলে, কেষ্টনগরের খ্যাতনামা ও. সি. দত্তগুপ্ত ওর মাতামহ।

কবিতা বাদে গল্পও লিখত অজস্র। ছাপাও হয়েছে দুটো চারটে। আমার সাহিত্যের দৌড় হাতে লেখা কাগজ সম্পাদনা; তার জন্য টুকিটাকি লেখা, ছবি আঁকা, এই পর্যন্ত। তবে পড়ুয়া ছিলাম সর্বভুক। গোগ্রাসে গিলতাম, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী, সন্দেশ, মালঞ্চ, শিশির, মহিলা—যাবতীয় বাংলা সাময়িকী। ওগুলো পাওয়া যেত, অধিকাংশ বাড়িতেই। বিলিতি কাগজের মধ্যে স্ট্র্যাণ্ড, ন্যাশ, ডায়াল। বাড়িতে কিছু, ওভারটুন হলে কিছু, গিরীনদার বুক কম্পানিতে কিছু। ইতরজনার সর্বজনস্বীকৃত অধিকারে বিদ্যাদেবীর ভোজসভার মিষ্টান্নের অংশ কিছু বাদ দিতাম না।

একদিন খানকয়েক হাতে লেখা কাগজ, বোধ হয় সদ্যরচিত ছোটগল্প একটা, পরিপাটি করে ভাঁজ করতে করতে বিজয় বলল,

—চ, লেখাটা দিয়ে আসি।

—কোথায় ?

—কল্লোলে। নতুন কাগজ, দেখিস নি ?

—না ত।

—সম্পাদক দু'জন। দীনেশ দাস আর গোকুল নাগ। ভারী ভালো দু'জনা। তা'ছাড়া আরো অনেকে আসে, কেউ কেউ খুব নাম করা—দেখে আসবি চল।

ছাপার অক্ষরে যাদের নাম দেখি, জ্যান্ত তাদের মধ্যে যাব, ভাবতেও বুক দুরুদুরু করে। কিন্তু বেপরোয়া পোজে বলি,

চ'।

বিজয়ের হাতে গল্প ও নস্যি, আমার হাতে হকি স্টিক, দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। একটু আগেই মার্কাস স্কোয়ারে খেলে এসেছি।

মির্জাপুর স্ট্রীট ধরে ফেভারিট কেবিন ছাড়িয়ে পুবমুখো একটু গেলেই বাঁ হাতে পটুয়াটোলা লেন। সেটা হ্যারিসন রোডে গিয়ে পড়বার মুখে ডান দিকে ছোটোখাটো একখানা ঘর। বিজয়ের সাথে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘরের প্রায় সবটুকু জুড়ে একটা টেবিল, একপাশে একটি তক্তপোশ, খান পাঁচ-সাত চেয়ার আর টুল। আলমারিও আছে গোটা দুয়েক, পাল্লা-ফাল্লা নেই।

সদরের দিকে মুখ, নধর চেহারার এক ভদ্রলোক, মাথায় টাকের আভাস, বেশ সৌম্যমূর্তি। প্রসন্ন মুখে ছেঁড়া খামের কাগজে হাত চলছে, বোধ হয় ছবি আঁকছেন। টেবিলের আর একধারে টুলে বসে বর্মাচুরুট মুখে চোয়াড়ে চেহারার আর এক ভদ্রলোক, চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, এক গাদা প্রুফের কাগজ মেলে কাটাকুটি করছেন।

কমলালেবু রংএর রামপুরী চাদর কাঁধে এলানো রোগা গোছের

আর একজনা হাত নেড়ে কি যেন বলছেন, গোঁপ-দাড়ি কামানো, লম্বা লম্বা চুল।

আর একজনা আড় হয়ে খানকত বই মাথায় দিয়ে তক্তপোশে শুয়ে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করে যাচ্ছে, লভানো চুল, সুঠাম চেহারা, আমাদের বয়সী।

আমরা ঘরে ঢুকতেই নধর ভদ্রলোক বললেন,

—এস এস, কবি এস। ইনি?

—আমার ক্লাসফ্রেণ্ড দীনেশদা, ওর নাম মনীশ। হাতের ডাণ্ডা দেখে ঘাবড়াবেন না, ওটা পার্ট অব্ হিম্। সাহিত্য পাগলা, কেবল পড়ে। বাইরে পোজ্ দেয় যেন এসবের তোয়াক্কাই করে না। খেলাধুলো, ডানপিটেমি, এই সবেতে খুব নামডাক।

—আসুন আসুন, ডাণ্ডা ঘুরিয়ে সবেগে চলে আসুন. অধিকার করে নিন আপন দাপটে নিজের জায়গা। আমরা দক্ষিণদ্বার খুলেই রেখেছি। ও পবিত্র, টুলটা থেকে কাগজের বাণ্ডিল নামাও না ভাই, বসতে দাও এঁদের।

কমলা রঙের রামপুরী বিনাবাক্যে নিরীক্ষণ করছিলেন আমাকে, যেন চিনি চিনি চিনছেন না। আমারো মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি। বললেন,

—শেষ পর্যন্ত ভিড়লে? আপনি-টাপনি আসে না বাবু আমার.—

মনে পড়ে গেল একদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিজয় বোসের বাড়ি আমার কোনো গুরুজন স্থানীয়া আত্মীয়ার সহচর হয়ে গিয়েছিলাম। মামীমা এই ভদ্রলোকের সাথে ফোর আর্ট্‌স্ ক্লাব না কি একটা বিষয়ে খুব গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন। আমি গৃহকর্তার অনন্যাসুন্দরী কিশোরী কন্যার পায়ের স্যাণ্ডালের কারুকার্য দেখছিলাম।

নামটাও মনে পড়ে গেল। গোকুল নাগ। ফোর আর্টস্-এর চারজনের একজন। আর্টিস্ট, লেখক।

সে কথা বলতে যাচ্ছি, বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,

—পড়েছে, মনে পড়েছে। বিভাদি'র কি যেন হও তুমি। ভাগ্নে, না? বোসো, বোসো।

ঘাড় নীচু করে বসে পড়লাম ওঁর পাশেই।

সুঠাম সুন্দর সমবয়সী বই মাথায় শুয়ে আধ বোজা চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। আবৃত্তি বন্ধ হলো না,—

আবৃত্তির সে মাধুর্য ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। মানসী সবাই পড়েছে, কিন্তু নেপেনের উদাত্ত কণ্ঠে কথাগুলো যেন সজীব হয়ে বুকের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করতে লাগল।

দীনেশদা গৃহকর্তা তথা সম্পাদকের কর্তব্য সারতে লাগলেন,—

—এ হলো পবিত্র গাঙ্গুলি, কল্লোলের একজন। ও না হলে প্রুফের জঞ্জাল সাফ্ করা আর কারুকে দিয়ে হয়ে উঠত না।

ইশারায় নৃপেনকে দেখিয়ে ফিস্ফিস্ করে বললেন,

—ও হলো নৃপেন চাটুজ্যে।

ও যে কে এবং কি, সে পরিচয় অবান্তর ঠেকল। মনের মানুষ নেপেন কায়েম হয়ে স্ব-স্থানে বসে গেছে ততক্ষণ।

এই সময়ে আরো দু'জন ঢুকলেন ঘরে। বাঁধ ভেঙে যেন বানের জল হুড়হুড় করে এসে পড়ল। বলিষ্ঠ দৃপ্ত চেহারার ভদ্রলোক হেঁড়ে অথচ সুরেলা গলায় গান গাইতে গাইতে ঢুকলেন,

"নিভৃত এ চিত্র মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানস প্রতিমা।"

—দুরন্ত বায়ু পূবৈয়ঁথা।

বহে অধীর আনন্দে—

সঙ্গের সাথী নিরীহ উজ্জ্বল চোখ ভব্য সভ্য ব্যক্তি।

—এ হোলো কাজী, ও শৈলদা।

আশাতিরিক্ত ভিক্ষে পেলে ভিখিরীর যা দশা হয়, আমারো তথা সেই হাল। ডাকসাইটে নজরুল, প্রখ্যাত শৈলদা—তাদের সাথে আমি এক আসরে! "বল বীর, বল উন্নত মম শির" মনে পড়ল, চোখের সামনে ভাসতে লাগল কয়লাকুঠির গল্পের পাত্রপাত্রীরা। গায়ে কাঁটা দিল।

কাজী গেয়েই চলল। নেপেন আবৃত্তি থামিয়ে টুকছিল গানটা। ঝোঁকের মুখে তখুনি তৈরি, কাগজে কলমে লেখাই হয় নি। পরে শুনেছি নজরুলের অনেক গানেরই ওই ইতিকথা।

ছোট্ট ঘর, গমগম করতে লাগল।

ভেতর বাড়ির পর্দার আড়াল থেকে চা চিঁড়েভাজার থালির আবির্ভাব হলো। বিজয় সেগুলো এনে টেবিলে রাখল।

চায়ের সাথে চিঁড়ে ও গানের সাথে গল্পে ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেছে টের পাই নি। বিজয় ছেদ টানল।

—গল্পটা রইল দীনেশদা। চলরে, উঠি। ছোট গেটও বন্ধ হয়ে যাবে এর পর।

গোকুল আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন,

—কিছু লিখেছ-টিকেছ? গল্প, কবিতা—

ঘাড় নেড়ে জানালাম, না।

—লেখ। মনে যা দাগ কাটে, কথায় তাকে ফোটাও। লেখা যেন কথা কয়।

পারি না পারি, মৌনস্বীকৃতি জানিয়ে সেদিন ঘাড় নেড়েছিলাম। চেষ্টা করব।

খান দুত্তিন পুরোনো কল্লোল নিয়ে ফিরলাম।

নেপেন বিড়বিড় করে তখনো আওড়াচ্ছে।

—"সুখ দুঃখ গীত স্বর
ফুটিতেছে নিরন্তর
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা ;
বিচিত্র সে কলরোলে
ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা—"

তিন

গোকুল বলেছিল, মনে যা দাগ কাটে লিখো।

রুটিন মাফিক কাজকর্ম করবার ধাত আমার নয়। ঠিক্ কী যে ধাত তাই সুস্থির হয়ে কখনো ভাবিনি। নিজে ধরতে না পারলেও কাজেকর্মে প্রকাশ পেত যে আমি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। হৈহল্লায় বাইরে যতক্ষণ মেতে থাকতাম, একরকম থাকা যেত। কিন্তু নিজের মন ত অন্তরঙ্গ সঙ্গী। তার সাথে গভীর রাত্রে একান্ত আলাপনে মন দেওয়া-নেয়ার পালা চলত। ঠিক জ্ঞাতসারে নয়, অবচেতনে।

জীবনে কর্মসূচী আগে ভাগে বিধিবদ্ধ করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যারা চলতে পারে সেরকম জীবের পর্যায়ভুক্ত আমি ছিলাম না। অসম্ভবকে সম্ভব করার স্বপ্ন দেখতাম। মনে হত, কি যেন চাই, পাচ্ছি না। অথচ সে বস্তুটা যে কি, তাও সঠিক জানা নেই। শুধু মনে হত, সে অনেক কিছু—

"হৃদয় মোর চোখের জলে
বাহির হল তিমির তলে
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে
বাড়ায়ে দুই হাত"

—ছ'হাত মেলে একটা অসীম আকাশের অন্বেষণ। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে এক এক দিন মনে হ'ত কেউ আমাকে ডেকে জাগালে, আর আমি বেরোলাম দুষ্প্রাপ্য সুন্দরতরের খোঁজে। সমস্ত বাধাবন্ধ নিষেধ ভাঙার অমিত প্রত্যয় দুর্জয় শক্তিতে শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটত। যেন একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস সুপ্রাচীন অচলায়তনের পাষাণ প্রাকারে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

পরে, অমনি একটা ছবিও দেখেছি 'কল্লোলে'র প্রচ্ছদে। দীনেশ দাসের আঁকা। পুরোনো কপি অটুট একখানাও হাতের কাছে নেই যে স্মৃতি ঝালিয়ে নেব।

মনের এইরকম একটা অবস্থায় সে রাত্রে দুষ্কর্ম করে ফেলা গেল একটা। বহু পুরোনো কাগজের জঞ্জাল ঘেঁটে পঙ্কোদ্ধার করেছি সেদিন। প্রলাপ গোছের কবিতা। পুরোই তুলে দিচ্ছি, কারণ, বেরোয় নি কোথাও।

মানুষের গান

মেরু প্রদেশের প্রত্যন্ততম কোণে
যেখানে নেই সীল-তিমির ভিড়
কি বড়ো রোঁয়াওয়ালা কুকুরের স্লেজ,
যেখানে স্কট ন্যানসেন আমুণ্ডসেন
পৌঁছয় নি আজও—
যেতে চাই সেই খানে
গ্লেসিয়ারের সুউচ্চ চূড়ায় আরোহী হয়ে
আকাশে হাত বাড়িয়ে অসীমকে
আলিঙ্গনের আমন্ত্রণ ছড়িয়ে—
সঞ্চারের সম্ভাবনায়
প্রাণ যেখানে
ভ্রূণ স্বপ্নে বিলীন।

আমার উত্তপ্ত আসঙ্গে
হিমসাগরের তুহিনশীতল জল
উচ্ছল হয়ে ফুটে উঠ্‌বে
আর
ছ'মাসের মিনতিতে ঘুম ভাঙে না যাঁর
মেঘের মুখাবরণ করিয়ে
সেই মেরু সূর্য
উঁকি দেবেন সকৌতুকে
স্মিত মুখে।
দিকে দিকে
অণু পরমাণুতে সাড়া জাগবে
রূপ নেবে
লক্ষ ভ্রূণ প্রাণ।
অরোরা বোরিয়ালিস্‌কে করবো চিরস্থায়ী
ঝড়ের মুখে পরাবো রাশ
পড়বার আগে বজ্র মুঠে বজ্রকে
মাঝপথে ধরে ফিরিয়ে দেব
প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রের দিকে।
যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে,
সে থাক্‌ দেবতাদের।
মর্ত্যের সূচ্যগ্র ভূমিতে
ছাড়বো না মানুষের অধিকার।
যাবো সেই দেশে
হাওয়াই টাইটি ছাড়িয়ে
প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের
কোনো অনামা দ্বীপে

প্রবাল প্রবাসে সাগরিকা
সমুদ্র স্থানান্তে যেখানে
প্রবাল তটে করে বিশ্রাম,
তার এলোমেলো কেশদাম
ঘূর্ণি ঝড়ে ঘুরে ঘুরে ওড়ে,
ঝিনুকে ঝিনুকে যেখানে
মৌক্তিক মূর্ছনা,
মন্থর বাতাস ভারাক্রান্ত
দারুচিনি গন্ধে,
অবিরল অবিরাম
নারকেল পাতায় পাতায়
যেখানে ঝিরঝির সিরসির,
আঁকব সে দেশের কপালে
মানুষের জয় তিলক
আতঙ্কে টাইফুন নোয়াবে মাথা
স্রষ্টা নয়, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের কাছে।

চার

সরকারী ইলেকট্রিক আলো দশটায় বন্ধ হলে মোমবাতি জ্বেলে লেখাপড়া করার রেওয়াজ হিন্দু হস্টেলে। সেটাও নিবু নিবু। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভারী আত্মপ্রসাদ বুকে পুষে শোয়া গেল। কল্লোলে যেতে এবার আর খালি হাতে নয়, একখানা রিয়্যাল মাল হাতে নিয়ে যাওয়া যাবে। অন্ধকার মাথা ঘুম এসে একটুর মধ্যেই সব ভুলিয়ে দিল।

ভোরে উঠেছি, চা খেয়েছি, হস্টেলের অলিখিত আবশ্যিক আইনা-

নুসারে এর ওর ঘরে গিয়ে ভালো ছেলের পড়াশোনা নষ্ট করেছি—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিত্যকর্ম পদ্ধতি পালন করেছি। বেলা বাড়লে, এর তেল, ওর সাবান উঠিয়ে নিয়ে স্নান পর্ব সমাধা করে খাওয়া মিটিয়ে কলেজ গিয়েছি।

বিকেল তিনটেয় খেলার নেশায় পায়, পাগলের মতো টানে। আজ যে কি হয়েছে, টেনিস কোর্ট কি হকি ফিল্ডে না গিয়ে সোজা ঘরে চলে এসেছি। বিজয় তখনো ফেরে নি। ও এলে কল্লোলে যাওয়া যাবে।

রাত্তিরের সাহিত্য কর্মে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে দোষ কি? রিয়্যাল মালের কাগজ ক'খানা নিয়ে পড়তে বসলাম।

হরি হরি! রাতের আত্মপ্রসাদের ফাঁপা বেলুন যেন ফেঁসে চুপসে এতটুকু হয়ে গেল! এই সব ছাইপাঁশ লিখেছি নাকি? কেউ আড়াল থেকে দেখছে না ত আবার?

কল্লোলের ছোট ঘর ঠাট্টার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে, নিষ্করুণ সমালোচনায় দিক্‌পাল সাহিত্যিকরা মুখর হয়ে উঠেছে—এমনি একটা কাল্পনিক ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠল।

সাত তাড়াতাড়ি কবিতার খাতা বাক্সজাত করলাম।

সে আশাভঙ্গের, পরিতাপের পরিমাপ আজ বোঝাতে পারব না। মনে হয়েছিল আমার দ্বারা সাহিত্যের লাইনে কিছুই হবে না। আমার ডানপিটেমিই ভালো, লেখাটেখা আমার কাজ নয়।

এর মধ্যে বিজয় ফিরল। সাড়ে চারটে পাঁচটা বাজছে। নৈমিত্তিক বৈকালিক জলযোগের সময় এসে গেল।

সে এক পর্ব। ইডেনের খাবারের ভেণ্ডর বনমালী হস্টেলেই থাকত, হসপিটাল অ্যানেক্সের একতলায়। সেখেনেই খাবার বানাত। সকালে একবার নিম্‌কি কচুরী সিঙাড়া নিয়ে, আর বিকেলে লুচি, মাংস, আলুর দম, মিষ্টি ইত্যাদি বনমালীর চ্যালারা কাঠের থালা হাতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বেরিয়ে পড়ত। আমাদের পরিবেশক ছিল গোপেন।

আমাদের বৈকালিক বরাদ্দ লুচি মাংস। চারখানা লুচি দু'পয়সা আর এক খুরি মাংস চার পয়সা,—ব্যস্, এই ছ'পয়সায় রাজকীয় টিফিন। রেস্তরাঁর বড় লোকের ছেলের ঘাড় ভেঙে অধিক খাওয়ার প্রচলন ডানপিটেদের অধিকারভুক্ত ছিল; কিন্তু সেদিন মুড্ ছিল না।

খেলতে যাইনি দেখে অবাক হলো বিজয়।

—হ্যাঁরে চিম্টে, খেলতে যাসনি যে বড়?

—দেহটা সুবিধের নয়।

সাহিত্যস্থ ছিলাম কিনা, 'দেহ' 'টেহ' বলে ফেললাম। শরীর ভালো নয়' কিংবা 'গা ম্যাজ্ম্যাজ্ করছে' জাতীয় খেলো বুলি মুখে এল না।

বিজয়ও কম তুখোড় নয়। রিলে রেসের নিশেনের মতো মুড্টা লুফে নিয়ে বলল,

—হেতু? অত্যধিক রাত্রি জাগরণ? অথবা—

—থাম্। মেলা ফ্যাচ্ফ্যাচ্ করিস নে।

—পতে আয় বাবা, খুব যে এন্তার শিশির ভাদুড়ি চালাচ্ছিলি। চ', কল্লোল মেরে আসি চ—

—ইচ্ছে করছে না আমার। তুই যা। তাছাড়া ফজল ছোঁড়াকে আসতে বলেছি কাল, এসে ঘুরে যাবে।

—হ্যাঃ, সে এসেছে। কোতাকার কে পকেটমার, আর তুই-ও ওর মনিব কিনা, যে হুকুম করলি আর—

—দুদ্দুর! মনিব না হয়ে দোস্ত্বেরাদারও ত হতে পারি—

—বটে বটে, পকেটমার বেরাদার। যা তবে গ্যাঁড়াতলায়, ভিড়ে পড়গে ওদের সাতে। দীনেশদা বলেছিল আজ সন্ধেয় সবাইকে নে' শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারে যাবে। উনি আবার কাজীর হেঁড়ে গলার গান শুনতে খুব ভালো বাসেন কিনা। তা'ছাড়া, অনেক নামী লোক আসেন সেখেনে—হেমেন রায়, মণি গাঙুলি, চারু রায়—

সেটা শিশিরবাবুর দিগ্বিজয়ের গোড়ার আমল। ইনস্টিট্যুটের

সময় থেকেই আমরা স্তাবকের দলে। বিদ্যাসাগরের চাকরি ছাড়লেন গিয়ে দল বাঁধলেন, ডি. এল. রায়ের 'সীতা' 'পাষাণী' নিয়ে এদিক-ওদিক কদিন করে হাতীবাগানে এখন যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নিয়ে দিগ্বিজয় করছেন।

মনটা দোটানায় ওঠ্ বস্ করলেও ফজলের টান জোরদার হয়েছিল সেদিন। বিশ্বস্ত নির্ভরতার ছাপ দেখেছিলাম ছোঁড়ার মুখে চোখে। বললাম,

—দেখিস্, আজ নিশ্চয় দীনেশদা যাবেন না। কবে ঠিক ঠিক যাওয়া হবে, জেনে নিস্।

এ ছাড়াও "কিন্তু" ছিল মনে। সদ্য সদ্য জ্বলন্ত উৎসাহে রাত জেগে একটা ছাইপাঁশ লিখে মরমে মরে আছি, সেই মেজাজে কি আর ডাকসাইটেদের আসরে যাওয়া যায়।

বিজয় ডাকসাইটে না হলেও উঠতি লেখক, ওর এলেম আছে যাবার। আমার কি আছে?

আজ বুঝি, শুধু অপাঙ্‌ক্তেয়তা বোধই একমাত্র কারণ ছিল না সেদিন। ফজলের টান—অজানা জগতের হাতছানি, সেও কম আকর্ষণের বস্তু ছিল না।

খুব ছেলেবেলা এক দাগী চোরের ছেলে আমার বন্ধু ছিল। তার বাপ প্রথমে অভাবে পড়ে একবার চুরি করেছিল, ছাড়া পেয়ে ফিরে এসে কাজকর্ম খুঁজেছিল। জেল ফেরত কয়েদীকে কে কাজ দেবে? দেয় নি। ফলে খেতে না পেয়ে পেটের দায়ে আবার চুরি করে জেলে গিয়েছিল। একই ইতিহাস—বারকয়েক ঘর আর ফাটক, ফাটক আর ঘর করবার পর সে হয়ে গেল দাগী চোর। কেউ তাকে কাজ দিত না, বৌ-ছেলেসুদ্ধ না খেয়ে মরলেও না। আমার মা শেষ পর্যন্ত বাড়ির চৌকিদারিতে বহাল করেছিলেন তাকে—আমরণ আর সে চুরি করে নি। তার ছেলে, যে আমার সাথী ছিল, সে কখনো কুটোটিও না বলে নেয় নি।

বই পড়াতে সর্বভুক ছিলাম। বহু বিজ্ঞাপিত বসুমতীর যাবতীয় বই—"হাজার জিনিস" থেকে শুরু করে "অষ্টবক্র সংহিতা," নামজাদা লেখকদের বই—বেশির ভাগই গুরুদাস, সিটিবুক সোসাইটি আর পাবলিশিং হাউসের, বটতলার যাত্রা-খেউড়-খিস্তি মায় পাঁজির বিজ্ঞাপন পর্যন্ত গোগ্রাসে গিলতাম। রকমারি মানুষের রকমারি খবর কাগজে কলমে বহু রাখতাম, তবে সাক্ষাৎ পরিচয়ের দৌড়,—নিম্ন-মধ্য-উচ্চ বিত্ত মায় ইঙ্গবঙ্গ ট্যাঁশ গরুদের সমাজ পর্যন্ত। কলেজে রাজা মহারাজার ছেলেও পড়ত, তাদের কারো সঙ্গে তেমন খাতির জমত না, নাটোর গৌরীপুর খেলাধূলায় ওস্তাদ ছিল, তাদের কথা আলাদা।

এ সবই তথাকথিত ভদ্রঘর। তাছাড়াও, চোখের সামনে অথচ আড়ালে আলাদা যে এক জগৎ আছে সেখানে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম ঐ ফজলকে ধরে।

ওকে আসতে বলেছিলাম কলেজ মাঠে টেনিস বল কুড়োতে। পেমেণ্ট নগদ। গ্যাঁড়াতলা পার্কে ফজলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ওর সঙ্গে কাজের কথা বলে কয়ে আসব।

মাঠে কেউ খেলছে, কেউ বসে আছে, খেলাও চলছে জোর কদমে, গজালিও। নড়ালের জিতু রায় টেনিস সেক্রেটারী, তাকে জানালুম আমার আবেদন। সে বলল,

—বেশত, নিয়ে আসিস ছোঁড়াকে। দুটো কোর্ট সব সময়েই চালু, আর পিকারও সবকটা সবদিন আসে না। হয়ে যাবে।

হৃষ্ট মনে সরে পড়ছি, ট্যাঁশ গরুদের একজন চেঁচিয়ে উঠল,—হ্যালো হ্যালো হ্যালো! আই সে, চিমটে উইদাউট এ র‍্যাকেট আর হকিস্টিক! সারপ্রাইজিং, ড্যাম্ ইট।

ওরা অমনি। মানুষ আমাদেরই মতো দোষে গুণে, কিন্তু বাঙালী বলে ধরা দিতে চায় না। বাড়িতেও বাপ মা ভাই বোনের সঙ্গে ওড্‌হাউসি ইংরেজি না হয় বাবুর্চি হিন্দি চালায়।

নিজেদের ওরা সাধারণ বাঙালীর থেকে ভিন্নস্তরের জীব বলে মনে করে।

কোনো রা বাক্যি না কয়ে হ্যালিডে পার্কমুখো ছুটলাম। লুঙি-ওয়েস্ট কোট রঙিন রুমাল ছ'চারজন আসতে শুরু করেছে, কিন্তু ফজলের দেখা নেই।

বেলা পড়ে আসছে। হয়ত পকেট মারছে, না হয় ধরা পড়ে হাজতে গেছে। অথবা বিজয়ই ঠিক বলেছে, মনিব ত নই, যে হুকুম তামিল করবে!

রেলিং টপকে ভবানী দত্তর গলি ধরে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের দিকে এগোই। পাঁইপাঁই করে ছুটতে ছুটতে, দেখি ফজল আসছে।

—ছুটছিস কেন? লোক লেগেছে?

— হুজুর, দের হয়ে গেলো কিনা, ভাবলাম গোসা করবেন।

—কেমন হলো আজ? ক'টা পকেট কাট্‌লি? রোজগার কতো?

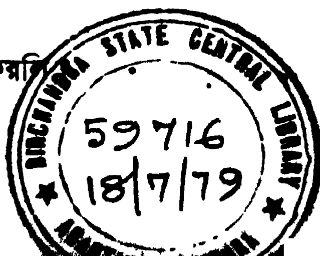
ট্রেড সিক্রেট কি আর ফাঁস করবে ওরা? কালকেই ত বলছিল, গঙ্গাজিতে লাশ ভেসে উঠবে। ভাবতেই ভয় ভয় লাগে।

—চারঠো—নেহি নেহি, পাঁচটো জেব লুঠ্‌ চুকা। মাল ত সাঁথ সাঁথ পাচার হাত ফেরি হয়ে পঁউছে গেলো লেংড়িকা হিফাজত মে। রেস্তর খবর? সে লেংড়ি জানে।

—তোর তবে ঝাড়া হাত পা? আয় আমার সাথে।

ওকে পিকারের কাজে ভর্তি করে দিয়ে খেলা দেখতে বসে গেলাম। পাশেই দেখি কানাইদা ওরফে কেনো সেন, মোহন-বাগানের ফুটবল ক্যাপ্টেন। ভালো নাম রবিন সেন। লম্বায় ছ' ফুট-এর ওপর, আমিও তাই। সিনিয়র হলেও স্যাঙাৎ বলে ডাকতেন আমাকে। খাস শ্যামবাজারের চোস্ত্‌ কলকাতাই ভূপেন বোসের ভাগনে কি নাতি।

—এ চিড়িয়া কোত্থেকে আমদানি করলি



—আমদানি আবার কি কানাইদা, ভিক্ষে করছিল চৌধুরী কোম্পানির সামনে। দেখলাম শক্ত সমর্থ ছোঁড়া, তাই বললাম খেটে খেতে চাস ত আয় আমার সাথে।

হোহো করে হেসে উঠল কানাইদা।

—মা কে মামার বাড়ি চেনাচ্চিস্ রে বাঙাল? তুই বললি খেটে খাবি ত আয়, আর অমনি ও সুড়সুড় করে তোর সাথ ধরে এসে নির্দোষ রুজি রোজগারে লেগে গেল! তবে হ্যাঁ, ছোঁড়া পোড় খাওয়া ঘাগী নয়, এখনো নবীশ। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে বললি না? তবে ত রাজাবাজারের দল। কোকেন রানী বাতাসীমণির প্রজা নয়, তবে ওদের মাথার ওপরও একটা ঘাগু মাগী সর্দারি করে শুনেছি।

জেব লুঠ্‌, চুকা। মালত সাঁথ সাঁথ কানাইদা। বললাম ফজলের ইতিবৃত্ত খুলে।

—শাবাশ। পেটে পেটে তোরও ত কম এলেম নয় রে স্যাঙাৎ! তোর মতলব ত ভালোই, তবে পারবি নে। সাপের ছানাকে ছোবল ভোলাতে পারবি নে। দল দল,—ওদের দল বড়ো কড়া। টেগার্ট পূর্ণ লাহিড়ীই পারে নি, তা তুই কোন ছার।

টেগার্ট, পূর্ণ লাহিড়ী কলকাতার তুই বাঘা পুলিশ কমিশনার আর ডেপুটি কমিশনার। গুণ্ডা দমনে টেগার্টের নাম এখনো স্মরণীয়।

কানাইদা বেদবাক্য বলেছিল সেদিন। তারপর পঁয়তাল্লিশ বছর কেটে গেছে। তারো আগে আরো কত বছর কেটেছে—সাপের ছানাকে আজও ছোবল ভোলাতে পারে নি কেউ। দল, দল, দল— যাদের দল যতো পোক্ত, তাদের বাড়বাড়ন্ত কেউ আটকাতে পারে না, তা সে গুণ্ডাবাজীতেই হোক, কি উল্টোটা মানে দেশ শাসনেই হোক। নামফের রকমফের, ভোলফের—সব হতে পারে, হয়ও। কিন্তু সে দলকে কেউ দাবাতে পারে না যে দলের বাঁধন আঁটো।

দল কাদের? চালায় কে? পাণ্ডা, না সবাই?

পাঁচ

মাসখানেক ফজলের সাথে দহরম-মহরম করে দেখলাম ঢের, জানলাম অনেক বেশি। মনের মধ্যে অসংখ্য জগৎ ভাঙাগড়া অবিরাম চলেছে। অসংখ্য কল্পনাবুদ্বুদের একটিতে পটলডাঙার ছনিয়া রূপ পরিগ্রহ করল। পটলডাঙা কাল্পনিক নাম, তবে বস্তি প্রসঙ্গে বেমানান নয়।

এই কাল্পনিক বস্তির সত্যকারের বাসিন্দাদের নিয়ে গল্প ফাঁদতে উৎসুক হলাম বটে, তবে একথাও মনে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল, দেখা দূরের কথা, শুধু ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে, তাদের আখ্যান পড়বেই বা কে, ছাপবেই বা কে? অবিচার-অন্যায়-অসাধুতা-ভণ্ডামি কি সাহিত্যের উপজীব্য? চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-বলাৎকার? মাৎলামো-বেলেল্লাপনা-খিস্তি-খেউড়?

দেশ-কাল-সমাজ-মানুষ-জীবন-মৃত্যু, অমোঘ প্রাকৃতিক বিধানে অনাদিকাল থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। সুন্দর কুৎসিত একসঙ্গে বসবাস করছে সে আইনে। শিল্প-সাহিত্য সুন্দরকেই খুঁজছে সমস্ত দৈন্যের মাঝ থেকে দৈন্যকে বাদ দিয়ে। কালো দিকটার যথাযথ ছবি আঁকতে কেউ সাহস পায় নি, কালোর মশলায় যে আলোর ছবি আঁকা যায় সে কথা কেউ ভাবেনি। জীবনের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বিকৃত জীবন পঙ্গু জীবনকে উপেক্ষা করেই শিল্পী সুন্দরের সাধনা করছে। কিন্তু কেন? কেন দৈন্য বুভুক্ষা হাহাকার আছে জেনেও এড়িয়ে গেছে সবাই আঁকতে?

মনটা বিদ্রোহী হয়েই রইল শুধু লেখা হয়ে উঠল না।

গায়ে ঠেস্ দেওয়া দরদ দেখানো লেখা হয় নি তা নয়। কিন্তু যাদের জন্য দরদ তাদের মুখ দিয়ে বলাতে অল্প লোকই এগিয়েছে। বিজয়কে বললাম খুলে। সে বলল,

—হ্যাঁ, তা লেখা চলে বই কি। তবে মান্ধাতার আমল থেকে যা চলে আসছে শেষপর্যন্ত তাই চায় পাঠকেরা। অল্পক্ষণের জন্য সাড়া জাগানো যায়, তৃপ্তি আনা যায় না।

তৃপ্তি! প্রলয় ঝড়ে বালুর মধ্যে মুখ গুঁজে সর্বনাশ ভুলে থাকার তৃপ্তি! সুদৃশ্য ব্যাণ্ডেজে গলিত কুষ্ঠ ঢেকে গিলে করা কামিজ আর কোঁচানো ধুতি পরে বেড়ানোর তৃপ্তি। মান্ধাতার আমল!

মন বেঁধে ফেললাম। লিখতেই হবে। মান্ধাতার আমল দেখায় সবাই, মান্ধাতার বাবার আমলের নামে ভড়কাবে। সেই নাম, মানে যুবনাশ্ব। ছদ্মনাম নিয়ে লিখব।

রাত জেগে দিন দু'য়ের মধ্যে গোটা দুই গল্প লিখে ফেললাম। 'গোস্পদ' গল্প নয়, গল্পারম্ভ। 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্প।

তারপর একদিন গল্প দু'টো নিয়ে পটুয়াটোলা লেনে গিয়ে হাজির হলাম। বিজয়ের সঙ্গে নয়, একাই। বেশ বেলাবেলি গেছি, গোকুলকে একা পাব বলে। শুনেছিলাম ও শিগগির আসে। বলতে লজ্জা নেই, ভয়ে বুক দুরুদুরু করছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল, কথায় স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারছিলাম না। তখনকার দিনে কলেজি ছোকরাদের জামায় পকেট বাহুল্য থাকত না, গল্প দুটোর ভাঁজ করা কাগজ হাতেই ধরা ছিল।

গোকুল ভূমিকা না ফেঁদেই বলল,

—দাও। জানতুম আনবে। কি লিখেছ? গল্প? কবিতা?

কোনোমতে বললাম, গল্প।

দীনেশদা ঘরে ঢুকছিলেন, শুনতে পেলেন কথা। ছোঁ মেরে গোকুলের হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে টেবিলে চাপড় মারলেন। বললেন,

—শাবাশ।

গোকুল সুরুচিসম্মত অঙ্গুলি হেলন করল।

—নিশ্চয় প্রেমের গল্প, মানে বয়েসটাই ত প্রেমে পড়ার, প্রথম প্রেম—

জবাবে শুধু ঘাড় নাড়িয়ে জানিয়ে ছিলাম যে প্রেমের গল্প ঠিক নয়—তবে কিসের গল্প তাও বলতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম,

—পড়ে দেখবেন সময়মতো। বিচ্ছিরি লাগলে ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। আর—আর বিজয়দের কারুকে দেখাবেন না।

দৌড়ে বেরিয়ে সোজা গিরীনদার বুক কোম্পানিতে এসে হাঁফ ছাড়লাম। এখন সেখানে মনীষা গ্রন্থালয়, ওই অঞ্চলে সে আমলের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগৃহ বুক কোম্পানি ছিল। মালিক গিরীন মিত্তিরের পান-ভরা মুখে স্মিতহাসি লেগেই থাকত। ওঁর ছোটোভাই আর এক মালিক নাতুদা, বয়সে আমাদের চেয়ে বড়ো হলেও সমানে সমানে মিশতেন। বললেন,

—আয় আয়। পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছিস্ কেন? হাঁপাচ্ছিস যে। কিছু একটা দুষ্কর্ম করে এলি মনে হচ্ছে—

মনে মনে বললাম, দুষ্কর্ম বলে দুষ্কর্ম! মুখে বললাম—দুষ্কর্ম আবার কি? এমনিই জোর কদমে ছুটে হাঁফাচ্ছি।

—বোস। বডলিহেডের পার্সেল এসেছে, ওই কোনাটায়—

ভেতরে জানালার ধারে দু'সার বইয়ের আলমারির ফাঁকে বিলিতি বইয়ের ইয়া বড় বাক্স, মুখ কাটা, কিন্তু বই নামানো কি গোছ করা কিছু হয়নি। পেরেকের দাঁত বার করা কাঠের বেটনের হাঁ মুখ, ইস্পাতের পাতগুলো এবড়ো-খেবড়ো খোক্কসের আঙুল। ভেতরে ব্রাউন পেপার প্যাকিং এখনো অটুট।

তুকতাক সবই জানা ছিল। ভোঁতা, বাঁটবিহীন ছুরির ফলা দিয়ে কাগজের প্যাকিং কাটতেই, সে কি মন মাতানো গন্ধ। বিয়ে বাড়ির ভিয়েনের গন্ধকেও হার মানায়। কোনটা কি বই খুঁটিয়ে দেখবার ঢের সময় পাওয়া যাবে, সমস্ত বইকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আলিঙ্গন করার আনন্দে মশগুল হয়ে গেলাম।

একরাশ পরম আত্মীয় যেন ভিড় করে হঠাৎ এসে পড়েছে, জনে জনে খোঁজখবর নেবার আগে সবায়ের সঙ্গে প্রথম দর্শন, প্রথম আপ্যায়ন, প্রথম হর্ষপ্রকাশেই অনেক সময় কেটে গেল।

বই হাঁটকানোর স্বাধীনতা ছিল আমাদের জন কয়েকের। এ আলমারি ও আলমারি, বডলি হেডের আনকোরা আমদানি, যাবতীয় বইয়ের কাছে শুধু ঘুরঘুর করি, মন বসে না কিছুতে। ওই কথানা কাগজ গোকুলের হাতে তুলে দিয়ে কেমন যেন সশঙ্ক হয়ে আছি। কাগজগুলো গোকুলের হাত থেকে দীনেশের হাতে, আবার হাত ফেরি হয়ে ওর হাত ঘুরছে, আর ওরা দু'জন অপছন্দের চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছে মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ভারী নির্জীব বোধ হতে লাগল নিজেকে।

পেছনের আলমারির একটার নিচের থাকে অবিক্রীত অনেক ইংরেজি পত্রিকা থরে থরে সাজানো। আন্দাজে একখানা টেনে নিয়ে পড়তে বসলাম। পাতা ওলটাচ্ছি, H. G. Wells-এর একটা প্রবন্ধ চোখে পড়ল—গোগ্রাসে পড়ে গেলাম আধঘণ্টা ধরে। প্রবন্ধের নামটা আজ আর মনে নেই, বোধ হয় 'গল্প লেখকের কর্তব্য' গোছের একটা কিছু। কাগজটা নাদুদার কাছ থেকে চেয়ে এনে-ছিলাম, হারিয়ে গেছে। একটা অংশ মনে দাগ কেটেছিল গভীর-ভাবে গল্পের খাতায় সেটা টুকে রেখেছিলাম।

"We are going to write subject only to our limitations about the whole of human life. We are going to write about business and finance and politics and precedents and pretentiousness and decorum and indecorum until a thousand pretences and ten thousand impostors shrivel in the cold clear air of our elucidations".

টেন থাউজ্যাণ্ড প্রিটেন্সেস্ অ্যাণ্ড টেন থাউজ্যাণ্ড ইম্পস্টরস্! মনে

পড়ে গেল একসঙ্গে অনেক বিদেশী লেখকের লেখার কথা। ডিকেন্স, ডস্টয়েভ্স্কি, গোগোল, গর্কি। দেশীর মধ্যে কারো নামই বিশেষ করে মনে পড়েনি—পুরোনোর মধ্যে ত্রৈলোক্য মুখুজ্যে আর হাল আমলের শৈলজা ছাড়া। কিন্তু দেশী বিদেশী লেখকদের লেখায় যে সব ছবি দেখেছি তার পাশে নিজের লেখা দাঁড় করিয়ে মনে মনে অপ্রতিভ হওয়া ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। তবু বুকে বল পেলাম।

তবে,—যদি গোকুলরা অপছন্দ করে? যদি ছিঁড়ে ফেলে দেয় টুক্‌রো করে?

দিক্ গে। আবার লিখব। আমি যা পারি তাই লিখব। আর কারু মতো করে নয়, নিজের মতো করে লিখব। কলমে যা আসে, সাব্‌জেক্ট টু মাই য়োন লিমিটেশন্‌স্, তাই লিখব। আজ কল্লোল না ছাপুক কাল অন্যে ছাপবে।

নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে সাহস সঞ্চয় করি। ভয় ভয় ভাব কাটে না তবুও। সব দ্বন্দ্ব নিরসন হয় সন্ধের পর। বিজয় কল্লোল থেকে ফিরে এসে শীর্ণ সরু হাতে আমার পিঠে চড় কশিয়ে বলল,

—বাব্বা! পেটে পেটে এত? করেছিস্ কিরে চিম্‌টে, গোকুলদা বলেছে এই মাসেই ছাপবে। আর দীনেশটা এক কপি এই ম্যাগাজিনটা পাঠিয়েছে তোকে দেখতে দিতে—

সাফল্যে বা আনন্দে লোকে উৎফুল্ল হয় বলে জানি, কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল! ধন্দ ধরা ভূতে পাওয়ার মতো নিঃসাড় হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

সংবিৎ ফিরলে পত্রিকাটা খুলে দেখলাম নরেশ সেনগুপ্তর একটি প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন লাল পেন্সিলে দাগা।

—"কথা সাহিত্যে দরিদ্র পরাভূত জীবনের চিত্র যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দরদ দিয়ে কেউ আঁকতে চেষ্টা করেন নি। অবনত পিষ্ট হীন নরনারী—দৈহিক ও নৈতিক বৈক্লব্যে পঙ্গু দীন বুভুক্ষুর দল—এদের কথা বলতে কেউ এগোন নি।"

ছয়

আমরা তখন ঢাকায় থাকি। ১৯২৪ থেকে একটানা ১৯২৭ পর্যন্ত। ওই সময়েই ঢাকায় প্রেমেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। অন্তরঙ্গ না হলেও ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ হয়েছিল। কি সুবাদে খাস কলকাতার ছেলে ঢাকায় ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে এল, আমার জানা নেই। তাকে প্রথম জানলাম আমার স্বর্গত মেজ ভাই সুধীশের সহপাঠীরূপে। বন্ধু ভাগ্যে সুধীশ ভাগ্যবান—তার বন্ধু-সংখ্যা ছিল অনেক, অন্তরঙ্গতাও ছিল নিবিড়। একদিন দেখা হলো আমাদেরই ওয়ারীর বাসায়। অনিল ভটচায, ক্ষিতীন সাহা, ভৃগু গুহঠাকুরতা, পঙ্কু দাসগুপ্ত—মানে খোকা অর্থাৎ সুধীশের দলবলের সঙ্গে। বয়সে প্রেমেন ওদের থেকে একটু বড়ই হবে, আমার থেকে দু'বছরের ছোটো।

ঢাকার মতো মফঃস্বল শহরের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে প্রেমেনকে পেয়ে বর্তে গেলাম মনে হয়েছিল সেদিন। ১৩৩০ সালের চৈত্রের প্রবাসীতে 'শুধু কেরাণী' নামে ওর গল্প বেরিয়েছিল। প্রবাসী কাগজ তখন আঞ্চলিক ভাষায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কাগজ—তার ডাকসাইটে লেখক-গোষ্ঠীর অন্যতম হবার সৌভাগ্য যে অর্জন করেছে, সে যে হেঁজিপেঁজি কেউ নয় এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ।

গল্পটাও মনে দাগ কেটেছিল, যদিও সেটা প্রেমেনের পরের পরের গল্পগুলোর তুলনায় কিছু কাঁচা। আগেই গল্পটি আমি পড়েছিলাম, নতুন এক প্রতিভার অভ্যুদয়ে মনে জয়ধ্বনি উঠেছিল। তুচ্ছ ঘটনা, থোড়-বড়ি-খাড়া জীবন, কিন্তু ঠিক যেন ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দুর মতো সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নিখুঁত প্রতিচ্ছায়া। একটি মুহূর্ত, একটি ইঙ্গিত। চৌম্বকে ব্যঞ্জনায় আমার মন হরণ করেছিল গল্পটি।

সেই গল্পের লেখক, সেই প্রেমেন, এত কাছে! বীর পুজায় মন আবাল্য উন্মুখ, প্রেমেনকে অধুনাতম হিরো পেয়ে গেলাম সেদিন। নিজেকে ধন্য মনে হলো।

তারপর কতো বিচিত্র বিভিন্ন গল্পে কবিতায় প্রেমেনের ব্যাপকতর প্রকাশের সম্মুখীন হয়েছি—কিন্তু সেদিনের সেই গৌরবময় অনুভূতি দৃঢতর হয়েছে কেবলি।

প্রবাসীতেই প্রকাশিত আর একটি গল্পে, "গোপনচারিণী"তে প্রেমেন আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। কল্লোলে "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে", "কমলা কেবিন্" "কসৌলিয়া দরদিয়া", "চিত্রা" গল্পের পর গল্প, আরো গল্প। বাংলাদেশের অফুরন্ত পাঠক মোহিত হয়ে গেল, ওর লেখায়।

রুল না টানা মোটা একটা বাঁধানো খাতায় কবিতা লিখত প্রেমেন। ওর কবি পরিচয় তখনো প্রকাশ পায় নি। সেই খাতাখানা কি করে হস্তগত হয়ে গেল আমার। খোকাদের হাতে লেখা কাগজে ওর থেকে "জীবন শিয়রে বসি মৃত্যু দেয় দোল" কবিতাটি প্রকাশ পেয়ে ছিল। ওর প্রথম দিকের অনেক নামকরা কবিতা ঐ খাতায় ছিল। কল্লোলে গল্পের সঙ্গে কবিতাও বেরোতে লাগল এবার। "মহাসাগরের নামহীন কূলে", "আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির"—এই সব সে আমলের বিখ্যাত কবিতা ছিল ঐ খাতায়। হুইটম্যানের Leaves of Grass যাদের পড়া ছিল, তারা অবাক হলো না। কিন্তু বেশীর ভাগ বাঙালী পাঠকের হুইটম্যান পড়া ছিল না।

চার-পাঁচ বছর পরে, ঠিক সন-তারিখ মনে নেই, খাতাখানা গুপ্ত ফ্রেণ্ড্সের আশু ঘোষ হাতিয়েছিল আমার কাছ থেকে, বের করেছিল প্রেমেনের প্রথম কবিতার বই "প্রথমা"।

মজার গল্প আছে একটা প্রেমেনের। বহু বিদেশী উল্লেখযোগ্য লেখকের লেখা ও গোগ্রাসে গিলত। ঢাকার আমলে দেখেছি, ওর

খুব প্রিয় ছিল ওয়েল্‌স্‌, ওয়াল্ট হুইটম্যান, সিনক্লেয়ার লুইস্‌, এড্‌না ফার্বার আর পুরোনোদের মধ্যে ডিকেন্‌স্‌, জুলে ভার্ন, মার্কটোয়েন, জেরোম এঁরা।

ওকে দেখলে মনে হত যে ওর বুকে ঝড় উঠেছে, ঢেউ মাতামাতি করছে; কিন্তু যেন একটা কঠোর কারাপ্রাকারের বন্ধনে সমস্ত ঝড় সংহত হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। ওর চোখ দিয়ে আগুন ঝলকাতো কথা বলতে শুরু করলে, কথার তোড় শুরু হলে থামতে জানত না, এমন বিষয় নেই যা নিয়ে ভাবত না, এমন প্রকাশ-মাধ্যম নেই যা অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করত। বলত,

—গানে গল্পে কবিতায় নাটকে ছবিতে যা যখন ভালো করে ফোটাতে পারি, ফোটাবো। বাংলায় সব পারা যায় না—ইংরেজীতে লিখব। ইংরেজীর চেয়ে সাবলীল সার্বজনীন ভাষা আর নেই।

ইংরেজীতে একটা উপন্যাসই ফেঁদে বসেছিল প্রেমেন। আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর প্রেমেনকে ভালোবাসতেন। বলেছিলেন,

তুমি সব্যসাচী, বাংলায়ই তুমি সব পারবে। বাংলা ভাষার ব্যবহারে তোমার ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি, অপচয় কোরো না।

স্নেহকাতর ছিল প্রেমেনের মন, কিন্তু প্রকৃতি শিল্পীর গ্রহণ বর্জনের নির্মমতার অভাব তা বলে ছিল না। শিল্পীসত্তায় অনমনীয়, কিন্তু জীবনপ্রেমিক। প্রেমেন ওর সার্থক নামকরণ।

সাহিত্য সমালোচনার স্পর্ধা আমার নেই, বিচারের দক্ষতাও নেই। আমার মনের গভীরে যে অকলঙ্ক স্মৃতিফলক জ্বলজ্বল করছে, তারই প্রতিফলন লিপিবদ্ধ করে যেতে পারি শুধু, তার বেশী নয়।

বয়োধর্মে—আঘাত দেবার জন্য, ঝাঁকি দেবার জন্য গল্প লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিল প্রেমেন, হয়েছিলাম আমিও। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' অমনি গল্প। আমার পটলডাঙার পাঁচালির গল্পগুলোও তাই। মানুষ কতরকম ফাঁদে জড়িয়ে চিরসুন্দর জীবনকে বাঁধে—বিকৃত বিকলাঙ্গ করা সত্ত্বেও নির্মূল করতে পারে না। নিজের অতিসীমিত

ক্ষমতায় আমিও তাই করেছি বস্তির জীবনালেখ্য, কানা খোঁড়া খাঁদা লম্পট চোর জোচ্চোর পকেটমারের ছবি এঁকে। জীবনবোধের পথে প্রেমেন ও আমি বহুমুখী শাখা-প্রশাখায় দূর-দূরান্তরে চলে গিয়েছি, কিন্তু জীবনপথে ভালোবাসতে পারা, আর না থামতে পারাই যে সবচেয়ে বড়ো পারা, এই সত্য সেদিনও পথ দেখিয়েছে আজও দেখায়। জীবনই সাহিত্যের মৌল উপাদান।

প্রেমেনের স্পর্শপেলব গ্রহণোন্মুখ মনে অনুভূত ও অধীত কতো ভাব যে নিজস্ব হয়ে গিয়ে পুনঃরূপায়িত হয়েছে অনবদ্য ব্যক্তিগত ব্যঞ্জনায় ও নিজেই তার খোঁজ রাখে না। Leonard Merrickএর Call of the Past গল্পের সঙ্গে 'পঞ্চশর'এর 'চিত্রা' গল্পের সাদৃশ্য দেখে অবাক হইনি। ও গল্প যে ওর মৌল অনুভূতি-সমুদ্ভব তা বুঝতে বেগ পেতে হয়নি। আমারও 'স্বাহা' গল্পের সঙ্গে Edna Ferberএর 'Mother Knows best' গল্পের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য আছে, অথচ আমার গল্পটি সে আমলের কোনো বিশিষ্ট পরিবার ও সমাজের আদ্যোপান্ত সত্য ঘটনার গল্পায়ন।

সু-পরিপক্ক ল্যাংড়া আমটির যেমন খোসা সবুজ, ভেতর সুরসাল, প্রেমেনের অবিন্যস্ত উস্কখুস্ক চুল আর কাটা চামড়ার অন্তরালে তেমনি একটি মনোমোহন অন্তর্লোক, যার স্বাদ গ্রহণ করে সেদিনকার বাংলা পাঠককুল প্রলুব্ধ থেকে প্রলুব্ধতর হয়ে উঠেছিল, 'আরো-আরো'র প্রত্যাশায় দিন গুণছিল।

প্রেমেন প্রেমেনই। ওর আর তুলনা হলো না!

সাত

ওই ঢাকাতেই নির্জন সাধনায় কালাতিপাত করছিল আর এক গোষ্ঠী সোচ্চার আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতিতে। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, পরিমল রায় সে-গোষ্ঠীর মুখ্য তিনজন। প্রথমোক্ত দু'জন

আজ স্বনামধন্য, কিন্তু বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ও মেধার প্রাখর্যে যে হয়ত প্রদীপ্ত ভাতিতে জ্বলে উঠতে পারত, তার হয়ে গেছে অকাল তিরোধান। পরিমলের অকালমৃত্যু হয়েছে।

মনে পড়ছে শরৎ চাটুজ্জ্যের সভাপতিত্বে ১৯২৪ সালে মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাতে "মর্ম্মবাণী" নামে ছোট ছাপানো কবিতার বই বিতরিত হয়েছিল। লেখকের নাম বুদ্ধদেব বসু, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে সেই বারেই প্রবেশিকা পাস করা একটি কিশোর। সমাগত বুধমণ্ডলী তরুণ কবির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, মনে আছে পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা আমরা বৃহৎ বঙ্গসাহিত্য প্রাঙ্গণে বুদ্ধদেবের সে গৌরবে অতিমাত্রায় গর্বিত বোধ করেছিলাম। আজ বঙ্গসাহিত্য ত বটেই, বিশ্বসাহিত্য দরবারে বুদ্ধদেব বসু একটি স্মরণীয় নাম, আমাদের অপরিসীম গৌরববোধের আত্মতুষ্টি উত্তরোত্তর বাড়িয়ে গিয়েছেন তিনি আজ অভ্রংলিহ যশের শিখরে আরোহণ করে।

তৎকালীন তরুণের অভিযানে কলকাতায় 'কল্লোলে'র সঙ্গে কিছুদিন পরেই হাত মিলিয়েছিল ঢাকার 'প্রগতি', সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেবের যুগান্তকারী গল্প 'রজনী হল উতলা' কল্লোলে বেরিয়ে সোরগোল তুলেছিল খুব, যদিও গল্পটির কাঠামোর সঙ্গে কোনো ফরাসী গল্পের ইংরেজি অনুবাদের মিল ছিল। হুবহু অনুবাদ কি অবলম্বন করা গল্পে মূল লেখকের স্বীকৃতি জ্ঞাপন না করা অপরাধ, কিন্তু লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত গল্পে যদি কোনো বিদেশী গল্পের সাদৃশ্য থাকেও সেখানে স্বীকৃতির কোনো কথা ওঠে না। ঐ নিয়ে শনিবারের চিঠির দলের জনৈক ফরাসীবিদ কটু মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন জানি, কিন্তু বিজয়ের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডার পর আর করেন নি।

সে একদিনই গেছে। সাহিত্য, সংগীত, অভিনয়, সমাজ ও রাজনীতি, সমস্ত ক্ষেত্রেই ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল বাঁধন ভাঙার দিন বলে স্মৃতিপটে চিহ্নিত হয়ে আছে। সাহিত্যে দলের পর দলের ত

কথাই নেই, সবুজপত্র, নারায়ণ, বিজলী, ভারতী, প্রবাসী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, শনিবারের চিঠি বিভিন্ন গোষ্ঠীর একাধিক লেখক চমকপ্রদ নতুনতর লেখার মাধ্যমে অচলায়তন ভাঙার কাজে একনিষ্ঠ হয়েছিলেন। আজও নারায়ণে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের 'কমলের দুঃখ' এবং কালিকলমে সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা'র কথা মনে পড়ে। শেষোক্ত উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে ফৌজদারী সোপর্দ হয়েছিল, এবং খুব হৈচৈয়ের মধ্যে আমাদের দিন কেটেছিল।

নজরুল, অজয় ভটচায, ভাদুড়ি ভায়েরা, মনোরঞ্জন, অহীন্দ্র, তিনকড়ি, দুর্গাদাস, সুভাষ বসু সম্প্রদায়, লীলা নাগ, অনিল রায়, সূর্য সেন, অনন্ত সিং—সব নাম করতে পারছি না, বাঙালির তথা ভারতীয়ের জীবনকে আকরিক হীরের টুক্‌রোর মতো হাতে নিয়ে খাঁজে খাঁজে কেটে দিব্যদীপ্তি উৎসারণের তপস্যায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন, যে হীরে দ্যুতিসম্পদে শুধু শোভা বাড়ায় না, কাঁচও কাটে।

আচার ও চিন্তা প্রথা ও অনুষ্ঠানে মান্ধাতার আমলের মূঢ়তা থেকে মুক্ত হবার সঙ্কল্প নিয়ে পূব থেকে পশ্চিম বাংলার যুবশক্তি যে দিন সতেজে আত্মপ্রকাশ করেছিল, নব নব বাল্মীকি নব নব ছন্দে ও লালিত্যে জীবনবোধকে যৌবনের জয়গানে উদ্দাম গতিতে কিন্তু প্রবাহিত করতে চেয়েছিল।

কর্মে, শিল্পে ত্যাগে, প্রেমে, আত্মাহুতিতে পণবদ্ধ তরুণ গেয়ে উঠেছিল—

'সূর্যেরে বাহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ,
তারা, সেদিন সত্যিই গেয়েছিল সেই স্তব, যা,

দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্যাদা করে দান।'

অতীত রোমন্থন বিলাসে অনেক বকছি, আরো হয়ত বকব, আগে থেকে মাপ চেয়ে রাখছি। যথাযথ সময়পঞ্জির ধার ধারতে পারব না, অনেক কথাই আগে পরে হয়ে যাবে—পাঠকেরা নিজগুণে ইত্যাদি।

ঢাকায় তখন আমার পিতার কর্মস্থল হিসেবে মাঝে মাঝে আসা। হালফিল বি. এ. পাস করেছি, কাজকর্মের ধান্দায় কলকাতায়ই থাকতে হয় বেশী।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ (ধ্রুবতারা, উড়িষ্যার চিত্র), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি (রবীন্দ্র অনুকারক কবি), শনিবারের চিঠির ধুরন্ধরেরা এই সময়ে গেল, গেল, বাংলাসাহিত্যের শুচিতা পবিত্রতা, সব গেল, রব তুলে বিষম প্রমাদ গুণলেন সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা প্রবন্ধ ফেঁদে এবং পাল্টা জবাব দিতে লাগলেন নরেশ সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকেরা। শ্লীল অশ্লীলের হাফ্-আখ্ড়াই তর্জা ও খেউড়ে কলকাতা রম্‌রম্ করতে লাগল। কল্লোলী কালাপাহাড়ে বীণাপাণি বাগ্‌দেবীর পূত শুভ্র মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং তার জায়গায় স্থাপিত করেছে আফ্রোদিতের কামকলা সমৃদ্ধ নগ্নমূর্তি। বিয়ের আগে প্রেম লিখিত-সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল, ভিক্টোরীয় কেতাতে বয়স্কা অভিভাবিকার মধ্যস্থতায় ড্রয়িংরুমের ন্যাকা পূর্বরাগ ক্রমশ জাতে উঠছিল, কিন্তু বাঁধন ভাঙা কল্লোলীবর্বরেরা "আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ" জিগীর তুলে গুহাবাসী আদিম মানবের ঢঙে প্রেমিকাকে চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে মিলন-তৎপর হয়েছে। মান্ধাতার আমলের সমাজব্যবস্থা ছত্রছান্ করে দরবার-ই-খাসে বেল্লিক বাজার বসিয়েছে।

তা' বড় তা' বড় লব্ধপ্রতিষ্ঠেরা মারমুখি হয়ে গালিগালাজ করছেন, অত্যল্প ক্ষমতাশালী ঈর্ষাজর্জর কয়েকটি সাহিত্য ব্যবসায়ী শুচিবায়ুগ্রস্ত আরো কয়েকটি অসাহিত্যিকের সঙ্গে একত্র হয়ে সজনীর শনিবারের চিঠির পাতায় আগুন ছোটাচ্ছে। ফল হচ্ছে উল্টো।

অশ্লীল বলে কল্লোল কালিকলম এবং আর গোটা দুই-তিন অখ্যাত কাগজের কিছু কিছু আংশিক উদ্ধৃতি সজনী 'মণি-মুক্তা' নাম দিয়ে প্রতি সংখ্যা 'চিঠি'তে ছাপছে। এতে অশ্লীল কাগজগুলোর বিক্রি চতুর্গুণ বাড়ছে, সবাই গোটা লেখা পড়তে চায়, উদ্ধৃতিতে মন ভরে না।

এর পরিসমাপ্তি এল জোড়াসাঁকো 'বিচিত্রা' ভবনে রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় শ্লীল অশ্লীল বৈঠকে। অশ্লীলদের পক্ষ নিয়ে সেদিন প্রমথ চৌধুরী, অপূর্বচন্দ্র চন্দ, দীনেশ দাস এঁরা দু'কথা বলেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ যে ফতোয়া দিয়ে পরিসমাপ্তি টানলেন তা কোনোরকমেই স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ নবাগতদের প্রখর লিপিচাতুর্য এবং উন্মেষোন্মুখ প্রতিভার কথা স্বীকার করে প্রকারান্তরে তাঁদের স্বাগতই জানালেন।

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বন্ধু লাভ অচিন্ত্য। কবি ও প্রেমিক অচিন্ত্যকে হৃদয়াসনে অন্তরঙ্গ বন্ধুভাবে পেয়েছি, সেই রূপেই সে আমার স্মৃতিতে আজও সুপ্রতিষ্ঠ। প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে আজ সে ঔপন্যাসিক বা ভক্তি-প্রাসঙ্গিক হওয়া সত্বেও তার প্রথম পরিচয়ের সৌহার্দ্য অটুট রেখেছে আমার মনে। তীব্র কৌতুকবোধ ওর সহজাত, মর্মভেদী বিদ্রূপবাণ ছাড়তে আজও ওর জুড়ি নেই, কিন্তু ওর আসল শিল্পীসত্তা কবির।

তাই বলে একথা বলার অভিসন্ধি আমার নেই যে সে সুদক্ষ কথাকার নয়। বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের পটভূমিকায় ওকে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কাহিনী-সম্ভারেও বৈচিত্র্য তাই বেড়েও চলেছে। জাতশিল্পী সে, জীবনের অভিজ্ঞতা মর্মে বাসা বেঁধেছে, কুশলী তুলির টানে অপূর্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করেছে তার ধ্যানের ধন, সাধনার ঐশ্বর্য। পরিবেশিত হয়েছে থরে থরে ভারে ভারে রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্মে।

তবুও আমার স্মৃতিতে অচিন্ত্য মূলত কবি।

অচিন্ত্য প্রেমেনের আবাল্য বন্ধু। প্রেমেনকে চিনলাম, জানলাম কিন্তু অচিন্ত্যকে প্রথম পরিচয়েই ভালোবাসলাম। স্ব-ভাবে মিল ছিল হয়ত কোথায়ও।

প্রকাশপ্রাচুর্যে অচিন্ত্য ছিল উচ্ছল, প্রেমেন সংহত। কল্লোল অফিসে আড্ডা মেরে গল্প করে রাত বেশী হয়ে যেত এক একদিন, ট্রাম বন্ধ হয়ে যেত। বাস তখন ছিলই না। রিকশও না। ট্যাক্সি কি ফিটন— গভীর রাতের যানবাহন, কিন্তু অনেক খরচের ব্যাপার। কল্লোলীদের ট্যাঁক প্রায় সবায়েরি গড়ের মাঠ। পটুয়াটোলা থেকে পূর্ণ থিয়েটারের মোড়, ঝাড়া মাইল পাঁচেক রাস্তা, হণ্টনে মারতে হতো। নেপেনও ওই পাড়ার। একদিন আমি ছিলাম সাথে। তিরিশ নম্বর গিরীশ মুখুজ্জে রোডে দাদার বাসাবাড়িতে অচিন্ত্য থাকত। রাত বারোটার পর চুপিসারে সিঁড়ির নিচের ঘরে ঢুকে অচিন্ত্য পেল ঢাকনা খোলা ভাতের থালা—বেড়ালের ভুক্তাবশিষ্ট। কুঁজোর জল ঢকঢক করে খেয়ে শুয়ে পড়ল। নেপেন তার বাড়ির রাস্তা, আমি ফিরতি আমহার্স্ট স্ট্রীটের মেসের রাস্তা ধরলাম। হিন্দু হস্টেলের বাস তখন উঠেছে, থাকি মানিকতলা আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় বরাবর ৭৫বি আমহার্স্ট স্ট্রীটের মেসে। ফিরতি পথই ছ মাইলের ওপর। কেয়ারই করতাম না তখন।

নেপেন মাঝে মাঝে শোনাতো, অচিন্ত্য নাকি আমাদের মধ্যে রোজগেরে। বিয়ের পদ্য লিখে দিব্যি রোজগার ওর। বর কনের নাম, আর মা, মাসী, দাদা, দিদি, বৌদি, বোন—কার হয়ে লিখতে হবে—বলে দিলেই হলো। দশ কুড়ি লাইনের পদ্য হাতে হাতে রেডি—নগদ মূল্য আট আনা। শুনে হিংসে হতো। অচিন্ত্যকে বললে হাসত, কিন্তু হদিস বাতলাত না।

টাকা-পয়সার বাজার ভারী টাইট ছিল সে আমলে। ব্যক্তিগত যশাকাঙ্ক্ষা শিকেয় উঠিয়ে রেখে বহু ক্ষমতাশালী তরুণ লেখক সাহিত্য-যশোলিপ্সু রাজা মহারাজার বেনামীতে গল্প উপন্যাস লিখে

দিব্য দু'পয়সা রোজগার করত। শুনতাম বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চান্দ মহাতাবের ভারতবর্ষে প্রকাশিত সব লেখাই কোনো এক প্রবীণ-সাহিত্যজীবীর লেখা। শনিবারের চিঠির সজনীও কোন রাজপুত্রের হয়ে উপন্যাস লিখে দিয়েছিল শুনেছি।

কবিতায় ত নয়ই, গল্প লিখেও পয়সা পাওয়া দুরূহ ছিল। ছাপার অক্ষরে নাম দেখবার আনন্দই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার গণ্য করতাম আমরা। সম্পাদক প্রকাশকগোষ্ঠী লেখকের মাথায় কাঁটাল ভেঙে রেস্ত গুছোচ্চেন, একথা কেউ বলতে এলেও আমলে আনতাম না।

পয়সার কথা থাক। বয়সে আমাদের থেকে পাঁচ থেকে দশ বছরের বড়োদের মধ্যে দু'জন কবি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আমাদের ওপর। মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন সেনগুপ্ত। তাঁদের মতবাদ কি কাব্যধর্ম নিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা উত্তরকালে বহু গণ্যমান্য গুণীরা করেছেন। তাঁরা দেহবাদী, দুঃখবাদী ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত হয়েছেন। মতবাদের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে নয়, জীবন জিজ্ঞাসার নতুনত্বেই তাঁরা আলোড়ন তুলেছিলেন আমাদের মধ্যে।

অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করলেন মোহিতবাবু,

—"কটিতলে জন্ম রাজধানী, উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ উৎস।"

"সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি মিথ্যা সনাতনী।
সত্যেরে চাহিনা তবু, সুন্দরের করি আরাধন
কটাক্ষ ঈক্ষণ তার হৃদয়ের বিশল্যকরণী!
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত রচনা!"

মহাকাব্যে সৃষ্টি ও প্রলয়ের ছবি আঁকলেন তিনি—

"নিঃসঙ্গ হিমাদ্রিচূড়ে জ্বলিয়াছে হর কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি গুমরি।
উমা সে গিয়েছে ফিরে ম্লান চোখ অশ্রু ছলছল
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন উপরি।

আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্বফল,
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি !
—বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল,
আহা মরি মরি !"

যতীন সেনগুপ্তের বিচ্ছিন্ন চমকপ্রদ কবিতার লাইনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হিন্দু হস্টেলে থাকতেই, তখনো ওঁর কোনো কবিতার বই বেরোয় নি। ওঁর নিকট আত্মীয় রমাপতি গুপ্ত, আমরা ডাকতুম নন্দুদা বলে, প্রায়ই ভগ্নীপতির কাছে কেষ্টনগরে যেত। যতীনবাবু কেষ্টনগরে সে সময়টা ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। নন্দুদা উইক-এণ্ড সেরে হস্টেলে এসে শোনাত "মরণে কে হবে সাথী, প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি", "তুমি শালগ্রাম শিলা, শোওয়া বসা যার সকলি সমান তারে লয়ে রাসলীলা" কিংবা "চেরাপুঞ্জির থেকে, একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে ?" আমরা সব তাজ্জব বনে যেতাম কবির বলিষ্ঠ ভাষণে।

তারপর 'মরীচিকা' বেরুল।

"কে গাবে নূতন গীতা
কে ঘুচাবে এই দুখ সন্ন্যাস গেরুয়ার বিলাসিতা ?
কোথা সে অগ্নিবাণী
জ্বালিয়া সত্য দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি !
কালোকে দেখাবে কালো করে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো,
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যতো বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো !
খেলোয়ারী প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা
বক্ষ ভেদিয়া মর্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্মব্যথা ?
একথা বুঝিব কবে,
ধান ভানা ছাড়া কোনো উঁচু মানে থাকেনা ঢেঁকির রবে ?"

কল্লোলের বাস্তববাদীর দল সাহসে অকুতোভয় হল। কালোকে দেখাবে কালো করে, এ যেন যুগনির্দেশ। ছেঁদো, ন্যাকা, মিষ্টি মিষ্টি

প্রেমের গল্প কবিতা, যার অর্ধেকের বেশী ব্যর্থ রবীন্দ্রানুকরণ,—সে সব সজোরে পরিত্যাগ করে নির্মম রূঢ় সত্যের বেসাতী করতে লেগে গেল তরুণ লেখকের দল। কিন্তু নেতিবাদ কি দুঃখবাদের কবি যতীনবাবু আদৌ নন, তিনি তিক্ত সত্যের পূজারী। তিনিই লিখলেন,

"উঠে চারিদিকে চিরবন্ধনে ক্রন্দন কোলাহল
চরণে চরণে বাজে ঝন ঝন সুকঠিন শৃঙ্খল।
অসীমের কারাগার
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ার মেলে না পার।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি ?
কয়েদে যখন, ব্যবস্থা করো কয়েদীরই মতো রহি।
নচেৎ মুক্তি দাও
চারিদিকে এই অসীমের সীমা একেবারে তুলে নাও,
জীবনে মরণে কর্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন,
বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি
আপনারে ঘিরে প্রতি মুহূর্তে গড়িব আপন সৃষ্টি !"

নবযুগের এই নতুন গীতা মুখে মুখে ফিরত আমাদের। সোচ্চার সব চেয়ে বেশী ছিল নেপেন, প্রাণ ঢেলে আবৃত্তি করতে ওর আর বুঝি জুড়ি হলো না।

আট

খাপছাড়া সে আমলের কথাই বলব, টানা। ইতিহাস নয়। যাদের কথা বলব, সময় পরম্পরার তোয়াক্কা না রেখে, তাদের কেউ আমার মনে স্থায়ী আসন নিয়েছে, কেউ বা একটুক্ষণের জন্যে বসন্ত হিল্লোল তুলে মিলিয়ে গেছে, কেউ বা ব্যথার দাগে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে।

উত্তর জীবনে ধূর্জটিদার একটি কথা মনে পড়ে। সুধীন দত্তের বাড়িতে পরিচয়ের সাপ্তাহিক বৈঠকে দেখা হবার পর প্রায় পনেরো ষোলো বছর পরের কথা। ১৯৩৯ কি ৪০ সালে, অসুস্থ হয়ে আছেন জেনে দীর্ঘকাল পরে দেখা করতে গিয়েছি শম্ভু পণ্ডিত স্ট্রীটে তাঁর ছেলে কুমারের বাসায়। শুনেছিলাম কণ্ঠনালীর ব্যাধি, কথা বলতে পারেন না ভালো করে। ধূর্জটিদার বাক্‌রোধ, এ যে কি মর্মন্তুদ দুঃসংবাদ—যারা তাঁকে না চেনে তাদের মাথায় ঢোকানো শক্ত। কথোপকথনকুশলী ঐ মহাপণ্ডিত ও সুরসিক মানুষটির কতো বিষয়ে কতো কথা কতো বাচনভঙ্গীতে মর্মপটে খোদাই হয়ে আছে সে বলে উঠতে পারব না। তিনি আজ বাক্‌শক্তিহীন, ক্ষুব্ধ মনে সিঁড়ি ভেঙে তেতলার ছাদে উঠলাম।

পৌঁছে দিয়ে কুমার নিচে নেমে গেল। সঙ্গে শচীন চৌধুরী, বম্বের ইকনমিক উইকলির সম্পাদক, অল্পদিন আগে মারা গেছেন—ছিলেন। তিনিই বললেন,

মনীশ এসেছে দেখা করতে।

যেন পনের বছর আগেকার পরিচয়ের দুই আড্ডাধারী আমরা, মাঝখানে এতটা দিন যেন কাটেই নি, তেমনি অন্তরঙ্গভাবে, অতি মৃদু স্বরে ধূর্জটিদা বললেন,

—আরে এসো। শেষ করেছো গল্পটা—ঐ "ভায়োলেট মিত্তির, ভ্যাম্প" গল্পটা? মুখে মুখে কাঠামোটা তো বলেছিলে সেদিন—লেখা হয়ে গেছে?

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। স্মৃতির সুতো টেনে দীর্ঘকাল আগে ওড়ানো ঘুড়ি নিচে নামাতে সময় গেল। 'স্বাহা' নামে একটি গল্প বেরিয়েছিল পরিচয়ে—খুব তারিফ যাঁরা করেছিলেন, ধূর্জটিদা তাঁদের মধ্যে একজন। প্রসঙ্গত বলেছিলাম, ট্রিলজির তিনটে গল্পের 'স্বাহা' একটা, আরো দুটো লিখেছি, 'ভায়োলেট মিত্তির ভ্যাম্প' ও আর একটা। 'স্বাহা' গল্পেও ভায়োলেট বলে একটি চরিত্র ছিল।

যে হেতু স্বাহা গল্পের অপরাপর চরিত্রের সঙ্গে তৎকালীন ইঙ্গবঙ্গ সমাজের বিচ্ছিন্ন যুবক-যুবতীর সৌসাদৃশ্য ছিল, এবং যেহেতু পরিচয় দঙ্গলের বেশ কয়েকজন ঐ ইঙ্গবঙ্গ সমাজভুক্ত, প্রতিটি চরিত্র নিয়েই সেদিন "একে—একে গো"! গোছের চোখ চাওয়া-চাওয়ি ঘটেছিল। ভায়োলেট চরিত্রটিও অভিনিবেশ আকর্ষণ করেছিল, অনেকেই সে গল্পটা অচিরে শেষ করে পরিচয় দিতে বলেছিলেন। ধূর্জটিদা সেই জেরই টানলেন, যেন এক বৈঠকের পর সপ্তাহান্তে আবার মিলিত হয়েছি সকলে। মাঝখানের পনের ষোলো বছর যেন কিছু নয়। দীর্ঘকাল পরে প্রথম সাক্ষাতে ঐ কথা তোলাতে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছি ঠাওর করে বললেন,

—অবাক হচ্চো? আরে, তার যেখানে সুরে বাঁধা, কর্তব জলদেই চলুক আর ঢিমেতেই চলুক, সমে ঠিক ফিরে আসবেই। বেসুরো হয় কখনো?

আজ ধূর্জটিদা নেই, কথা ক'টি অমূল্য পাথেয় হয়ে আছে আমার কাছে। দুটি মনের সুরে বাঁধা থাকলে সংগীত অনাহত ধ্বনিতেও চিরজাগ্রত থাকে, ঘা পড়লে সুরেই বাজে, বেসুরো হয় না।

কিন্তু সেদিন অপ্রতিভ হয়ে বলেছিলাম,

—লিখিনি ধূর্জটিদা, তবে প্রায় লেখারই শামিল ধরতে পারো। কাগজে কলম ঠেকালেই হুহু করে লেখা হয়ে যাবে।

ধূর্জটিদা বলেছিলেন,—লিখে ফেলো—নাহলে দেরি হয়ে যাবে হয়তো—

পেছন ফিরে আবার ফিরি ২২।২৩ বছর বয়সের জীবনে, ঢাকাতে।

জীবনে পরম লগ্ন একবারই আসে, বছর বছর বসন্ত ঋতু আবির্ভাবের মতো বারে বারে নয়। জীবনের সেই শুভক্ষণে হাতে পড়ল টুনু (অজিত দত্ত)-র লেখা 'কুসুমের মাস'। অমনটি আর পড়লাম না। বুদ্ধদেবের 'মর্মবাণী' ইস্কুলের ছেলের' লেখা. বলে

দেবার দরকার হতো না। কিন্তু অজিতের 'কুসুমের মাস' শিক্ষা-নবীশের কাব্যচর্চা নয়, নিজ দাবিতে স্মরণীয় পরিণত কাব্য।

সুঠাম সুন্দর চেহারা, সুকুমার সুকোমল-মন ব্যঙ্গপ্রিয় কিন্তু বিদ্রূপবর্ষী নয়, বসন্তের দূত এই কবিকে একেবারে আপনার জন মনে হলো। বহু দিন গেছে। খেলায় ধূলায় সাহিত্য ও জীবন-চর্চায় দুজনে অভেদাত্মা হয়ে দিন যাপন করেছি বাইরের কোনো দায় দৈন্যের কথা মনে না এনে। সেই সুরে তার আজও বাঁধা, ফাঁক অনেক, ফাঁকি নেই। হাল্কা মেজাজের প্রবন্ধ লিখে পরিচ্ছন্ন চাতুর্যে পরিমল রায় মন কেড়ে নিয়েছিলেন। প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর অকাল মৃত্যু সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে রইল।

আর একজন, সাহিত্য রচয়িতা নন, রসগ্রাহী—ঐ ঢাকারই। লেখাপাড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন, কিন্তু কর্মোপলক্ষে তাবৎ বাংলা দেশে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরেছেন। বহুদিন পরে, বোধ হয় ১৯৫৭ সালে তাঁর গুণগ্রাহিতার পরিচয় পেয়েছিলাম শ্রীরামপুরে। সেবার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ কবি-সম্মেলনের আয়োজন করছিলেন শ্রীরামপুরে। সম্মেলন শেষে জলযোগ পার্বণের জন্য পাশের কামরায় বহুলোক একত্র হয়েছি, পরস্পর পরিচয়ে আদান প্রদান ও যথোচিত আপ্যায়ন বিনিময় হচ্ছে। একটি স্যুটপরা ভদ্রলোক আমার মুখোমুখি হতেই বিনা ভূমিকায় আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"হলা পিয় সহি
জান্তব জিগীষা বক্ষে অতীতের সে নিষাদ
নহি আমি নহি!
একদা যে আসঙ্গের ক্রূর আক্রমণ
সবিদ্রূপে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষা পণ
বধির বাসব হস্তচ্যুত বজ্রসম
তোমারে করিলো চূর্ণ, আমারি নির্মম

স্বার্থ-পরমার্থ দ্বন্দ্বে আজি নির্বাপিত
সে অনল, স্মৃতি ভস্মস্তূপে সমাহিত !
অনলস কাল আবর্তনে
মহীরুহ হয়েছে অঙ্গার : হয়ত পরম কোনো ক্ষণে
অঙ্গারে ফুটিবে হীরা, আজি যে প্রসঙ্গ অবান্তর"

ইত্যাদি।

বিব্রত হয়ে (কিন্তু পরম পুলকিত হয়ে—কারণ লাইন কটি আমার লেখা "পরমা" কবিতা থেকে) ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ভদ্রলোক হোহো করে হেসে উঠলেন। বললেন,

—চিনলেন না ? আমি অবনী ! হুগলিতেই আছি।

ও হরি, ঢাকার অবনী কুশারী ! হুগলির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। দু'জনে অন্তরঙ্গভাবে করমর্দন করলাম। বললাম,

—এত গুরুতর রাজকার্যের মধ্যেও মনে আছে এসব ?

—থাকবে না ? যে কবিতা ভুলে যাব, সে কি কবিতা ?

আসল কবিতা ত রসিকের অন্তরে শিলালিপি ! আপনি ত প্রথম কবিতার বইয়ের নামই দিয়েছিলেন 'শিলালিপি'—কি সার্থক উদ্ধৃত নাম ! লজ্জা পেলাম অবশ্য। বললাম,

—কবিতা ভালো লাগলেই সবাই কি পঁয়ত্রিশ বছর পরে নির্ভুল আউড়ে যেতে পারে ? রসবোধের সঙ্গে স্মৃতিশক্তিটাও প্রখর হওয়া চাই বই কি ! আপনারা হলেন সরস্বতীর নম্বরী চ্যালা, সব সময় একনম্বর। আপনাদের দ্বারাই সম্ভব।

আরো অনেক কথা হয়েছিল সেদিন কুশারীর সঙ্গে। তার সাহিত্যপ্রীতির নিষ্ঠা দেখে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম। মনীষার সঙ্গে রসবোধের সমন্বয় বহুক্ষেত্রে ঘটতে দেখেছি। শ্রুতিধর সবাই হয় না—ওটা আলাদা একটা গুণ। অচিন্ত্যের অল্পাধিক ও গুণ আছে। আমিও মাথায় বোমা মারলেও প্রিয় কবিতার আরম্ভের লাইনের বেশী মনে করতেও পারি না—অন্তত নির্ভুলভাবে।

আমার মনের ওপর পাত বড় চঞ্চল, রঙ্গে ভঙ্গে রসতরঙ্গে সদা বিক্ষিপ্ত।

বিশের দশকের দু একটা গল্প বলি।

বি. এ. পাস করে অচিরাৎ চাকরির চেষ্টা করা মধ্যবিত্ত বাঙালির ছেলের পক্ষে জ্বর হলে সাবু বার্লি খাওয়ার মতো। একটা "অবশ্য" ব্যাপার। আমাকেও করতে হয়েছে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের চাকরি। প্রবেশনার অ্যাসিসট্যাণ্ট। বড়ো কদরের অফিসার বানাবার জন্য প্রবেশনার নেওয়া শুরু হয়েছে মাত্র বছর দুয়েক আগে—১৯২২ কি ২১ সাল থেকে? হিন্দু হস্টেল থেকে ১৯২৪-এ আমরা জনকয়েক ইণ্টারভিউ পেয়েছি। দরখাস্তকারীদের একটা প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষা ছিল—সেটা মামুলি ব্যাপার। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে ইণ্টারভিউয়ে ডাক পড়েছে। সর্ব-ভারতীয় ব্যাপার।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তখন পুরোপুরি বণিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্কের হর্তাকর্তা বিধাতারা সবাই ক্লাইভ স্ট্রীটের জাঁদরেল অর্থাৎ বিভিন্ন বণিক সংস্থার কিছু কিছু সর্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি। কপালগুণে এক জাঁদরেলের সুপারিশ জুটে গিয়েছিল আমার। জেম্স্ ফিন্লের শাখা অফিস ছিল চাটগাঁ বন্দরে, ক্ল্যান লাইন জাহাজের কাজ। বাবা ক'দিনের জন্য অস্থায়ী জেলা অধিকর্তা হয়েছিলেন, সেই সুবাদে চাটগাঁর লিশম্যান মারফত ক্লাইভ স্ট্রীটের ট্যাসি পর্যন্ত অধমের তরফে তদ্বির হয়েছিল। সার জেম্স ট্যাসি জেম্স ফিন্লের ভারতবর্ষে বড় সাহেব, এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গভর্নরদের অন্যতম। কাজেই বিদ্যেবুদ্ধি অর্থসামর্থ্য যত কমই থাকুক না কেন, প্রাথমিক পরীক্ষার বেড়া টপকাতে আদৌ বেগ পেতে হয়নি। রেসের ভাষায় রেঙের মুখ পেরোনো জিতিয়ে ঘোড়ার দলে ভিড়ে যেতে পেরেছি।

ইণ্টারভিউও একাধিক হওয়া সারা। প্রত্যেকটাতেই বাছাইয়ের মধ্যে টিকে যাচ্ছি। সেদিন গভর্নর বোর্ডে আখেরি মোলাকাৎ।

শিলচরের মণি অধিকারী এবং আমি, দু'জনেই শেষ পর্যন্ত আছি। অধিকারী ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র, ইকনমিক্সে ফার্স্ট সেকেণ্ড হওয়া ছেলে। মুরুব্বীও জোরদার—তৎকালীন পৃথিবীখ্যাত কোনো সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র অধিপতি বিবাহসূত্রে ওর নিকট আত্মীয়। তাঁকে অখুশী করে কোনো বিদেশীরই ভারতবর্ষে নিরঙ্কুশ বাণিজ্য করা শক্ত। কাজেই কলকাতা ত দূরস্থল, যাবতীয় ভারতবাসী বিদেশী বণিক সম্রাটরা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। অধিকারীর হয়ে যাবে প্রায় জানা কথা। শেষ বৈঠকে সারা ভারতের আরো জনকত বাছাই করা কেঁদো কেঁদো নমুনা রয়েছে। চাকরি মোটে তিনটি—কাজেই ধরে নিয়েছি আমার হবে না।

চাকরি অনেকের কাছে, এবং যথার্থ কারণেই, জীবন-মরণের সমস্যা। আজকেই সূর্যাস্তের আগে জানা যাবে হবে কি হবে না। বিধাতাপুরুষ অদৃশ্য কালিতে ভবিতব্য অল্‌রেডি লিখে রেখেছিল—অক্ষর ফুটে উঠতে যেটুকু দেরি।

ইণ্টারভিউয়ে যাবার পথে ধড়াচূড়া এঁটে (অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে) অসোয়াস্তি ভোগ করতে করতে রওনা দেওয়া গেল। আগে কখনো শেভ করিনি শুধু গোঁফের রেখা ও চিবুকে কচি রেশমের মত কেশোদ্গম হয়েছে। অধিকারী আগে থেকে কামায়। যাবার পথে ভব্যতর হবার জন্যে রসিদের হাজামতি সেরেস্তায় ঢুকল, সঙ্গে আমি। ধর্মতলায় বর্তমান জ্যোতি সিনেমার পাশে 'ইউনিয়ন হেয়ার ড্রেসিং সেলুন' ছিল সেকালে।

অধিকারীর কামানো মায় হেয়ার কাট, হয়ে গেল। ঘাড়ে কাঁধে রান্দা, মাথার দু'পাশ ধরে বিপর্যয় ঝাঁকুনি, জল, ক্রীম, পমেটম ইত্যাদির পালা শেষে দিব্য ফিট্‌ফাট্ চুনোগলি বনে গেল সে। বলল,

—তুই কামিয়ে ফ্যাল্।

—ধেৎ—কখনো ক্ষুর ছোঁয়াই নি—

ওজর টিকল না। অধিকারীর তদ্বি, রসিদের ছেলে ভোলানো স্তোক,—বেমালুম মাকুন্দ বানিয়ে ছেড়ে দিল দু' মিনিটে।

আয়নায় মুখ দেখে মন বলল ছি ছি।

ঢ্যাঙাটুকু বাদ দিকে বিলকুল ফিমেল পার্টে নেমে যাওয়া যায়, স্রেফ বুকে দুটো নারকেল মালা আঁটার ওয়াস্তা।

বললুম,

—তুই যা। আমি যাব না।

এদিকে চারটায় ইন্টারভিউ, সময় হয়ে এল, নারাজদিল, তবুও যেতে হলো, তবে।

যাবার আগে চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে গ্লাসকেসে হরেক রকম ফল্‌স্‌ গোঁপ সাজানো। রসিদ থিয়েটার ফ্যান্‌সিড্রেসের মেকাপও বিক্রি করে, বাবরি, দাড়ি, কার্ল, এইসব। ভাববার সময় বেশী নেই, ঝটপট বাছাই করে রসিদকে বললাম,

—ওই খঞ্জন পাখির মতো গোঁফটা লাগিয়ে দাও। জলদি।

রসিদের আর কি! দি মোর দি মেরিয়ার! আধ মিনিটে সিনরিট গাম দিয়ে গোঁফ বসিয়ে কাঁচি দিয়ে মানানসই ছাঁটকাট করে সাব্যস্ত করে দিল।

আয়নায় মুখ দেখে নিজেকে নিজেই চিনি নে, সে এক জ্বালা। 'হিশ ফিশ ড্যাম্' গোছের বিলেত-ফেরত কুলাঙ্গারের আদল হুবহু এনে দিয়েছে। এখন ঠোঁটের কোণে পাইপ গুঁজে বললেই হয়,

—এই নিগার, বাগ যাও—হটো।

অধিকারীতে আমাতে একচোট হাসির হুল্লোড় শেষ হলে ও বলল,—এই চেহারায় যাবি নাকি তুই?

—অফ্ কোর্স—হোয়াই নট? এইন্‌ট আই প্রেজেন্টবল?

—ত্যাখ, এ সব সিরিয়স ব্যাপার—

—বুঝলাম। কিন্তু এখন আঠা ওঠানো ঘষা মাজা, আবার নতুন করে মুখ পালিশ—বিস্তর সময় লেগে যাবে।

সে কথা সত্যি, মানতেই হলো ওকে। অগত্যা ওই বেশেই গেলাম দু'জনে স্ট্র্যাণ্ড রোডে ব্যাঙ্কের হেড্ অফিসে।

ফাইন্যাল ইণ্টারভিউয়ের অল্প ক'জনার দলে কলকাতার চেনা-শোনা মণি অধিকারী ছাড়া আর কেউ ছিল কিনা মনে পড়ছে না। তবে যারা ছিল, তারাও ত আগের বাছবাছাইয়ের সময় নির্গোঁফ বদনমণ্ডল দেখেছে। হায়দরাবাদ আগত একটি নবাবজাদার মতো চেহারার উমেদার বলল,

—ওয়াণ্ডারফুল, মাই ফ্রেণ্ড! উইশ্ ইউ সাকসেস্।

অধিকারী এর মধ্যে খবর নিয়ে নিয়েছে গভর্নরের দলে আমার মুরুব্বী ট্যাসি সাহেব আসেন নি। তার মানে, অধিকারী বলল,—তোর হয়ে যাবে।

—কি করে বুঝলি?

—যার কথা বেদবাক্য। সে যখন আসে না, তার মানে, তার সুপারিশের লোক আছে। আর সে কথা অন্য গভর্নরদের নিশ্চয় বলে দিয়েছে। এটা আর বুঝলি না?

বুঝলাম কি আমিই জানি, চুপচাপ থাকলাম। চাকরি হবে না, এই বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে, খানিকটা ইয়ার্কি করতেই যেন এসেছিলাম। অধিকারীর কথায় মনটা মুষড়ে গেল—এসব ঠাটঠমক বাদ দিলেই যেন ভালো হতো।

পালা করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার দুত্তিন ডাক হলো সবায়েরি। গভর্নর-রা এত বড়কর্তা, যে চাকরির উমেদারদের চেহারা আগের দিন দেখে মনে রাখার আবশ্যক বিবেচনা করেন না। কিন্তু একটি সুপুরুষ ছোকরা সাহেব অনেক কাগজপত্র হাতে ঘোরাফেরা করছিল এর কাছ থেকে ওর কাছে, আমি বেরোতেই বাইরে এসে বলল,

—ইউ হ্যাভ হ্যাড এ লাশাস্ ভেজিটেশন ওভার ইওর লিপস্ ওভার নাইট—ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল,—!

পরে জেনেছিলাম, ও মুরহাউস্, সেক্রেটারী ট্যালাকের পি. এ।

আশ্চর্য, আমার আর অধিকারীর একবারই ডাক হয়েছিল। আর সবায়েরি একাধিকবার। ডাকাডাকির পালা সাঙ্গ করে বাইরে সবাই জোট পাকাচ্ছি, এবং বলতে লজ্জা নেই, বুক দুরুদুরু করছিল এই প্রথমবার।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর চশমা চোখে বয়স্ক ট্যালাকের পাছু পাছু মুরহাউস বেরিয়ে এল লিস্ট হাতে। এসেই নাম পড়তে লাগল। যাদের চাকরি হয়েছে তারা হলেন এক নম্বর আগ্রা না নয়া দিল্লীর ন্যাথানিয়েল সিন্‌ক্লেয়ার ডে, দু'নম্বর মণি অধিকারী ও ৩নং আমি। আরো তিন জন রিজার্ভিস্ট-এর নাম পড়ে দিল, তার প্রথম নাম হায়দরাবাদের নবাবজাদার। সে এসে সর্বপ্রথম আমাকে জড়িয়ে ধরে কনগ্রাচুলেট করল।

অধিকারী ইতিমধ্যে সাহেবদের সামনেই আমার লাগানো গোঁফ ছিঁড়ে উল্লাসে নাচতে শুরু করল। মুরহাউস্ এগিয়ে এসে আমার পিঠে আদরের থাবড়া মেরে বলল,

—মাস্ট সি মোর অফ ইচ আদার! হোয়াট এ বয়—

বেরিয়ে এসে যে যার মতো বাড়িতে টেলিগ্রাম করার পালা ইত্যাদি সারা গেল।

চাকরি পেয়ে গেলাম এবং হারালাম, কি করে সেও এক বিচিত্র ব্যাপার।

বড়শীতে গাঁথা মাছ পালিয়ে গেলে মেছোর মন কেমন হয় তার সোয়াদ পেলাম চাকরি যেতে। যে কাজ পাওয়ার আশা আদৌ করি নি, মুখে গোঁফ এঁটে ব্যঙ্গ কৌতুক অভিনয় করেছি, সেই কাজ পাওয়াও যেমন অপ্রত্যাশিত, যাওয়াও তেমনি পীড়াদায়ক। কারণ চাকরি পেতে পেতেই মায়া জন্মে গিয়েছিল চাকরির ওপর। তাছাড়া তখনকার তুলাদণ্ডে ঐ চাকরিটি আই সি এস্ পদের থেকেও বেশী কাম্য ছিল অনেকের কাছে—নির্ঝঞ্ঝাট অফিসের কাগজ—উচ্চতম

সমাজে অবাধ মেলামেশা ও সম্ভ্রম—আনুপাতিক বেতনও সমস্ত সরকারী চাকরি থেকে দেশী।

কিন্তু হারানোর ইতিহাসের সঙ্গে ব্যঙ্গপ্রবণ ভাগ্যবিধাতা কম কৌতুকেরও সমাবেশ করে নি।

চাকরি পেলেই হয় না, বহাল হবার আগে ডাক্তারী পরীক্ষা দরকার এবং নির্ধারিত ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। এর আগে ভারতীয় সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছিলাম, সেখানে পরীক্ষায় বসবার আগেই মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে হাজির হতে হয়েছিল। সেখান থেকে ছাড়পত্র পেয়ে তবে পরীক্ষায় বসবার অনুমতি মিলেছিল।

ব্যাঙ্কে নিয়মটা একটু আলাদা। পরীক্ষা নির্বাচন হয়ে যাবার পর আদেশ পেলাম ডাক্তারী সার্টিফিকেট দিতে হবে। ব্যাঙ্কের নিজস্ব ডাক্তার বলতে একটি বিলিতি যৌথ কারবার—ক্যাডি ও হাউসম্যান (Caddie and Houseman) সে আমলের বিখ্যাত বিলিতী-বীমা কম্পানীগুলো, আর ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্ক জাতীয় বিরাট সদাগরী হৌস্‌গুলোর ডাক্তার তাঁরা। হাউসম্যানের কাছে যেতে হলো আমাদের।

মণি অধিকারী নির্বিঘ্নে পাস হয়ে গেল। আমি পড়লাম ক্যাসাদে। গোড়ায়ই বলেছি, আমি যে অনুপাতে ঢ্যাঙা, তার সঙ্গে মানানসই পুরুষ্টু নই। দৈর্ঘ্যই হলো আমার কাল। হাউস্‌ম্যান মাপজুঁখে নিল, হাঁটু ঠুকে পা দুলিয়ে দিল, পেচ্ছাপ পরীক্ষা করল, মানে তছনছ করে ছাড়ল একেবারে। শেষ পর্যন্ত ওজন নিল, নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল,

—আই কান্‌ট্‌ সার্টিফাই ইউ টু বি. এ. ফার্স্ট ক্লাস লাইফ্‌।

বলে দেয়ালে টাঙানো একটা ওজনের নামতা দেখিয়ে দিল। ৭২ ইঞ্চির ওপর হলে ১২ স্টোন ওজন দরকার। আমি লম্বায় ৭৪, কিন্তু ওজনের মেরে কেটে এগারো স্টোন ছুঁইছুঁই করছি।

আমি চুপ করে রইলাম। ভেবেছিলাম একবার বলি, যে সাহেব আমি ত আর লাইফ ইনস্যুরেন্স করতে আসি নি, এসেছি বাঙালির ছেলে, চাকরি করতে। যদি কম্‌তি ওজনের জন্যে অকালে পট্‌কেই যাই, তবে ক্ষতি হবে আত্মীয়স্বজনের। লাভ হবে আমার পরে রিজার্ভিস্ট দলের কারো। ব্যাঙ্কের এক শিক্ষানবীশ সাহেবের জায়গায় আর একজন আসবে।

এসব শুধু ভেবেই ছিলাম, বলিনি। মুখ কাঁচুমাচু করে চলে এলাম। মেডিক্যালি আন্‌ফিট রিপোর্ট নিয়ে ব্যাঙ্কের কর্তার কাছে হাজির হলাম।

আবার মুরহাউস্, পি. এ। তার মারফত ট্যাগ্লাক, সেক্রেটারী অ্যাণ্ড ট্রেজারার—মানে ব্যাঙ্কের লাটসাহেব একেবারে। বড়কর্তা। তিনি যা বললেন, তার মর্মার্থ এই যে ব্যাঙ্ক চায় না তাদের এত কষ্টের মনোনয়ন ব্যর্থ হয়। ব্যাঙ্ক রাজি আছে দু'মাস অপেক্ষা করতে। আমাকে ওজন বাড়ানোর সুবিধে দিতে।

উপদেশ দিলেন, ভালো খাও দাও, দার্জিলিং যাও। ডিম, মাংস, দুধ প্রচুর খাবে, দু'বেলা দু'বোতল স্টাউট মানে হদ্দ তেতো বীয়ার খাবে, আর রাত্রে দু আউন্স ব্র্যাণ্ডি।

মাসখানেকের মধ্যেই হুহু করে ওজন বেড়ে যাবে।

সাহেবের উপদেশ যথাযথ পালন করলাম। দার্জিলিং গেলাম, দু'বেলা কসে বীয়ার চালালাম আর দু' আউন্স দিয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আধ বোতল করে ব্র্যাণ্ডি সাবাড় করতে লাগলাম প্রতি সন্ধ্যায়।

মাল টানার দৌলতে বহুৎ বাঙালি সাহেববাড়ির সমবয়সী যুবক-যুবতীর সঙ্গে দহরম-মহরম জমে গেল। কিন্তু আসল চীজটি আমাকে ফাঁকি দিল, মানে ওজন আদৌ বাড়ল না। দু' মাস পর দার্জিলিং ছাড়লাম যথাপূর্বম্ ওজন নিয়ে এবং বীয়ার্ ও ব্র্যাণ্ডি দুটি আমরণ অভ্যাসের তালিম পাকা করে। চাকরি হলো না বটে, কিন্তু পানাভ্যাসটা পোক্ত হয়ে গেল।

হাউস্‌ম্যান তিরিশ বছরের মেয়াদী জীবন সার্টিফাই করতে পারেনি সেদিন। তবু ঠিক সেদিন থেকে হিসেব করে দেখা গেল বেয়াল্লিশ বছর আমি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি এবং আমার জানা-জানতি একাধিক ফার্স্ট ক্লাস লাইফ বহু আগে ফৌত হয়ে গেছে।

সিবিল সার্ভিস্ হয় নি, ব্যাঙ্ক ফস্কে গেল। জীবিকা অর্জনের জন্যে আর কি করা যায়, গুরুজনরা ভাবতে শুরু করলেন। আমার ভাবনা-চিন্তা বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে হয় না। ল' ক্লাসে ভর্তি হয়ে হার্ডিঞ্জে গিয়ে উঠলাম। হার্ডিঞ্জের মেম্বর হয়ে নয়, পিনাকীর গেস্ট হয়ে। পিনাকীরঞ্জন সিংহ ইংরাজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আমাদের আগের বছর, সিভিল সার্ভিসে এক প্লেসের জন্য চাকরি হয়নি, ল' পড়ছে। বি. সি. এস্ পরীক্ষাও দেবে। ইডেনের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে সুশোভন সরকার, পিনাকী, মণি অধিকারী ও বিজয় সেনগুপ্তর কথাই সর্বাগ্রে মনে আসে। আরো ছিল, নিরঞ্জন মুখুজ্জে, সুধাংশু চাটার্জী, দেবীদাস ব্যানার্জী ও হেমেন গুপ্ত। সুশোভন দু'বছরের সিনিয়র, বি. এ. হিস্ট্রিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিলেত চলে গেছে, শিগগিরই ফিরবে। পিনাকী, মণি এক বছরের সিনিয়র ও সুধাংশু, দেবী এক বছরের জুনিয়র। আর সবাই আমরা সহপাঠী।

সহপাঠীদের মধ্যে ইডেন হিন্দু হস্টেলের বাইরেও বন্ধু সংখ্যা কম হলেও নগণ্য ছিল না। অন্তরঙ্গ বলতে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বীরেন ঘোষ। উমাপ্রসাদ সার আশুতোষের ছেলে। ওদের রসা রোডের বাড়িতে কত ছুটির দিন যাপন করেছি সাহিত্য ও চিত্রচর্চা করে। এইখানেই দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়। সে প্রথম হয়। সে তখন বিজু (উমাপ্রসাদ)-কে ছবি আঁকা শেখাত। আমরা অবাক হয়ে তার ব্যায়ামপুষ্ট শরীর দেখতাম ও বাঁশের বাঁশী শুনতাম। আঁকা ছবি দেখে তারিফ করতাম, কিন্তু ছবি আঁকার কলাকৌশলের দিকে বড়ো আগ্রহ ছিল না।

আর বীরেন! অমন বন্ধু জীবনে কম পেয়েছি। ভূপেন বোসের

নাত্নি, ওর বাবাও অ্যাটর্নি। থাকত শ্রীনাথ ঘোষ লেনে। ওর ডাক-নাম ছিল গগন, সংক্ষেপে গণি। ও ভবিষ্যৎ জীবনে অ্যাটর্নি হয়ে ভূপেন বোস ফার্মের পার্টনার ও মোহনবাগান ক্লাবের সেক্রেটারী হয়েছিল। গণি অকালে মরে গেছে, ওর সদাহাস্যময় চেহারা ও পিঠ চাপড়ানোর কথা আজও মনে হয়, মনে হয় হেস্টিংস স্ট্রীট ধরে হাইকোর্টের দিকে এগোলেই বুঝি চাপকানমণ্ডিত নধর বপুটি দেখা দেবে।

পিনাকীর গেস্ট হয়ে হার্ডিঞ্জে বেশ কিছু দিন মানে অন্তত সাত আট মাস কাটিয়ে দেওয়া গেল। হার্ডিঞ্জ হস্টেল এক এলাহী ব্যাপার। কলুটোলা—পিয়ারী সরকার দু'দিক দিয়েই আসা যায়। ইউনিভার্সিটির লাগোয়া। কত ছেলে যে বেওয়ারিশ ডাইনিং রুমে বসে খেয়ে যেত তার সীমা সংখ্যা নেই। আমি সাত মাস থেকেছি, কর্তারা মুখে জেনেছেন পিনাকীর গেস্ট, কোনো বিলও হয়নি, পিনাকীও না, আমিও না, কোনো চার্জ কোনো দিন দিই নি। ল' ক্লাসে একদিন কি বড়োজোর দু'দিন গিয়েছিলাম সাত মাসে, রোজই প্রেজেন্ট থাকতাম, মানে ল' ক্লাসের দুই বন্ধুর মধ্যে একজন না একজন প্রকসি চালিয়ে যেত। সঞ্জীব চৌধুরী বীরবলের ভাইপো, আর প্রফুল্ল গুহ, হাইকোর্টের জজ সুরেন গুহের ছেলে। আমি থাকতাম কল্লোলের দলে ভিড়ে, দুটো চারটে গল্প লিখতাম, আর কজলের সঙ্গে রাতের কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতাম। কত রাত যে ওদের বস্তিতে ঘুরঘুর করে কাটিয়েছি তার গোনাগুনতি নেই।

তা ছাড়া আর একটা দিক্‌ও ছিল। হরিশ মুখুজ্জে রোডে আমার এক মামীমা থাকতেন, তিনি আমাকে ভীষণ ভালো বাসতেন। তাঁর ছেলে নীরেন লাহিড়ী নামকরা চিত্র পরিচালক। তিনি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের একমাত্র মেয়ে। তাঁর ওখানে তথাকথিত ইঙ্গবঙ্গ থেকে কলকাতা, তামাম সারা বাংলার অভিজাত পরিবারের তরুণ-তরুণীর আনাগোনা ছিল। তাঁর সঙ্গেই ত একদিন আলিপুর চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিজয় বোসের বাড়িতে গিয়ে

গোকুল নাগকে প্রথম দেখি। আরো দেখেছিলাম একজনকে—ওরে ববাবা, সে এখন বিখ্যাত দেশনেত্রী। ঘন ঘন বিভা মাসীর বাড়িতে যাওয়া আরো হতো এই জন্যে যে বাবার হুকুম ছিল হস্টেল থেকে ছুটি পেলে সেই বাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। মামীমা শুধু গুরুজন ছিলেন না। তরুণমনের যাবতীয় তোলপাড়ের ভাগীদার ছিলেন, শুনতেন, পরামর্শ দিতেন, উপদেশ দিতেন, বকতেন, ভালোবাসতেন। মামা ছিলেন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

মামীমার গুণের অবধি ছিল না। রাজা-রাজড়ার মেয়ে, লোরেটো কন্‌ভেণ্ট-এর ছাত্রী, কিন্তু বাড়িতে সাদা-মাঠা গেরস্ত বউ। রান্না করতে আর খাওয়াতে ভালোবাসতেন। ইংরেজি ফরাসী বাংলা জানতেন, পড়তেন খুব, আর বাছাই করা বহু বই ছিল তাঁর। একদিন আবিষ্কার করেছিলাম গোপনে কবিতাও লিখতেন। টুকে নিয়ে গিয়ে কল্লোলে ছেপে দিয়েছিলাম গোটাকতক। তাঁর বাপের বাড়ি ত বিদগ্ধ জনের আড্ডা ছিলই, তাঁর বাড়ির অনেকেই আসতেন। আর যেদিন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ আসতেন মেয়ের বাড়ি—তা সপ্তাহে একদিন ত বাঁধা—সেদিন বহু বিদ্বজ্জন সমাগম হতো। ঐ সময়ে বিডন স্ট্রীটের মনোমোহন স্টেজ ভাড়া নিয়ে শিশিরবাবু থিয়েটার করছেন, মামাবাবু কোনো একটা ব্যাঙ্কের হয়ে থিয়েটারে টাকা অ্যাড্‌ভান্স করেছেন, সে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নলিনীরঞ্জন সরকারও ছিলেন। শিশিরবাবু মাঝে মধ্যে আসতেন, ভাদুড়ি ভায়েদের মধ্যে হৃষীকেশ ত ও বাড়ির জামাই হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।

বই পড়ার বেলায় মামীমা আমার গুরুজন ছিলেন না, দোসর ছিলেন। আমি ফরাসী জানতুম না, আজও জানিনে। আঁরি মার্জারের 'লা বোহেম' ও কার যেন লেখা 'আফ্রোদিতি' প্রাঞ্জল বাংলায় মূল থেকে মুখে অনুবাদ করে বলে যেতেন তিনি। সাহিত্য বিচারে শ্লীল-অশ্লীল কোনো মাপকাঠিই যে নয়, এ বোধের বনেদ পাকা যাঁরা করেছেন আমার মনে, মামীমা তাদের মধ্যে প্রধানতমা।

"কুমার সম্ভব" আমার আই. এ.-তে পাঠ্য ছিল। মূল সংস্কৃতে আবৃত্তি করে কতদিন যে তাঁকে 'দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা' ইত্যাদি শ্লোক শোনাতে হয়েছে তার অন্ত নেই। তখন মনের পট ছিল নিষ্কলুষ, যে কাব্যে লালিত্য থাকত একবার পড়লেই কিছুদিনের মতো মুখস্থ হয়ে যেত। যখন 'শিলালিপি' বলে আমার প্রথম কবিতার বই বেরোলো বহুদিন পরে, তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলাম মামীমারও ঐ গুণটি অসম্ভব জোরালো। বইয়ের 'পরমা' নামে কবিতাটি একবার পড়েই কণ্ঠস্থ করেন নি শুধু, বাড়ি-বাড়ি অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ওটি আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করে শোনাতেন। আমার সাহিত্যজীবন বলে যদি কিছু থাকে তবে সেখানে মামীমার স্থান হৃদয়ের নিভৃততম কোণে দয়িতাদের সঙ্গে। আরও দু'টি একটির সঙ্গে তিনিই সত্যিকারের বান্ধবী ছিলেন আমার, যেমন ছিলেন আমার মা একটা বয়েস পর্যন্ত।

মামীমার বাড়িতে বহু তরুণীর সমাগম হতো সেকালে। আমাকে সঙ্গে নিয়েও যে সব জায়গা যেতেন, সেখানেও বিদ্যুৎপর্ণারা অনুপস্থিত থাকতেন না। মামীমা আমার চিত্তচাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করে সকৌতুকে ইন্ধন যোগাতেন। বাইশ-তেইশ বছরের, সে সুখস্বর্গ আজও স্মৃতিফলকে সমুজ্জ্বল। একদিন ব্রাইট স্ট্রীট এবং একদিন মুলেন স্ট্রীটে তাঁর সঙ্গে চায়ের নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম। দুই দিনই দুই বাড়ির কিশোরী কন্যা দেখে মোহিত হয়েছিলাম। তাদের দু'জনারই নাক ছিল অস্বাভাবিক উঁচু ও লম্বা। মামীমা আয়নার মতো আমার মনের ছবি দেখতে পেতেন। ওই দুই বাড়ির গিন্নীর কাছে—একজন মেয়ের মা, ও আর একজন মেয়ের মামী—আমার পরিচয় করে দিয়েছিলেন ঘ্যাঘোভূত বলে। তাঁদের 'কঙ্কাবতী' পড়া ছিল কিনা জানি না, নাকেশ্বরী ভূতিনীকে পাবার আশায় ঘ্যাঘো-ভূতের কূয়োর মধ্যে বসে তপস্যা করার গল্প হয়ত তাঁরা আজো পড়েন নি, কিন্তু আমি লজ্জায় কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম।

এর পর জোড়াসাঁকো বিচিত্রা ভবনের খোলা আঙিনায় ম্যারাপ বেঁধে যেবার প্রথম বর্ষামঙ্গল হয় সে সময় বিজয় বাসু, সুরেন করদের সঙ্গে আমিও একজন বিশ্বভারতীয় পাণ্ডা ছিলাম—আমাদের দলপতি ছিলেন প্রশান্ত মহলানবীশ। অনুষ্ঠানের সময় মহিলাদের বসবার দিকটায় ভাঙা দেয়ালের গা বেয়ে ইয়া বড়ো এক তেঁতুলে-বিছের আবির্ভাব হয়েছিল। মেয়েদের সামান্য আরশোলাভীতি সর্বজনবিদিত। এ'ত জলজ্যান্ত রাক্ষস একটা—সরস্বতীর সিঁথি বা তেঁতুলবিছে। মেয়েরা ভয়ে আর্তনাদ করে কুকুরকুণ্ডলী পাকাতে লাগল, গানের দলের গান থেমে গেল, অবনবাবুর হাতের এস্রাজ আর নাটোরের হাতের মৃদঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেল, সে একটা বিপরীত অবস্থা।

'ওরে পাইক ডাক, বরকন্দাজ ডাক, ডেয়ার আন, লাঠিসোঁটা আন' এমনি গোছের একটা অকেজো কর্ম-কোলাহল শোনা গেল, ফলে নিষ্ফল কর্মব্যস্ততাই শুধু দেখা দিল, কাজ কিছু হলো না। আমি ঢ্যাঙা মানুষ, দেখলাম হাত বাড়ালেই পাব। পা থেকে স্যাণ্ডাল খুলে এক পাদুকাঘাতে বিছেটা মেরে ফেললাম। ক্রমে কোলাহল শান্ত হলো, উৎসব আবার শুরু হলো। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি বর্ষীয়সীকে বলতে শুনলাম,

—বিভার সেই ধ্যাঁঘোভূত ভাগ্নেটা না? ভয়ডর কিছু নেই রে বাবা, জংলি একটা!

তা জংলিই হই আর যাই হই, একটা সমূহ বিপদ থেকে অবস্থার মোড় ঘোরালাম, তার জন্য একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধা ছিল কি?

—কী সাহস, তাই না রে? গোছের একটা মৃদু কণ্ঠ শুনেছিলাম অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে থেকে। দশ হাত বুক ফুলে একটা হিরো-হিরো ভাব এসে গিয়েছিল শুনে।

এমনিই চলছিল তখন। স্থায়ীবাস ইডেন ছেড়ে হার্ডিঞ্জ, আর

মাঝে মধ্যে মামীমার কাছে-হরিশ মুখুজ্যে রোড। এরই মধ্যে স্থায়ী বাস হার্ডিঞ্জ থেকে উঠল।

ব্যাপারটা হলো, হার্ডিঞ্জের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন ইতিহাসের অধ্যাপক হেম রায়চৌধুরী। শুনলাম সুশোভন বিলেত থেকে ফিরে তাঁর ওখানে এসে উঠেছে। হার্ডিঞ্জের ওপরতলায়ই কোয়ার্টার। আমি আছি শুনে সুশোভন খবর পাঠিয়েছে দেখা করতে। দোতলার চাকর খবরটা দিয়ে গেল।

শোনা মাত্র তিন লাফে গিয়ে পৌঁছলাম। কি সুন্দর চেহারা হয়েছে সুশোভনের। এমনিতেই সুন্দর, তবে বিলেতযাত্রার আগে বড্ড রোগা ছিল, ফিরে এসেছে দোহারা চেহারার কন্দর্প টি হয়ে। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। আর সুশোভনের চোখ দুটো! ওর ভারী গর্ব ছিল চোখ নিয়ে। অত সুন্দর চোখ সচরাচর দেখাই যায় না।

একথা ওকথার পর কত নম্বর ঘরে আছি কথাটা উঠল। ফটাস্ করে পিনাকীর ঘরের নম্বর বলে দিলাম। হেমবাবু বোধ হয় শুনলেন কথাটা, বললেন,

—আপনাকে ত বোর্ডার বলে জানিনে। খাতায় ত আপনার নাম নেই মনে হচ্ছে—

—মানে গেস্ট হিসেবে থাকি কিনা—

—গেস্ট? আপনাকে ত বৎসরাবধি কাল হস্টেলে দেখছি, গেস্ট হয়ে এতদিন—

দেখলাম ব্যাপার সঙ্গীন। সুশোভনের সঙ্গে কথার পাট খতম করে সেই রাত্রেই হার্ডিঞ্জ ছাড়লাম। এলাম হরিশ মুখুজ্যে রোডে। পরদিন সকালের চাটগাঁ মেলে বাবার কাছে চাটগাঁমুখো রওনা দিলাম। ফিরে এলাম দু'মাস পর, উঠলাম ৭৫-বি আমহার্স্ট স্ট্রীটের মেসে।

নামধাম কাল্পনিক মুখ্যত তবে স্মৃতিরোমন্থনে নিজের ও আর কারোর নাম যদি এসে যায় তার জন্যে মাফ চেয়ে রাখছি।

লম্বা লণ্ডনপ্রবাসের পর মিত্তিরসাহেব, মেমসাহেব ও দুই মিসিবাবা শহরতলিতে গঙ্গার ধারে মস্ত বাগানঘেরা বাড়ি নিয়ে বসবাস করতে এসেছেন, সাময়িক হলেও অন্তত বছরখানেক ত বটেই থাকবেন, এই মনোভাব। তদানীন্তন ইঙ্গবঙ্গ সমাজের যাবতীয় চা, ডিনার, টেনিস—সবতাতেই যোগদান করছেন। ওই বিশেষ সমাজের কর্তারা অধিকাংশই বিলেত-ফেরত, কেউ ইংরেজের পদস্থ আমলা, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ সওদাগর। বিলেত না গিয়ে সাহেব যাঁরা তাঁদের কেউ কেউ এ সমাজে আছেন, তবে হয় তাঁদের অনেক টাকা আছে, না হয়ত পরমাসুন্দরী কন্যা বা গৃহিণী আছেন যাঁদের কোনো না কোনো সূত্রে ইঙ্গবঙ্গদলে কোনো আত্মীয়স্বজন আছেন।

আমি মাঝারি গেরস্তর ছেলে, তবুও পটলডাঙার বস্তি ও হ্যারিংটন-লাউডনে অভিজাত পাড়ায় সমান গতিবিধি। তার বহু কারণ ছিল কিন্তু এ গল্প আমার নয়, যতীনের, আর মিত্তিরসাহেবের বড় মেয়ে ভায়োলেটের। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি।

মিত্তিরবাড়ির দুই আহেল বিলিতী মিসিবাবার নাম বলতে ভুলেছি। মিত্তিরবাড়ির দুই আহেল বিলিতী মিসিবাবার নাম ভায়োলেট আর প্যান্‌জি। অন্তত ডাকনাম তাই, হাজার হলেও কলকাতার বনেদী কায়েত ঘরের মেয়ের আসল দিশী নাম কিছু আছেই, তবুও গল্পে ডাকনামই চলুক।

যতীন জাস্টিস মল্লিকের ছেলে টুটুর ক্লাস ফ্রেণ্ড, আমার থেকে দু'বছর সিনিয়র ওরা। যতীন ফিলসফিতে না কিসে যেন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে পাস করছে। খেলাধুলায় চৌকস। টেনিসে শুধু কলেজেই

চ্যাম্পিয়ন নয়, সে বছর বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপে ইডেন গার্ডেন মেডি-ক্যাল কলেজের ডাকসাইটে শর্মার পার্টনার হয়ে ফাইন্যালে গেছে। সেখানে খেলবে নামকরা জাপানী জুটি ওকামোটো শিমিৎজুর বিরুদ্ধে। ওর বাবা হাজারিবাগ না কোথায় কোনো বেসরকারী কলেজের প্রফেসর—এখন ভাইস্ প্রিন্সিপালের কাজ করছেন। বড় কলেজের প্রিন্সিপালরা সাহেবই হতো সে আমলে, যতীনের বাবা শুনেছিলাম শীগগিরই প্রিন্সিপালও হবেন। ছেলেকে দেখে বোঝাও যেত না যে তার বাবা বিশ শতকের গোড়ার স্বনামধন্য বিলেত-ফেরত পণ্ডিত। আমলটাই এমন ছিল যে, যে কটি রত্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুত তারা সবাই ইংরেজের তাঁবেদারীতে ঢুকে পড়ত, আর হাস্যকর ইংরেজিপনার ঘর গেরস্তালি ছেলেমেয়ে নিয়ে 'নকল বুঁদির কেল্লা' বা ফিরিঙ্গি আঁস্তাকুড় বানাতো। এই সব সকল ফিরিঙ্গিবাড়ির গিন্নিরা কিন্তু বেশীর ভাগই মনে মনে সাবেকি চালচলন পছন্দ করতেন, সাহেবরাও জাত ইংরেজের ঠোক্কর খেতে খেতে শেষ বয়সে দেশপ্রেমিক হতেন, কিন্তু ছেলেমেয়েরা টেক্কা দিয়ে সাহেবিয়ানার চূড়ান্ত করতে ছাড়ত না। বাংলা ভুলত, বেয়ারা বাবুর্চির হিন্দি আর চুনোগলির ইংরেজিতে পোক্ত হয়ে উঠত।

কিন্তু উঠতি তরুণের স্বভাবধর্ম যাবে কোথায়? টুটু মল্লিক যাই হোক না কেন, যতীনকে বীরপূজা প্রথমদর্শন থেকেই করত। নিজের সেটের বহু যুবক থাকা সত্ত্বেও যতীনই তার বন্ধু ছিল কলেজে। তাও কিন্তু বাড়িতে কোনোদিন আমন্ত্রণ জানায় নি, বোধ হয় খটকা লাগত বাড়ির ফিরিঙ্গি পরিবেশে সাদামাঠা যতীন বড্ড বেমানান হবে। কিন্তু হালে খবর বেরিয়েছে, যতীন বিলেত যাবে সার্ভিস্ মানে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে, তার আগে কেম্‌ব্রিজে ট্রাইপসের জন্য পড়বে। কাজেই সামাজিক স্তরভেদের আঁটসাট ঢিলে হচ্ছিল একটু একটু করে। জাস্টিস মল্লিকের বাড়িতে যতীন দু একবার টুটুর সঙ্গে গিয়েছে টুটুর সনির্বন্ধ অনুরোধে, এখন বাড়ির কর্তাগিন্নি অর্থাৎ সাহেব-মেমসাহেবেরও নজর পড়ছে ছেলেটির ওপর।

সাহেবরা বেশীর ভাগই উদ্ভূত হয়েছেন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে—ওই যতীনের মতোই ছাত্রজীবনের পরীক্ষার উৎকর্ষের সিঁড়ি বেয়ে। মেমসাহেবরা মনে যাই হোন, বাইরে উগ্র উন্নাসিকতা বজায় রাখতেন এ ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, কিন্তু ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে মানে মিসি-বাবাদেরও অপ্রতুল ছিল না, কাজেই সোনার টুকরো ছেলে,—হলোই বা শুধু পড়াশুনায় আর খেলায়, নজরে এলেই খোঁজখবর নিতে শুরু করতেন। টুটুর বোন রিণা বড়ো হয়েছে, লোরেটো থেকে সিনিয়র পাস করছে। যতীনও বিলেত যাবে যাবে করছে! সাহেব মেমের নজর পড়া তাই অহেতুক নয় আদৌ। কিন্তু যার জন্য যতীনের প্রতি এত স্নেহ দৃষ্টি, তাকে দেখে যতীনের কোনো মনশ্চাঞ্চল্য ঘটেনি। অপর পক্ষও এখনো কাটা কইমাছের মতো ছট্‌ফট্ করেনি। তা ছাড়া, রিণা মেয়েটি বড়ো শান্ত।

সেদিন বিকেলে টেনিস, পরে হাই টির নেমন্তন্ন মল্লিককুঠিতে। হাই টি মানে প্রায় পেটভরে স্যাণ্ডউইচ্, কেক্ প্যাস্ট্রি খাওয়া, সঙ্গে মাংসের রোল বা কাট্‌লেটও থাকতে পারে।

ভায়োলেটকে প্রথম দেখল যতীন সেইখানে। প্রভাত মুখুজ্জে মশাই তাঁর অনবদ্য ছোটগল্পগুলোর একটিতে নায়কের সম্বন্ধে লিখেছেন "একে বাঙালীর ছেলে, তায় মদ খাইয়াছে। সে হুহু করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।" ভেতো বাঙালীর পেটে দু'ফোঁটা উগ্র তরল পদার্থ যাবতীয় রুদ্ধ আবেগের দরজা খুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যতীনেরও প্রায় সেই অবস্থা হলো।

সে কুড়ি দশকের গেরস্ত বাঙালীর ছেলে। নিঃসন্দেহে শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত পরিবার। যদিও ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবের সময় আনুষ্ঠানিক 'যুবক-যুবতী' সম্মেলনের রেওয়াজ ছিল—তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশা সে সমাজেও রীতিবহির্ভূত ছিল। তা ছাড়া যতীন ব্রাহ্মও নয়।

যতীনের যুবতীসন্দর্শন সেই প্রথম নয়। সে রিণাকে দেখেছে,

রিণার বান্ধবী আরো অনেক ক'টিকে দেখেছে, লেডী চৌধুরীর গানের দলে যোগ দিয়ে কম মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় নি, কিন্তু ভায়োলেটকে দেখামাত্র বুকের ভেতরে পাথর চাপা কোনো নির্ঝরের মুখ এমন করে আর খুলে যায় নি। ওর মনে হলো উৎসধারার প্লাবনে ও বুঝি ভেসে যাবে। দাঁতে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে লাগল যতীন। মার্জিত মনোভাব ওর পরিবারগত সম্পদ, বয়সোচিত চাপল্য ওকে প্রগল্‌ভ করে নি। সুধাধারায় বুক ভরে উঠলো শুধু, নিজেকে সামলে নিতে দেরি হলো না ওর। কোনো মেয়ের দিকে কোনো দিনই নির্লজ্জভাবে তাকিয়ে থাকেনি, ভায়োলেটকে একবার দেখেই মুখ নামিয়ে নিজের টেনিস র‍্যাকেট পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে গেল সে।

মল্লিকবাড়ির টেনিসপ্রাঙ্গণ ইঙ্গবঙ্গ সমাজের তরুণ-তরুণীর অবাধ মিলনক্ষেত্র ও ফ্যাশন প্যারেড। খেলায় পটুতার থেকে বাক্‌চাতুরী, আর সুস্থ সবল সুঠাম দেহের থেকে পাৎলুন কুর্তার নিখুঁত কাটছাঁটের প্রাধান্য সেখানে। দু'টি সদ্‌গুণেরই একান্ত অভাব যতীনের— কথাবার্তায় মুখচোরাই বলা চলে, আর পোশাক? মালকোঁচা দেওয়া ধুতি পরনে, গায়ে বুক খোলা সস্তা টুইল শার্ট, পায়ে মোটরটায়ারের সোল লাগানো হাজারিবাগের সস্তা ক্যাম্বিসের জুতো। আর সবায়েরই পায়ে তখনকার দিনে নতুন ওঠা কেড্‌স, পরনে দুগ্ধধবল ফ্লানেল, মেয়েদের হিলের ওপরে পরা ধবধবে সাদা শাড়ি আঁটসাট করে পরা, গায়ে পাৎলা ভয়েলের কামিজ, মেয়েপুরুষ প্রায় একই কাটের। শুধু ছেলেদের হাফ্‌ হাতা মেয়েদের কাঁধ কাটা। যতীনের সাজগোজ দেখে জনান্তিকে 'হাউ হরিড্‌' বলে মুখ বেঁকায় তরুণীর দল, জোরে কিছু বলে না, সভ্যতায় আটকায় বলে। রিণা, যার জন্যে যতীনের এ বাড়িতে আমন্ত্রণ, সেও ভাবে, 'মাগো কি বিশ্রী দেখতে'।

প্রথম পরিচয়েই ভায়োলেট তাজ্জব করে দিল সবাইকে। জন্মাবধি বিলেতে মানুষ, ও বয়সের ন্যাকা বাঙালী ঘরের মেয়ের যৌন

সচেতনতা একেবারেই নেই তার। খেলার মাঠে নেমেই সে ছোট্ট লাফে নেট ডিঙিয়ে এসে যতীনের হাতের গুল, বুকের মাসল টিপে টিপে দেখল যেন পেটা লোহা দিয়ে তৈরি ওগুলো। বলল,

"ওই ফোর আর্মের ড্রাইভ চালাবে তুমি? বুকে লাগলে মরে যাব যে!"

সিসি-লিসির দলে খুক্‌খুক্‌ চাপা হাসির শব্দ উঠল। ভায়োলেটের নজরই নেই সেদিকে। গ্রীক ভাস্করের গড়া ডায়না মূর্তির মতো অপরূপা এই মেয়েটি বলেই চলল,

"লাভ্‌লি, ও হাউ লাভ্‌লি।"

তারপর আপাদমস্তক যতীনকে একবার দেখে নিয়ে বলল,

"বাট্‌ আগ্‌লি! ইউ আর আগ্‌লি, অ্যাণ্ড্‌ লাভলি! ইউ টুট্‌সি, হাজার মুখে ত বন্ধুর প্রশংসা শোনাচ্ছো তখন থেকে, কিন্তু ইণ্ট্রোডিউস্‌ করবার বালাই নেই। আমি বাপু ওসব ফর্ম্যালিটির ধার ধারি না, যেচে আলাপ জমিয়ে নিলুম। আচ্ছা বলোত, কি বলে ডাকব তোমায়? যতীন ইজ্‌ এ গুড্‌ নেম, টুট্‌সির অমরেন্দ্রার মতো অ্যাবসার্ড নয়, কিন্তু তাই বলে যতীন-মানে, যতীন, শোনো ত —যতীন, একবার এদ্দিকে এসো তো,—কানে এলেই মনে হয় বাড়ির চাকর কি ড্রাইভারকে ডাকছি। না, না,—সে আমি পারব না, যতীন বলে ডাকতে পারবো না।

চাকর, ড্রাইভার শুনে যতীনের মাথায় খুন চাপছিল, টুটুও সশঙ্ক হয়ে উঠছিল। ভায়োলেটের ভ্রূক্ষেপ নেই, সেই বলেই চলেছে,

"আমি তোমায় জিৎ বলে ডাক্‌ব, কেমন? জিৎ, মাই আগ্‌লি ডার্লিং, চাকর কথাটা শুনেই কালো হয়ে উঠলে যে! মানে আর এক পোঁচ বেশী কালো হলে—

এবারে যতীনের মন বলে উঠল "ম্যায় চাকর রাখো জি"! সে সত্যি হকচকিয়ে গেছে। মেয়ে ত দূরস্থান, কোনো অন্তরঙ্গ ছেলে বন্ধুও এমন নিবিড় করে আপন করে নিতে পারে না কাউকে।

ভায়োলেট তখনো ননস্টপ। বলে চলেছে—

"জানো, লণ্ডন স্কুলে ল্যাস্‌কির কাছে পড়েছি আমি। ঠিক্ করেছি 'কমরেড' বলে ডাকবো সবাইকে। অনেক ইংরেজি বুক্‌নি বেরিয়ে যায় কথার তোড়ে। ভাবছ মেয়েটা কি ফিরিঙ্গি রে! না না, আমি এক্কেবারে ফিরিঙ্গি নই। তবে চলতি বাংলা রপ্ত হয়নি এখনো। আই মিন সহজ গালাগাল, সহজ সহজ ভালোবাসা-এ সব প্রকাশের বাংলা শিখিনি এখনো। শিখে ফেলবো এইবারে নিশ্চয়। ধরো, এই যে তোমাকে বল্‌লুম। মাই আগ্‌লি, বাংলায় কি বলতুম? 'ওহে আমার কুৎসিত?"—ও অচল। আদর করে যদি বলতুম 'ওরে আমার ভুতুম্, বা ওরে আমার পেঁচা, বা ওরে আমার বাঁদর—সেটা কি ঠিক হতো? আচ্ছা তুমিই বলো—"

টুটু বলল—"আই সে, হ্বাই, যতীন যাকে বলে—

"ফ্ল্যাবারগাস্টেড্ হয়ে যাচ্ছে? যাবারই কথা। কিন্তু ঠিক্ ঠিক্ বলেছি কিনা? ধরো তোমাকে যদি বলি 'অমরেনড্রা। চটিজোড়া এগিয়ে দাও ত'—জুতসই কথাটা হবে বটে। ভাব-প্রকাশকও হবে, তবে তোমার শুনতে ভালো লাগবে না। কিন্তু যদি বলি, "স্লিপ্ মি এ পেয়ার অফ্ স্লিপার্‌স্, কম্‌রেড্, টুটুসকি—তুমি খুশী হবে কিনা বলো?"

যতীন ভাবে শুধু হতভম্বের মতো শুনে যাওয়াটা কাজের কথা নয়, একটা লাগসই কিছু বলা দরকার। কিন্তু বলবেই বা কি আর তার ফাঁক কোথায়? যাবতীয় কথা বলবার ভার যে একজনই নিয়ে নিয়েছে।

শুধু মনে হয় এ কোন মায়াবতীর আবির্ভাব হলো আজ এই নকল সাহেব বিবি সমাজে? আজন্ম বিলেতে, এদের থেকে দু'শো গুণ বেশী সাহেব হতে বাধা নেই। তবু এযে নিখাদ সোনা। উদ্দাম কল্পনাতেও এমনটি ভাবতে পারা দুঃসাধ্য। মনেপ্রাণে দেশের জল-মাটির এ মেয়ে।

টুটু বলল, "হ্যাই, কথাতেই সময় কাটছে, চলো, খেলা যাক্ দু'এক সেট্। মিক্স্‌ড—তুমি আর যতীন—

"নো, নো, আমি জিৎ-এর সামনে খেলব, পাশে নয়। আই'ল পার্টনার ইউ। হি মে টেক্ সাম্‌বডি এল্‌স্।"

"—মলি। মলি সেন। খারাপ হবে না।"

উঠে যায় ওরা খেলতে।

বিলেত না গিয়ে সাহেববাড়ির মেয়ে মলি সেন। তার বাবা রাজবৈদ্য হরিশচন্দ্র সেন "বজ্রদশন," "যকৃতান্তক" আর "ললনা লোভন" মাথার তেল বেচে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন, কলকাতায় দশ বারোখানা বাড়ি, বহু কোম্পানির শেয়ার। লোকে বলে শেয়ার বাজারে পরশুরামের "নাইনটিন ফোর্টিন" পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

বৈদ্যরাজ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করবার পর ছেলেরা যতদূর সম্ভব সভ্যভব্য মানে ফেরঙ্গ-ভাবাপন্ন হয়ে সমাজে জলচল হবার ফিকিরে ঘুরছিল। মল্লিকসাহেব হাইকোর্টের জজ হবার আগে কৌশুলি থাকাকালীন হরিশ কবরেজ তাঁর মক্কেল ছিলেন। রয়েড স্ট্রীটের যে বাড়িতে টুটুরা এখনও ভাড়াটে, তার মালিক সেনেরা। তবে বহুদিন হলো মল্লিক আছেন এখানে, আগেও ভাড়া দিতে হয় নি, এখনো মালিকেরা চান না।

বৈদ্যরাজের বড় ছেলে অনিল সেন অ্যাটর্নি। যদিও সে আমলের অ্যাটর্নিদের বেশীর ভাগেরই বাসস্থান পৈতৃক ভিটায়, সাবেক কলকাতায়। কিন্তু নিজস্ব বাড়ি লাউডন স্ট্রীটে থাকায় অনিল সেন সেখেনেই উঠে এসেছেন বছরপাঁচেক হলো, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের পৈতৃক বাসস্থান ছেড়ে।

মল্লিকের বাড়িতে বেশী আনাগোনা অনিল সেন করেন না। আসেন তাঁর ভাই বিমল, ও বোন মলয়া। বিমল টুটুর, এবং মলয়া রিণার সহপাঠী সহপাঠিনী। টুটুর মা স্নেহশীলা মহিলা, তাঁর আদরে

ভেজাল নেই। মা মরা ছেলেমেয়ে দু'টিকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করেন তিনি।

বিমল টাকার গরমে সমানে টেক্কা দিতে চায় এই সমাজের সঙ্গে, মলয়া ঠিক তার উলটো। কোনো কিছুতেই উৎকট নয়, অথচ ফ্রেঞ্চ বলা, টেনিস খেলা, ক্লাসের পড়া সব তাতেই চলনসই। মনে মনে টুটুর প্রতি আকর্ষণ আছে, মুখ ফুটে কিছু বলে না কারু কাছে।

খেলার শুরুতেই যতীনের হাজারিবাগি মোটর টায়ারের জুতোর তলা মুখের দিকে হাঁ হয়ে গেছে। ভারী অস্বস্তি লাগছে, নেটের মুখে একটা স্ম্যাশ্ মিস্ হয়ে গেল।

ভায়োলেট নেটে এগিয়ে ছোট্ট করে বলে—

"জুতোয় জুত হবে না জিৎ, খুলে ফেলো।"

"কিন্তু—"

"সিসি-লিসির দল টিট্‌কিরি দেবে? মাই-মাই। কি স্নব তুমি! যাও—খুলে ফেল—"

এ যে হুকুম! যতীন কোর্টের বাইরে জুতো খুলে রেখে ফের খেলতে আসে। সত্যিই সিসি-লিসির দল টিট্‌কিরি দেয় আর ছোট্ট রুমাল, এই জালের গেলাস ঢাকনির মতো, তাই মুখে দিয়ে হাসি চাপে।

—অবসিন্।

—ভালগার্

—ব্যুর—

ভায়োলেট চট্ করে গিয়ে নিজের পায়ের টেনিস সু খুলে আসে।

—লনে খালি পায়ে খেলতে কি আরাম! যেন ভেলভেটের ফীল্—তাই না টুট্‌সি?

—সেভ্ ইওরসেল্‌ফ। দেখছ না, প্রতি স্ট্রোকে যতীন দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছে। ও নেটে এলে ভয় করে আমার। যা মেরে দিয়েছিল সেদিন পল্টু হালদারের চোখে, এই এতটা ফুলে ছিল দশ দিন।

ভায়োলেট বলে,

—মারলেও লাগে, না মারলেও লাগে।

কথার মারপ্যাঁচের ধার ধারে না টুটু। হঠাৎ কি করে বে বে-আন্দাজ একটা মেরে বসে সোজা মলি সেনের মুখ বরাবর—

বিদ্যুতের মতো কি একটা মলির চোখের সামনে দিয়ে শব্দ তুলে চলে যায়। বল সমেত কোর্টের বাইরে গিয়ে পড়ে যতীনের র্যাকেট। মলি বুঝে ওঠে না, কি হতে যাচ্ছিল, কি হচ্ছে,

ভায়োলেট চেঁচিয়ে ওঠে,

—ব্রাভো মাই লাভ্‌লি, জিতা রহো জিৎ!

যতীন র্যাকেট কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসে। বলে, আপনি বেস্‌ লাইন থেকে এগোবেন না মিস্ সেন।

সকৃতজ্ঞ চোখে তাকায় মলি।

টুটু বলে,

—আইসে, অ্যাম্ রিয়্যালি সরি মলি!

ভায়োলেট বলে,

—ইউ নিড্‌নট্ বি। খেলায় অমন হয়। ইউ নেভার ইন্‌টেণ্ডেট টু হিট হার। কিন্তু, মাই কম্‌রেড—ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল।

—সত্যি হবাই, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে যতীন।

—তাই ভাবছি, এগেন্‌স্টে না খেলে, পার্টনার হলেও মন্দ হত না। বলে হেসে ওঠে ভায়োলেট।

ভায়োলেটের কথার ইঙ্গিতে বেগুনি হয়ে ওঠে যতীনের মুখের রং। ভায়োলেট বাণ ছাড়তে কসুর করে না।

—আমার নাম আর তোমার মুখের রং এক হয়ে উঠলো জিৎ। লজ্জারাঙা মুখ, কথা বলে না। কালো তোমায় ভগবান করেছেন, লজ্জায় ভায়োলেট হয়ে উঠছ নিজের দোষে। আমারি জিৎ, তাই না জিৎ?

বলে যতীনের পিঠ চাপড়ে দেয় ভায়োলেট।

এর ওপর রাগও করা যায় না, রেগেমেগে ভাবে যতীন। বলে,
—টুটু, আমি যাই এবারে। অনেকটা যেতে হবে।

—এই দেখ, চটেমটে চলবার তাল তুলছে। আচ্ছা বোসো ত একটু। খেলার সাজ ছেড়ে আসি।

ভায়োলেট বাড়ির ভেতর যায়। সতীন বুক পকেটের ওপর কলেজ কালার্স আঁকা নীল ব্লেজার গায়ে চড়ায়। টুটুর-ও ঐ একই ব্লেজার। মলির ভাই বিমল, যার এ সমাজে ডাকনাম বীম্‌স সে যদিও খেলতে নামে নি, তবুও নিখুঁত টেনিস সাজে সজ্জিত, মানে ঘি রং-এর ফ্লানেলের ওপর নীল ব্লেজার, পায়ে কেড্‌স্‌। মেয়েরা যাঁরা খেলেন নি তাঁরা খেলোয়াড়ী পোশাকের ধার ধারেন নি, কিন্তু মলি রিণা খেলেছে, তারা দুধের মতো সাদা স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে লোরেটোর ছাপ মারা মেরুন রঙের কোট গায়ে চাপায়।

টেনিস লন ছেড়ে একটু ওদিকে বেতের টিপয় ঘিরে খানচারেক চেয়ার, এমনি পাঁচ সাত দফা সাজানো। টিপয়ের ওপর ই. পি. এন. এস. এর চায়ের কেৎলি, দুধ ও চিনির পাত্র, আহেল বিলিতি Shropshire পটারির পেয়ালা পিরিচ, খাঁটি রুপোর চাম্‌চে। নিজেদের দল গড়ে গুলতান করে বসল গিয়ে সবাই। যতীন, টুটু, মলি একখানা চেয়ার ভায়োলেটের জন্যে খালি রেখে বসল। যতীন বলল,

—মিস্‌ সেন, যদি চাটা একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, ভালো হয়, আমার আবার—

—অনেকটা যেতে হবে, না?

ভায়োলেটের গলা শোনা যায়। কাপড় ছেড়ে কি যে তারতম্য হয়েছে বোঝা শক্ত। সেই শাড়ি জামাই পরনে, পায়ে শুধু এক জোড়া সবুজ নরম জয়পুরি। আর গলায় জড়ানো স্টোল জাতীয় সবুজ পশমী শাল।

—ওই এক কথা কতবার যে বলবে ছেলেটা? আমিও অনেক

দূর যাব, সবাই একসাথে বেরোব। তা ছাড়া, চা ঢালাটা আমার ডিউটি, মিস্ সেনের থেকে আমি নিশ্চয়ই বয়সে বড়ো।

বলেই পেয়ালায় চা চিনি দুধ পরিবেশন শুরু করে ভালোলেট। কার ক'চামচ চিনি লাগবে একবারও জিজ্ঞেস করে না, এবং বলে,

—আশা করি বুড়ো ডায়াবিটিক কেউ নও তোমরা? হেল্‌দি দু'চামচ চিনিতে আপত্তি হবার কোনো কথা নেই? আমি নিজে তিন চামচ—,

—আমি চায়ে দুধ খাই না, বলল টুটু।

—মানে বাহাদুরি। মানে কোনো খাঁটি সাহেব বাচ্চাকে দুধ ছাড়া চা খেতে দেখেছ।

টুটু আমতা-আমতা করে।

—ঠিক তা নয়, তবে আজকাল—কাগজ-টাগজ পড়ে যতটুকু জানি,—অক্‌স্‌ফোর্ড কি কেম্ব্রিজে—

—অমনি স্টান্টে ভুলে গেলে! দুধ ছাড়লেই যদি সাবালক হওয়া যেত টুটুসি—

কথাটায় খোঁচা ছিল। কিন্তু টুটু গায়ে মাখে না। হাসে। বলে,—আচ্ছা দাও না হয় দুধ।

চায়ের পালা শেষ হতে সন্ধ্যা ঘনায়। যতীন কিসের টানে সব ভুলে বসে থাকে নিজেই বুঝে ওঠে না। এইবারে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

—চললুম আমি। এমনিও অনেকটা যেতেই হবে, তা ছাড়া—

—দাঁড়া না, একটুক্ষণ পর আমি বেরোব—লিফ্‌ট্ দেব এখন।

—না রে টুটু, আমি ট্রামেই চলে যাব। এইত রডন থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গী, সেখানে গেলেই ট্রাম।

মনে রাখতে হবে, তখন পার্কসার্কাসের ট্রামলাইন হয় নি, ওয়েলেস্‌লির ট্রাম ধরতে আরো বেশী হাঁটতে হয়।

টুটু বলে—দেরিই বোধহয় হয়ে গেল একটু। সেই লেডী চৌধুরীর—

—আরে সে ত সানি পার্ক, আরো উজিয়ে যেতে হবে।

—না না, আজকে ইন্‌স্টিট্যুটে রিহার্সাল।

ভায়োলেট কান পেতে শুনছিল। বলে—রিহার্সাল? কিসের?

—ওহ্, জানো না বুঝি? হুবাই, যতীন খাসা গান করে। বিশ সালের কংগ্রেসে সরলাদেবীর দলে ছিল। তার পর থেকে লেডী চৌধুরীর সংগীত সঙ্ঘে বরাবর আছে।

—বটে বটে বটে? জিৎ, শুধু বল মেরেই বুকে ঘা দাও না, আবার গান গেয়েও ঘায়েল করো? শুনতে হবে, শুনতে হবে,—

কথার পিঠে কথা যতীনের আসে না, কিন্তু—সাহস বাড়ছে। বলে ফেলল,—শুধু ঘায়েল করি, আর বাঁচাই না বুঝি?

—জানি, জানি। মলি দি ফেভারড্ ওয়ান! মলি দি লাকি! বলে মলি সেনের খোঁপাটা নেড়ে দিল ভায়োলেট। মলি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

—চলো জিৎ, তোমাকে লিফ্‌ট আমিই দেব। আজ পুরোনো বাড়িতে দাদু দিদিমার সাথে দেখা করতে যেতে হবে। মাও সেখানে আসবেন। টুটু, মা বাবাকে বোলো আমি যাচ্ছি।

—টু আন্‌কাইণ্ড্! তবে দাদু-দিদিমা, যেতে ত হবেই। যতীন, হুবাইকে ডিরেক্‌সান দিয়ে নিয়ে যাস্। ও ত লণ্ডন যতো চেনে, কলকাতা তার সিকিও চেনে না। তবে ইন্‌স্টিট্যুট বোধ হয় পথেই পড়বে।

—না পড়লেও পৌঁছে দেব। চলো কম্‌রেড।

গাড়িবারান্দায় তিন চারখানা গাড়ি। সব চেয়ে শেষেরটা লাল রঙের খুব নীচু ল্যান্সিয়া স্পোর্টস—টু সীটার। কিন্তু পেল্লায় লম্বা। ভায়োলেট বলে,

—ড্রাইভার নেই কিন্তু, আমি চালাই গাড়ি। ভয় করবে না ত, আমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে?

ওই হাতে নিজেকে ছেড়ে দেবার সুপ্ত বাসনা যতীনের মনে বুঝি

প্রথম দর্শনেই বাসা বেঁধেছিল। গুছিয়ে কথা বলা তার আসে না। ভায়োলেটের প্রশ্নে আবার থতমত খায়, বলে—আমাকে কি ভীতু বলে মনে হয় আপনার?

—ঐ ছাখো, প্রথম থেকে আমি আপন করে নিলাম 'তুমি' ডেকে, আর তুমি কিনা 'আপনি'র দেয়াল এখনো ভাঙতে পারলে না? খবরদার আপনি বোলো না আমাকে, ফেবিয়ান সোসাইটির মেম্বার আমরা, সবাই কম্‌রেড, সবাই তুমি। আর তোমাকে ত আমি বিশেষ করে—কি বলতে কি বলে ফেলে চমকে ওঠে ভায়োলেট। বলে,

—ঐ যাঃ। আর একটু হলেই বলে ফেলেছিলাম সেই কথাটা। নাই শুনলে,—ও আমার গোপন কথা। আর ছাখো, টুট্‌সির মতো, হ্বাই, বলে ডেকো না আমাকে। আমার নাম বিদিতা, ভি আই ডি আই টি এ। তুমি বিদিতাই বোলো, কেমন? না হয় ভিড্‌?

না শোনা গোপন কথার উল্লেখে যতীনের গায়ে কাঁটা দিয়েছিল—পুলক শিহরণের। কিন্তু মুখচোরা মানুষ, দু'কথা শুধু বলল,—তাই হবে ভিড্‌, মানে বিদিতা—

—নাঃ, ভিড্‌ তোমার মুখে মানায় না। তুমি বিদিতাই বোলো। আমি কিন্তু জিৎ বলব, আর কিছু বলতে পারব না। জিতে নেওয়া চাই, বুঝলে জিৎ।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে থাকে যতীন। ভায়োলেট বলে—এই—রাস্তা বাৎলাও। এটা ত সার্কুলার রোড সোজা দাদুর বাড়ির রাস্তা শ্যামবাজারে। কিন্তু তোমার ইন্‌স্টিট্যুট, সে কোথায়?

শেয়ালদার কাছে বাঁয়ে হ্যারিসন রোড, সেখান থেকে মির্জাপুর হয়ে কলেজ স্কোয়ার চলো ঠিক টাইমে দেখিয়ে দিচ্ছি। আবার ওখান থেকে হ্যারিসন রোড ধরেই তুমি ফিরতে পারবে। আচ্ছা, শ্যামবাজারে ত দাদুর বাড়ি, তোমরা রয়েছো কোথায়?

বরানগরে, 'মেডোজ' বলে একটা বাগানবাড়িতে। বাড়ির

মালিক আমার বাবার বন্ধু কিনা। ছুটিতে এমনিই ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের থাকতে। তুমি থাকো কোথায়?

মানিকতলা আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছাকাছি একটা মেসবাড়িতে। ৭৫-বি আমহার্স্ট স্ট্রীট।

—আমার মোহনবাগান রো থেকে অনেক দূরে।

—না না, যাবার পথেই পড়বে, তবে একটু ঘুর হবে। বলে যতীন সঠিক রাস্তা বুঝিয়ে দেয় ভায়োলেটকে। ততক্ষণ ইন্‌স্টিট্যুট এসে গেছে। গেটের কাছে মহিলা পুরুষ মিলে জন সাত আট জটলা করছেন। যতীনকে চোখ-ধাঁধানো টু সীটার স্পোর্টস গাড়ি থেকে নামতে দেখে একটু অবাক হলেন সবাই। স্টীয়ারিং-এ ভায়োলেটকে দেখে হাঁ হয়ে গেল ছেলেরা। কিন্তু ভব্য সমাজে অপরিচিতা মহিলাকে নিয়ে কথা কওয়া দূষ্য, কেউ কিছু বললেন না। অতি সুশ্রী বছর তিরিশ-বত্রিশের একটি মহিলা বললেন, শুধু—ভাবছিলাম যতীন আজ আর এলেন না।

—হয়ত আসা হতই না সময়মতো, এই এঁর গাড়িতে লিফ্‌ট না পেলে। বিদিতা মিত্র,—অরুন্ধতী রায়। বিদিতা, তুমি এঁর গান শুনেছো?

ভায়োলেট ও অরুন্ধতী হাত তুলে নমস্কার জানালেন্ এ ওকে। ভায়োলেট বলল—উনিই ফেমাস্ অরুন্ধতী রায়? কাগজে পড়েছি, একখানা রেকর্ডও আছে আমাদের বাড়িতে। অদ্ভুত সুন্দর গান করেন আপনি। আমরা ত বাংলার বাইরে থাকি, সুযোগ হয়নি কখনো সামনাসামনি গান শুনবার। জিৎ, যে ফাংশনের রিহার্সাল হচ্ছে, তাতে আমাকে নিয়ে আসবে কিন্তু।

—নিশ্চয়, যদি তোমার বাবা মা অনুমতি দেন।

—তাঁরা আমার কোনো কাজেই বাধা দেন না। আচ্ছা,' জিৎ যাই এবারে। আবার দেখা হবে। 'গুড্‌নাইট, মিস্ রয়।'

দশ

কল্লোলে পৌঁছে দেখি, গোকুল শুধু এসেছে, আর কেউ আসেনি। আমাদের ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো মণীন্দ্র চাকী বলে ছেলেটি অবশ্য এসে অফিস খুলছে। সে একাধারে ম্যানেজার-ক্লার্ক-বেয়ারা, মানে লেখা ছাড়া আর যা কিছু করা দরকার একটা মাসিকপত্র চালাতে, সব করে। ঘরের এক কোণে ছোটো তেপাই-এর পাশে টুল নিয়ে সে বসে, আমরা ভুলে থাকি ঘরে একজন মানুষ আছে, যা খুশী আলোচনা করি। মণীন্দ্র যেন টেবিল আলমারি চেয়ার ফরাসের মতো একটি আসবাব।

গোকুল আমায় বেশ নিরীক্ষণ করে দেখল। দু'চার বার সমজদারি ভঙ্গীতে যাচাই করে দেখে বলল,

—আজ যুবনাশ্বকে প্রদীপ্ত দেখাচ্ছে যেন? উজ্জ্বল চোখ মুখ, হর্ষোৎফুল্ল ভাব,—ব্যাপার কি রে?

গোকুল আলোকপ্রাপ্ত সমাজের লোক, অর্থাৎ ব্রাহ্ম। তদানীন্তন প্রখ্যাত 'ফোর আর্ট্‌স্ ক্লাব'এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, সম্প্রতি কল্লোলে "পথিক" বলে মনোমুগ্ধকর উপন্যাস লিখছে। এইত সেদিন ওরই সুবাদে ওর মামাবাড়ি, অর্থাৎ জু গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর বাড়ি গিয়ে তখনকার দিনের এক সুন্দরীশ্রেষ্ঠকে দেখেছি, ওর কাছে লুকোব কি? বললাম ভায়োলেটের কথা।

—ভায়োলেট মিত্তির? সে ত কিংমেকার সানি মিত্তিরের মেয়ে। ওরা ত পাকাপাকি বিলেতবাসী। সানি মিত্তির ইণ্ডিয়া হাউসে হোমরা-চোমরাদের মধ্যে একজন। এদেশ থেকে যতো ছোক্‌রা বিলেত যায়, মিত্তিরই সব বিলিব্যবস্থা যোগাযোগ করে দেয় তাদের। কার সিভিল সার্ভিসের জন্য টিউটর দরকার, কে কোন ফ্যামিলিতে থাকতে পারে, কে কোন ইয়ুনিভার্সিটিতে ভরতির উমেদার, ইন্‌স্

অফ্‌ল'তে কে যাবে, লণ্ডন.স্কুল অফ ইকনমিক্‌স্‌-এর যোগ্যতা কার আছে—এ সবেরই মালিক সে। তা, তুই ওদের চিনলি কি করে? ওরা ত ভিন্‌ জগতের জীব—

—আজ যে ভায়োলেট এসেছিল ওখানে। রাত্তিরে যতীনকে ওদের বাড়ি যাবার নেমন্তন্ন করতে। যতীনকে তুমি চিনবে না গোকুলদা। খুব ভালো ছেলে, টুটু মল্লিকের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তা ছাড়া এবারে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে উঠেছে টেনিসে।

—টুটু মল্লিক? জাস্টিস্‌ মল্লিকের সেই পের্‌জাপতি ছেলেটা, আজ এ-ফুলে কাল ও-ফুলে ঘুরে বেড়ায়। শুনেছিলাম যে ওর সঙ্গেই ভায়োলেটের এন্‌গেজমেন্ট। অ্যানাউন্সড্‌ হয়নি তবে শিগগিরই হবে। ও মেয়ের ত অজস্র প্রশংসা শুনেছি ওয়াকিবহাল মহলে। মিত্তির কি আর বর খুঁজে পেল না ওই মর্কটটা ছাড়া?

আমি তখনো কিছুই জানিনে। বললাম—কিন্তু ভাই গোকুলদা, মেয়েটি ত দেখলাম যতীনকে বেশ ভালো করে চেনে; ডাকে জিৎ বলে, তা ছাড়া ডিনারে ডেকেছে—

রেওয়াজ। তবে হ্যাঁ, খুব সমান সমান না হলে, বা বাড়ির কারো অন্তরঙ্গ না হলে, ডিনারে হঠাৎ কাউকে ডাকে না ওরা—মনে ওই ইঙ্গবঙ্গিরা।

—তা টুটু যে ওরকম ভিসাস্‌ ক্যারেক্‌টার, তা কি কেউ জানে না?

—কি করে জানবে বল্‌। মিত্তির ত লাগাবাঁধা লণ্ডনবাসী। তবে হ্যাঁ, কলকাতার বনেদী কায়েত কুলের ত, বিয়ে-থা দিতে সেই ঘুরে ফিরে কলকাতাতেই আসতে হয়। নিশ্চয় জাস্টিস্‌ মল্লিক মিত্তিরের বন্ধু। সেইটেই বড়ো কথা। টুটুর কীর্তিকলাপ ত এখনো কালাপানি পার হয়ে ওদেশে গিয়ে পৌঁছয় নি।

—তা হয় ত হয়নি, কিন্তু এদেশে এসেও কি ওরা, অন্তত কানা-ঘুষোয়ও কিছু শোনেন নি?

—নিশ্চয় শোনেন নি। টুটুটা যদ্দূর জানি, পড়াশোনায় তেমন কিছু নয়, নেহাত খোড়বড়ি। ওদের বাড়িতে ইংরেজি বলিয়ে বাঙালীর পীঠস্থান, জগন্নাথক্ষেত্র। মায়াদি, মানে লেডী রায়, সার বি. এন. রায়ের স্ত্রী,—আমাদের সাথে খুব ভাব। ফোর আর্টস্ ক্লাব প্রথম বসে ওঁরই বাড়িতে—উনি বলছিলেন যে ইয়ং সেট্-এর অবাধ মেলামেশা। মল্লিকবাড়িতে? বাপের জজিয়তির সুবাদে ওখানে না আসে হেন ব্যারিস্টার কিংবা ইংরেজিভাবাপন্ন বড়লোক নেই। টেনিস্, ডিনার, বুক টি, মায় ককটেল পার্টিও মাঝে মাঝে, অবশ্য বাছাই জনাকয়েকের জন্য—ও বাড়িতে লেগেই আছে। টুটুটা যে কত মেয়ের ইহকাল ঝরঝরে করেছে তার লেখাজোখা নেই, মায়াদি ত ওকে দুচক্ষে দেখতেই পারেন না।

—তা হলে তুমি বলতে চাও যে ঐ স্বর্গের দেবীর সাথে অমনি একটা পাপিষ্ঠের বিয়ে কেবল ভেতরের খবর না জানার জন্যেই হয়ে যাবে?

—ও বাবা,—তাই ত বলি, স্বর্গের দেবী, না রে? তাই দেবী-দর্শন করে আজ এত হাসিখুশী চপলচঞ্চল হয়ে উঠেছিস?

—তাকে দেখলে তুমিও আমার মতো হয়ে যেতে গোকুলদা।

গোকুল গম্ভীর হয়ে গেল। এ বই সে বই নাড়াচাড়া করে বলল,—দেখিনি, তবে তোকে দেখে বুঝছি হয়ত দেখলে তোরই মতো অভিভূত হতুম। এক এক জনার সৌন্দর্য এক এক রকম। কম ত মেয়ে দেখলুম না। কাউকে দেখলে চিত্তচাঞ্চল্য হয়, কাউকে দেখলে পুজো করতে ইচ্ছে যায়। আবার কাউকে একেবারে নিজের মতো সাদামাঠা মনে হয়—সুন্দরীতে ভরা বাংলাদেশ, দেখবার চোখ চাই, আর চাই সে মেয়ের নিজস্ব আকর্ষণ।

—তুমি যে সমাজের লোক, হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই দেখবে। আমারি আর দেখা হয়ে উঠবে না।

—পটকেছিস্ নাকি?

—ঠাট্টা ভালো লাগে না গোকুলদা। ঐ যে বললে দেখলে পুজো করতে ইচ্ছে যায়—আমার ভালো লাগা সেই রকম। তা ছাড়া, a thing of beauty is a joy for ever—মানো ত?

—তা মানি; তবে এটা বুঝতে পারছি না, ওই যে যতীন না কে, থাকে ত তোদের মেসে, কাজেই নিশ্চয় লাউডান ক্যামাকের সমাজের নয়, অর্থাৎ প্রায় গেঁয়ো ভূত একটা—ওটাকে ভায়োলেট নিজে এসে ডিনারের নেমন্তন্ন করে গেল, বিষয়টা কি!

—গেঁয়ো ভূত, গেঁয়ো ভূত করছ কেন? মেস বাড়িতে থাকলেই সবাই গেঁয়ো ভূত হয় নাকি? মানুষের পরিচয় তা কে দিয়ে—সে কোথায় থাকে, কি খায়, তা দিয়ে নয়। আর যতীন? গেলবারের আগের বার ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। বাবা কোন কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপাল, টেনিসে চ্যাম্পিয়ন, গানে সরলাদেবীর কোরাসে আছে, এখনো লেডী চৌধুরীর বাড়ির সংগীত সঙ্ঘের নিয়মিত গাইয়ে। এর চেয়ে ভালো ছেলে তামাম বাংলাদেশে কয়টা আছে জানি নে।

—এইবারে বুঝেছি। এ ছেলেটির কথাও ত শুনেছি মায়াদির কাছে। রিণা মল্লিকের জন্যে ওকেই ত গাঁথবার তালে আছে ওরা—কাজে কাজেই জলচল সমাজে উঠে গেছে। মায়াদি ঠাট্টা করে বলেছেন গেঁয়ো ভূত, নিন্দে করে নয়। মানে সাধারণ ভদ্রঘরের ছেলে, তবকদার সমাজের নয়। ওরা বাড়িতে মাকে মামি আর বাবাকে ড্যাডি বলে না, কি রঙের টাইয়ের সাথে কোন রঙের মোজা পরতে হবে আর সেই রঙের রুমালের কোণা বুক পকেট থেকে একটু উঠে থাকবে—এ সবের খোঁজ রাখে না, তাই না?

বোধ হয় তাই, তবে আমিও যতীন সম্বন্ধে খুব ইন্টিমেট খবর রাখিনে। জানি ওর বাবা হাজারিবাগ না কোন একটা জায়গার কলেজে প্রফেসর ছিলেন, এখন ভাইসপ্রিন্সিপাল হয়েছেন। আর যতীন পড়াশুনা খেলাধূলা ব্যায়ামচর্চা এই সব নিয়ে থাকে। ওর

ঘরে বিবেকানন্দ নিবেদিতার ছবি টাঙানো দেখেছি, মনে হয় গীতাটিতাও পড়ে—

—বলিস্ কি! টেররিস্ট নয় ত রে—

—তাদের বুঝি কপালে দাগ কাটা থাকে?

—না না, এই অরবিন্দ বারীন ঘোষের সমগোত্র মনে হল তোর কথা শুনে, তাই।

—আমি যদ্দূর জানি, যতীন চাকরি মানে প্রফেসারি ছাড়া অন্য চাকরি করতে চায় না। তবে বিলেত যাবে শিগগির।

—তবেই হয়েছে, রিণা মল্লিককে বিয়ে করতে রাজি হলে রিণার বাবা ওই সানি মিত্তিরকে ধরেই তোর যতীনকে আই সি এস্ পরীক্ষা দেওয়াবে, এই আমি বলে রাখলুম।

—তা দেওয়াক্ গে, সে যার ব্যাপার তারা বুঝবে। তবে ভায়োলেট নিজে টু-সীটার স্পোর্ট্‌স চালিয়ে জিৎ মানে যতীনকে ডাকতে আসছে—

—বেড়ে জমেছে তা হলে বল্। বাপ মা টুটু ভায়োলেট ও রিণা যতীন জাল ফেলছে, জালের মাছ যে জাল ছিঁড়ে বেরোনোর তালে আছে ধরতে পারছে না। বুঝলি রে পাঁঠা রিণা ড্রাইভার অর্থাৎ বাপমায়ের চালানো গাড়ির প্যাসেঞ্জার, আর ভায়োলেট নিজেই নিজের গাড়ির ড্রাইভার—টার্গেটে পৌঁছনোর চান্স শেষের জনেরই বেশী।

—তোমার কথা যেন সত্যি হয় গোকুলদা। টুটুর মতো একটা ডেস্‌পিকেব্‌ল্ গে লোথিয়ালের থেকে—

—স্বর্গের দেবী, না রে? মরেছিস, তুইও মরেছিস। দীনেশ আসুক, সে সব খবর রাখে ওদের—ওই সমাজেরই কিনা। তবে যা চাপা, হয়ত জানলেও ভাঙবে না কিছু।

ভায়োলেট বেশ বাড়িয়েছে। যখন তখন টু-সীটার এসে ধ্যাদ্ধেড়ে বাসাবাড়ির সামনে দাঁড়ায়। থাকলে যতীনকে নিয়ে

উধাও হয়। ফ্যাশনেব্‌ল্‌ মল্লিক বাড়িতে যাওয়া আসা কমিয়ে দিয়েছে ভায়োলেট। টুটুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও রিণার কাঙ্ক্ষিত টার্গেট হওয়া সত্ত্বেও যতীনকে কাট্‌ করছে মল্লিকবাড়ি। যতীন ও সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাগত কোনো দিনই ছিল না। উপেক্ষা ও আপ্যায়নের বৈষম্য তার মনে কোনো দাগ কাটে নি। টুটুর সঙ্গে বাইরে দেখাসাক্ষাৎ হলে সে এড়িয়ে যায়, এটুকু চোখে পড়েছে। একটু বিস্মিত ও ব্যথিত হয় নি যে তা নয়, তবে ও নিয়ে বড়ো মাথা ঘামায় নি।

তরুণীমহল মুখরা, কত কি বলে এ ও সে। গিন্নিদের কানে তার ছিটেফোঁটা পৌঁছয়।

কেটি বলে—কি ভাল্‌গার, মা গো মা! আদবকায়দার ধার ধারে না, মেয়েদের দেখলে পোলাইট্‌লি নড্‌ পর্যন্ত করে না। অশিক্ষিত জানোয়ার একটা! তার পেছনে কিনা ভায়োলেটের মতো মেয়ে—

মলি সেন পছন্দ করেছিল যতীনকে, ভালোবাসায় কিনা জানা নেই, ভালো লাগায়! সে ফোড়ন কাটে,

—ঠিক ঠিক! ড্রিঙ্ক করে না, এম্প্‌টি হাউসে নিয়ে আধঘণ্টা ইন্টিমেট হয় না,—আনকালচার্ড আর কাকে বলে!

—কি, কি বলতে চাও তুমি? কাকে হিট্‌ করে কথা বলছো তুমি? Heiress of a village kabiraj, টাকার গরমে ধরাকে সরা জ্ঞান করছো—

খেপে উঠে বলতে বলতে কেটি মারমুখি হয়।

মলি অপমান গায়ে মাখে না, যেন জানে এ সব আউটবার্স্ট্‌ হবেই আঁতে ঘা দিলে।

বলে—এই বলছিলাম কি, যা বল্‌লুম ওগুলো প্যারাগন অফ্‌ কালচার টুটু মল্লিক করে, আর যতীন, আনকালচার্ড কিনা, করে না। এইত সোজা বাংলা কথার মানে, তা গায়ে পড়ে মারমুখি হবার

মতো কি কিছু বলেছি? মনের অজানা পাপ নেই, নিজেই তুমি সব জানো।

রাগে, ক্ষোভে, অপমানে হতবাক্ হয়ে যায় কেটি। চোখ দিয়ে আগুন ঝলকায়।

বলে—আমি জানি?

—জানোইত, বেশ ভালোভাবেই জানো, নির্মমভাবে বলে চলে মলি,—তাইত. ভেবেছিলে রুখতে পারবে টুটুর সাথে ভায়োলেটের এনগেজমেণ্ট, ব্ল্যাকমেল করবার মালমশলা তোমার জিম্মায় কম নেই। ভায়োলেটের পেছনে টুটু হন্যে কুকুরের মতো ছুটছে দেখে ঘাবড়ে ছিলে বইকি!

ব্ল্যাকমেল! আমার জিম্মায়।

এবারে কথার সুরে আগুনের দাহ নয়, বর্ষার মেঘের ছোঁওয়া,—ভাগ্যিস্ যতীন ছিল, ভায়োলেট বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়েও টুটুকে পুঁছলো না। কোথায় কৃতজ্ঞ হবে, তা না, যতীনকে ভাল্গার ইম্পোলাইট্ বলে গালাগাল করছ!

কথাগুলো সব সত্যি, মর্মান্তিকভাবে সত্যি। কেটির গোপন দুঃখের বোঝা এমনিতেই কম নয়, এখন যেন আরো ভারী হয়ে তাকে মুষড়ে দেয়। দু হাতে মুখ ঢেকে চোখের জল চাপতে চাপতে স্খলিতে পায়ে বেরিয়ে যায় সে। তার গর্ভস্থ সমূহ সর্বনাশের ভ্রূণ দিনে দিনে বেড়ে উঠছে। এ সব কথা মলি সেন জানলে কি করে?

বড় মহলেও গ্যাঁজালির অন্ত নেই। মল্লিক মেম বলেন,—জানিনে ভাই কি সব আজগুবি কাণ্ডকারখানা হচ্ছে আজকাল। কে জানত মেয়েটার মতিগতি এমন! ওর মা, বীণা ত কথাই দিয়েছিল এক রকম যে এবার লণ্ডনে ফিরে যাবার আগেই এন্‌গেজমেণ্ট্ অ্যানাউন্স করে যাবে।

মলির বৌদি মিসেস সেন বলেন,

—মায়ের কথাটাই পাকা ধরে নিলেন দিদি, আজকালকার মেয়ে,

তার ওপর আজন্ম বিলেতে, তারও যে নিজের ভালো লাগা না লাগা থাকতে পারে। একটুও ভাবলেন না?

—ভায়োলেটের অন্যত্র মন বাঁধার কথা ত আগে কিছু শুনিনি ভাই। টুটুর বেলা কোনো অমতের কথাও শুনিনি। কোত্থেকে এক হা-ঘরের ছোঁড়াকে বন্ধু বলে বাড়ি নিয়ে এলো টুটু—

—ছি ছি, ও কথা বলবেন না, আপনি মা! কারো বাপ মা নিয়ে কথা বলবেন না। আর, যদি হা-ঘরের ছেলেই হতো তবে রিণার সঙ্গে যতীনের বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন কেন। সেটা বলবেন?

মল্লিকগিন্নির গিল্‌টির তলায় পেতল উঁকি দিয়েছিল অজান্‌তে—রাগের মাথায়। সামলে নিয়ে বললেন,

—তা ভাই, তা বটে। ওরকম বলা আমার ঠিক হয় নি। বলতে চাইছিলুম কি ছেলেটা ত আর আমাদের সমাজের নয়। সাধারণ গেরস্ত বাড়ির ছেলে। ওর বাপ, কোন্ মফঃস্বল কলেজে পড়ায় যেন, কলেজে ওঁর সাথে পড়ত, বেশ ভাবও ছিল এককালে। যতীন পড়াশুনায় ভালো—যদি সার্বিস পরীক্ষা দিয়ে জাতে ওঠে—তাই ভাবছিলুম, মন্দ হয় না রিণার সাথে, এই আর কি!

ওই ভরসাই ত এখন ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দিদি, না? যদি সার্বিস্ পরীক্ষা দিয়ে জাতেই ওঠে। তবে ভায়োলেটের সাথেও যে বে-মানান হবে না যতীন, সে কথা কি সানি মিত্তির বুঝবেন না? কি বলেন দিদি—

কথাটা সত্যি, মুখরোচক নয় যদিও। টুটুর মা ক্ষান্ত দেন।

গোকুলের মায়াদি, স্যার বি এন রায়ের পত্নী লেডী রায়ও হাজির ছিলেন সেখানে। মিসেস মল্লিককে বললেন, তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ টুলুদি। যতীন ভালো ছেলে, ভালো গান গায়, ভালো স্কলার। তার সাথে যদি ভায়োলেট মেশেই, সেটা এমন কি ব্যাপার যে তিল থেকে তাল গড়ছ? আর তাদের আলাপও ত তোমার এখানেই—

—তুই খোঁজ রাখিস্‌নে মায়া। ভায়োলেট খোলাখুলি বলেছে যে টুটুকে বিয়ে করতে নারাজ।

—আর অমনি তোমরা ধরে নিলে যে সে যতীনকে বিয়ে করছে?

—তা না ত কি? তাছাড়া। আর কি কারণ থাকতে পারে?

—হাজার কারণ থাকতে পারে। হয়ত ভায়োলেট আদৌ বিয়ে করতে চায় না এখন। ওরা সব বোল্‌শী হয়ে যাচ্ছে ল্যাস্কির কাছে পড়ে।

তার মা বলেছেন, তবুও—

মা বলল, আর বিয়ের কনে ঘোমটায় মুখ ঢেকে অমনি এসে পিঁড়েয় বসল, এ বাবা তোমাদের দিনকালে হতো—আমাদেরও। কিন্তু হাল আমলে ওসব প্রথা অচল।

—তা হলে কথাটা তুললই বা কেন মিত্তিরগিন্নি তাও ত বুঝিনে বাবু।

শুনেছি টুটু নাকি ইডেনের টেনিস মাঠে যতীনকে যাচ্ছেতাই করে অপমান করেছে সবার সামনে। বোধ হয় সোবার ছিল না। আজকাল বেশীর ভাগ সময়ই থাকে না শুনি। কিন্তু সেদিন দেশী বিদেশী আরও অনেক খেলোয়াড় ছিল সেখানে। ওকামাটো, লংফিল্ড, শ্প্যালো, শর্মা—আরো অনেকে। কমিটি থেকে টুটুকে ক্লাবে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে, নাকি নাম কেটে দেবে ব্ল্যাকবল করে।

মলির বৌদি বলেন—মায়া ভাই, থাক থাক—ওসব কথা টুলুদিকে নাই শোনালে।

—আরে শোনাই কি সাধে? নিজের ঘরের ময়লা বাইরে কেচে লাভ নেই, সে আমি জানি। আচ্ছা, যদি ধরেই নি, ভায়োলেট টুটুকে পছন্দ করে নি, বে করতে রাজী নয়। তার মানেই ধরে নিতে হবে যতীন এসে বাগড়া দিয়েছে? আর যতীনকে যদি ভালোই বেসে থাকে ভায়োলেট, সে ত সর্বাংশে সুখবর। সাবালক মেয়ে সাবালক ছেলেকে নিজে ভালোবেসেছে। প্রতিদান

পেয়েছে, এক সাথে জীবন গড়বে ওরা, এই যদি মনস্থ করে থাকে, তবে কার বলবার কি আছে, আমি ত বুঝি না। ওদের বাপমায়েরও কিছু বলা উচিত নয় এক্ষেত্রে।

মায়ার হিতকথা টুটুর মার পছন্দ নয়। কিন্তু মলির বৌদি সুখী। বলেন,—যা বলেছো মায়া। খামখা জল ঘোলাচ্ছে এরা। অপেক্ষা করুক্, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। বেশী সময় লাগারও কথা নয়। এত উতলা হলে চলবে কেন? আর লাভই বা কি?

যতীনের সঙ্গে এক মেসে থাকতাম, এই সুবাদেই ভায়োলেটকে আমি প্রথম দেখি। যতীন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুও নয় সহপাঠীও নয়। এক কলেজের ছেলে, অতো পড়াশুনায় খেলাধূলায় গানে চৌকস ছেলে সে। বীরপূজা করতাম হয়ত মনে মনে।

এম্ এ-টা হয়ে গেলেই ও বিলেত যাবে শুনেছিলাম। মেসে থাকত খুব সিরিয়স, গম্ভীর হয়ে। এত যে ভালো গাইয়ে বলে সুনাম, মেসের লোক এক কলি গানও তার গলা থেকে শোনেনি কোনো দিন।

সেদিন রাতে খেতে যাবার আগে বাথরুমে গেছে যতীন। সেখান থেকে হঠাৎ গুরুগম্ভীর সুরেলা গলার গানের এক লাইন শোনা গেল,

"অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান!"

অবাক হলাম বটে, প্রেমোন্মেষের আনন্দ উল্লাসের ছোঁয়া লেগেছে বলে নয়—তখন ত ভায়োলেটের অস্তিত্বই জানিনে—যতীন আদৌ গাইছে বলে। দেশাত্মবোধক কংগ্রেসি গান—সরলাদেবীর রচনা। কিন্তু সুরের আমেজে মনে হলো ঐ "গাহ আজি" ভাবটাই ফুটেছে বেশী। মানে, যে কারণেই হোক যতীনকে গানে পেয়েছে।

খানিক পরে খাবার ঘরে যতীনকে ভারী ফুর্তিবাজ মনে হলো। এ যেন সে গম্ভীর মানুষটি নয় আর। ডনবৈঠক করা শিলোনো শরীর, স্বল্পভাষী, ঘরে বিবেকানন্দের ছবি সে মানুষটি হঠাৎ হারিয়ে

গেছে। তার জায়গায় দেখছি হাসিখুশি সহজ চাপল্যে ভরা একটি যুবাকে, এর পিঠ চাপড়ে, ওর কথায় হেসে, যে নিজেকে সবার সঙ্গে এক করে নিচ্ছে।

চারতলায় দু'খানি ঘরের একটাতে যতীন একা থাকত, আরেকটাতে সুসঙ্গের পরিমল সিং আর আমি থাকতাম। দুপুর রাতে যতীনের ঘর থেকে চাপা গলায়,

"বড় বিস্ময় লাগে আজি হেরি তোমারে" গানটির কলি ভাঁজা শুনতে পেলাম।

পরিমল আর আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আবার শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু পরদিন ভোর থেকে আবার যে কে সেই। ভিজে ছোলা, মুগুর, ডন, বৈঠক, গাম্ভীর্য এবং পড়াশুনা। ধার কাছে ঘেঁষে কার সাধ্য। ঘরে বিবেকানন্দের ছবি ছিল বলেছি, উঁকি মেরে দেখলাম আরও দুখানা আছে, নিবেদিতার, অরবিন্দের। তখনো অরবিন্দ মহর্ষি হন নি, হব হব করছেন। কোনো কথা কওয়ার দরকার নেই, তবু বললাম,

—যতীনদা, কাল রাতে খুব গান গাইছিলে, রিহার্সাল ছিল বুঝি?

—হ্যাঁরে, ইন্স্টিট্যুটে। আর মাসখানেক পরেই ফাংশন কিনা।

—আচ্ছা। টেনিস্ ফাইন্যালের দেরি কত?

—সেও মাসখানেক।

—তুমি ত একদিনও মন দিয়ে খেলছ না।

—খেলেছি বৈকি, কালকেই খেলেছি। তবে হ্যাঁ—ফাইন্যালের মহড়ার খেলা নয়, এমনি একজনাদের বাড়িতে ঘরোয়া খেলা।

—বুঝেছি। জাস্টিস্ মল্লিকদের বাড়ি।

—খোঁজ ত সবই রাখিস। হ্যাঁরে মনীশ, তুই ল পড়ছিলি না?

—ছেড়ে দিয়েছি।

—কি করছিস তবে?

—এটা সেটা চাকরির চেষ্টা, আর কি! পড়াশুনার লাইনে ত তেমন তুখোড় নই, যে কম্পিটিটিভ্ পরীক্ষা দেব।

—না না—লাস্ট ইয়ার থেকে ইণ্ডিয়াতেই সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষা হচ্ছে—বসে ত যা, তারপর যা হয় হবে।

—আর তুমি?

—আমাকে এম্-এ দিয়ে বাইরে যেতেই হবে। চাক্‌রি-বাক্‌রি আমার করার ইচ্ছে নেই, এক এডুকেশন লাইন ছাড়া।

কথা আর এগোলো না, সরে পড়লাম। তখনকার কালে একটা দেবদুর্লভ চাক্‌রি ছিল বটে, ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্বিস্। কলেজে হোম, কয়াজী, জাকারিয়া এঁদের দেখেছি, হোম, কয়াজীর কাছে পড়েছিও। কী তাঁদের বিদ্যা, কী তাঁদের সম্মান। যতীনের কথায় মনে মনে খুশীই হলাম।

সেই দিনই বিকেল তিনটে নাগাদ বেরুচ্ছি, কল্লোলে যাব বলে। কল্লোল আপিস দিনকতক জন্যে সুকিয়া কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ে উঠে এসেছে তখন, এই প্রেসিডেন্সী ফার্মেসীর উল্টো ফুটে। বেরোবার সময় দেখলাম যতীনের ঘরে তালা, মনে পড়ল টেনিস্ ব্যাট নিয়ে বেরিয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

নিচে নেমে বড় রাস্তায় পড়েছি, একখানা লালরঙের ল্যান্সিয়া টু-সীটার খুব ধীরে ফুটপাথ ঘেঁষে এসে আমাকে দেখে দাঁড়ালো। চালাচ্ছিলেন এক মহিলা, হাত ইশারায় আমাকে ডাকলেন তিনি। গৌরবে মহিলা বললাম, আসলে যুবতী।

আমি বস্তি সাহিত্য লিখি, রূপবর্ণনা আমার আসে না। এলেও সে রূপের বর্ণনা ভাষায় কুলোত না।

তিনি দরজা খুলে নামলেন। জিজ্ঞেস করলেন, জিৎ—সরি, যতীন রায় থাকেন এখানে?

জবাব দেব কি, সে অপরূপাকে দেখে সত্যিই আমার বাক্‌রোধ হয়েছিল। শুধু ড্যাব্‌ড্যাব্ করে তাকিয়ে দেখছিলাম, এক অঙ্গে

এত রূপ! সোনালি ঘাড় ছাঁট। চুল উড়ছে, সাদা মার্বেলে খোদাই গ্রীক দেবীর মতো সবল সুঠাম মূর্তি, চোখের তারা নীল, ঘন নীল। পরনে সাদাসিধে লালপেড়ে দুধে গরদ।

সদা সপ্রতিভ ডান্‌পিটে যুবনাশ্ব আমি, সেই আমারই ও অবস্থা! মেয়েটি হেসে ফেলল, বলল,

—যতীন রায়কে চেন? সে থাকে এখানে?

এ মেয়ে দেখছি বাংলা তুমি-আপনির ধার ধারে না। ইংরেজি ইউ দিয়েই ভব্যতা বজায় রাখে। বললাম,

—হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকে যতীনদা। তবে এখন ত নেই। বোধ হয় ইডেনে প্র্যাক্‌টিস করতে গেছে।

—ওঃ, সেই বেঙ্গল টেনিস্। ডাব্‌ল্‌সে ফাইন্যালিস্ট, না?

—হ্যাঁ।

—তোমার নামটি কি ভাই?

নাম বললাম।

—আচ্ছা মনীশ, যতীন এলে বোলো যে ভায়োলেট মিত্তির এসেছিল, রাত্তিরে তাদের বাড়িতে—বরানগরে ডিনারের নেমন্তন্ন করতে। নতুন জায়গা, একটু বেলাবেলি যায় যেন। বাড়িটার নাম "মেডোজ," সুরেদের ফ্যাক্টরির গলি দিয়ে গঙ্গার দিকে যেতে হবে। ব্রিজ পেরিয়ে আধ মাইলের মধ্যেই।

বলেই স্বপ্নবাসবদত্তা ল্যান্সিয়ার কাট্ আউটে ফট্‌ফট্ শব্দ করতে করতে তীরবেগে বেরিয়ে গেল।

ধন্দ ধরা ভাব কাটিয়ে একপা দু'পা হাঁটছি, আর ভাবছি, এর সঙ্গে যেন আমার বহুদিনের পরিচয়, সব সময় কাছে কাছে আছি, যাবার সময় সামান্য সৌজন্য প্রকাশেরও ত দরকার নেই তার—করলেই বেমানান হতো, সোজাসুজি 'তুমি' বলে কথা কইল, ফরমাশ দিয়ে গেল যেন রাজরাণীর হুকুম, তামিল করাই যেন আমার অভ্যাস,—

এত স্বচ্ছন্দ, এত সহজ মনটা ভরে উঠল।

আবার ফিরলাম। চারতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম।

॥ এগার ॥

কল্লোলের আড্ডা ভাঙতে রাত নটা ত হবেই, যতীনের ঘরের দোরে অথবা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে খবরটা লিখে রেখে যাই।

নিজের ঘরে গিয়ে স্লিপ প্যাডে লিখলাম—

"ভায়োলেট মিত্তির, মেডোজ, বরানগর
করছিল যতীনদা, তোমারি খোঁজখবর,
রূপের ছটায় আলো করে গেল দশদিক—
রাত্রে সেখানে খাবে, দেখো যেন যেয়ো ঠিক।"

জানালা দিয়ে স্লিপটা যতীনের বিছানায় ছুঁড়ে দিলাম। তারপর মনে হলো, যদি চোখে না পড়ে? বড়ো কাগজে বড়ো হরপে ওটা লিখে যতীনের ঘরের বাইরের কবাটে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলাম।

কবি নই। কাজেই ওটা কবিতা হলো কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। দু'একবার নিরীক্ষণ করে দেখে নিলাম মানেটা পরিষ্কার হলো কিনা।

মোটামুটি বোধগম্য হয়েছে দেখে তিন লাফে নিচে নেমে কল্লোল-মুখো রওনা দিলাম।

কর্তা সাহেব মহল ছোক্‌রা-ছুক্‌রির হৃদ্‌জগতের ধার ধারেন না, ওসব ধোঁয়াটে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁদের নেই। চাকুরে ছাড়া অন্য সাহেবদের সময় দশ গোল্ডমোহর, একুশ গোল্ড-মোহর, শেয়ার বাজার, তেজিমন্দি, বৈদেশিক মুদ্রা, আমদানি রপ্তানি এইসব মুনির্নীত মূল্যমানের বাটখারায় মাপা। রয়সয় ধরনের নরম পলিটিক্‌স, নোবেল লরিয়েট হবার দরুন টেগোরের ড্যান্সড্রামা, ব্যারিস্টার হবার দরুন অতুলপ্রসাদের গান, বড়জোর ইংরেজির

এম্. এ শিশির ভাদুড়ির কিছু নাটক ওঁরা টলারেট করেন। অন্তরের অভ্যন্তরে নিজেদের দাস বলে জানেন, বাইরে ভাবসাব দেখান যেন ওদের সমগোত্রীয় তাঁরা।

জমায়েৎ হলে ক্লাবে কি বাড়িতে গ্যান্ডির নন্-কো-অপারেশনের বিষ কলুষিত করছে বলে তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ ঝাড়েন। সি আর দাস, জে. এম্. সেনগুপ্ত মোটিলাল নেহেরুর আত্মত্যাগ, বৈরাগ্য অবলম্বন, মোটা খদ্দর পরিধান মুখ টিপে হাসবার বিষয় বলে মনে করেন।

মাঝে মাঝে একাধিক পেগের পর ঝাঁজ ফুটে বেরোয়—হ্যাঁ, হ্যাঁ —দেখেছো বারডান, মোটি দি গ্রেট্, সেও কিনা বাড়ি থেকে সেলার উঠিয়ে দিল! সি. আর. নাকি পারি থেকে সেণ্ট পারফ্যুম আনা বন্ধ করে দিয়েছে—যত সব হামবাগ, দেশটার হলো কি,—

চুরুটের চিবানো তেতো দিকটা কুট করে দাঁতে কেটে থুথু করতে করতে জুনিয়র ব্যারিস্টার বর্ধন সাহেব বলেন,—মিলটন বলেছেন Scorn delight and live laborious days গ্যান্ডির চ্যালাদের নন্কো-ভার্শন দাঁড়িয়েছে Scorn labour and live delirious days!

বলে কিছুক্ষণ শিবনেত্র হয়ে থাকবার পর হাঁক ছাড়েন।

—ব্যোয়—আউর একঠো ডাব্ল স্কচ্।

তবে ওঁরাও দিশিদের মধ্যে গুঁপো-সরস্বতী স্যার আশুতোষ কিংবা নির্ভীক রামানন্দ চাটুজ্যেকে সমীহ করেন। তরুণ তরুণীরা কি ভাবছে, কি করছে খোঁজ রাখা দরকার মনে করেন না, যদি না—

যদি না কেলেঙ্কারি কাণ্ড একটা কিছু ঘটে না বসে, প্রায় ক্রাইমের পর্যায়ে, অর্থাৎ অ্যাবর্শন, ইলোপমেন্ট, এই জাতীয় একটা কিছু। তখন ধামা চাপা দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

তরুণী কিংবা গিন্নীমহল যার আভাসে চঞ্চল হয়ে ওঠেন, সে রকম লক্ষণ কিছু তাঁদের চোখে পড়ে না।

বিদিতা বলে অত্যাশ্চর্য মেয়েটি—যার নাম ভায়োলেট মিত্তির বলে সর্বজন বিদিত, একদিন সন্ধের সময় রডন স্ট্রীটের বাড়িতে আসে।

রিণা ও তার মা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না বাসায়। ভায়োলেট রিণার চিবুক নেড়ে দিয়ে বলে,

—আছি, না গেছি, খোঁজখবরও ত আর নিস্‌নে!

রিণা কিছু বলবার আগেই তার মা গলায় ব্যাজার ব্যাজার সুর তুলে বলেন,

—কি জানি বাছা, খেলতে এলে একদিন খেলেও গেলে বেশ। কিন্তু কী খেলা যে খেললে তলে তলে। আমরা বাবু বুঝে উঠতে পারি নি। তোমরা হলে গিয়ে খাস্‌বিলিতি পরিবার। আর আমরা এ দিশি সাদাসিধে মানুষ—

—এ সব কি বলছেন আপনি, মাসিমা? কি করলুম আমি যে আঘাত দিয়ে কথা বলছেন? কলকাতায় আমরা একযুগ পর এলুম সত্যি, এখানকার হালচাল খুব রপ্ত হয়ত হয়নি, তাই না জেনে যদি—

—না জানার কথা তো নয় তোমার মা ত একরকম পাকা কথাই দিয়ে গেলেন, অবশ্য তোমার বাবা কিছু বলেন নি এখনো। তিনি কিছু জানেন কিনা, তাও জানিনে। তবে জানবেনই বা না কেন? তোমার মা খালি একটু খোঁচ রেখে গেছলেন যে, মেয়ে বড়ো হয়েছে, তার নিজস্ব মতামত আছে সেটাও জানা দরকার। শুন্‌লুম তুমি টুটুর সাথে নিজেকে জড়াতে নারাজ—

রিণা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার মা বলে চললেন,

—এই সপ্তাহেই স্টেট্‌স্‌ম্যানে এন্‌গেজমেন্ট ছাপার কথা ছিল। তুমি নাকি সব নাকচ করে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে বসে আছো আর, আর—

—নাকচ করার কথা ঠিকই শুনেছেন আপনি। আমি জলে পড়িনি যে ভাঙা-হাঁড়ি কি কলসী দড়ি দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে না দিলে ডুবব। আমি ত স্বপ্নেও কখনো টুটুকে একজন বন্ধুর থেকে বেশী কিছু

মনে করিনি। আমি বড় হয়েছি, আমার ভালো লাগা বলে একটা জিনিস আছে। আর বাবা মা আমাকে নিঃসঙ্কোচে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার অধিকার দিয়েছেন। তা ছাড়া আমার এখনো পড়াশুনার দিকে আরো অনেক কিছু করবার আছে, বিয়ে-টিয়ের কথা ভাববার আমার সময়ও নেই, মন-মেজাজও নেই।

টুটুর মা নির্বাক রইলেন। রিণা উস্‌খুস্ করতে লাগল। মল্লিক-গিন্নি একটু পরে বললেন,

—টুটুর সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গতা অনেকবার চোখেই পড়েছে। তাই কি করে বুঝব সবাই যে সেটা একটা ছেলেখেলা!

—ওপর ওপর মেলবার মেশবার পক্ষে টুটুর মতো আইডিয়াল ছেলে হয় না। কিন্তু তার থেকে বড়ো কোনো আসনে তাকে মনের মধ্যে বসাতে পারিনি, পারবও না। ওরকম ছেলে, যারা হৈচৈ করে, খেলাধূলা করে, কোনো কিছুতে সীরিয়স নয়,—মাফ করবেন, ড্রিঙ্কও বেশ বেশী করে,—এ টাইপের এন্তার ছোক্‌রা লণ্ডন পারি বার্লিনের পথেঘাটে ঘুরছে। জীবনসঙ্গী করবার মতো তার মধ্যে কোনো সদ্‌গুণ আমি আবিষ্কার করতে পারিনি, মাসিমা।

—তোমার মা, হয়ত বাবাও, এদের কথা দেবার কোনো দাম নেই তোমার কাছে।

—বাবা কখনো কথা দেননি, দিতে পারেন না, আমি জানি। মাও নিশ্চয় কথা দেন নি। আমাকে আগে জিজ্ঞেস না করে দেওয়া তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়। আর যদি এমন ঘটেই থাকে, যে তাঁরা এমন কোনো প্রসঙ্গের কথা উঠিয়েছিলেন, যা আলতোভাবে কমিটমেণ্ট বলে ঠেকতে পারে, তার জন্যে খুব দুঃখিত হওয়া ছাড়া আমি আর কি করতে পারি?

—তবে, তবে যে কানাঘুষো শুনি, তুমি একটা অসভ্য গেঁয়ো ছোঁড়ার—

ঐ দেবী মূর্তির যদি কপালে আর একটা চোখ থাকত তবে তিন

নয়নতাপে মিসেস্ মল্লিক পুড়ে যেতেন। কিন্তু অশিষ্টতা প্রকাশের কুশিক্ষা ভায়োলেট পায় নি। তাই ঠাণ্ডা সুরেই বলল,

—আমি আপনার মেয়েরই মতো, বাড়িতে পেয়ে দু'টো কটু কথা শোনালে কিছু বলতে পারিনে। তবে যার কথা বলছেন, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক এখনো গড়ে ওঠেনি। তার মন আমি জানিনে, তাকে ভালো করে চিনিও নে। ঐ অভব্য গেঁয়ো ছেলেটার জন্যে টোপ ফেলে আরো দু'একটি মেয়ের মা বাবা গেঁথে ডাঙায় তোলবার জন্য অপেক্ষা করছেন জানি।

—তোকে আঘাত দেবার জন্য কিছু বলিনি রিণা, যদি কষ্ট দিয়ে থাকি; মাফ্ করিস্ ভাই।

—ভায়োলেটদি, চলো আমরা মাঠে গিয়ে বসি।

—চল্। তাই চল্।

দু'জনে টেনিস্ কোর্টের প্রান্তে বেঞ্চিতে এসে বসে। অনেকক্ষণ কেউ কথা কয় না।

রিণা প্রথম কথা বলে।

—আমাকে কষ্ট দেবার কথা তুললেই যদি, তবে আমি বলি, আমার দিক থেকে কোনো টান নেই যতীনের ওপর। বাবা মা ওর সন্ধান পেলেন দাদার কাছে। দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। বিলেত যাবে, পরীক্ষা দিয়ে চাক্‌রি পাবে। এই সব আশায় অমনি একটা কথা উঠেছে নিশ্চয়। কিন্তু ওরও নিজের বাবা মা আত্মীয়স্বজন আছেন তাঁদের মতামতও কেউ জানতে যায় নি। ওর দিক থেকে আমি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি যে কোনো আকর্ষণ আদপেই নেই।

—তবে আমি কোনো অপরাধ করিনি মাসিমাকে ঐ সব কথা বলে—

—মনে ত হয় না। তবে তুমি ভায়োলেটদি, মরেছ।

—মরে লাভ কি হবে রে পাগ্‌লি, মরাই শুধু সার হবে। তা ছাড়া, বাবার বাল্যবন্ধু কে একজন আছেন, কোন কলেজের অধ্যাপক

যেন। ছেলেবেলায় ওঁরা এক মন একপ্রাণ ছিলেন। তাঁর এক ছেলে নাকি আছে। তার সাথে,—মানে বাবার প্রায় কথা নাকি দেওয়াই আছে। কাজেই মরা ছাড়া আমার আর কি লাভ হলো বল? বাবার দেওয়া কথা থাকলে, যতই না কেন বুলি কপ্‌চাই, বাবার অবাধ্য হতে আমি পারব না।

—এই সব ট্রাজেডি হয় কেন ভায়োলেটদি?

—হয়। হয়ত ভালোর জন্যই হয়। মানুষ নিয়ে যেমন সমাজ, তেমনি সমাজের স্তরভেদে মানুষের মতামতের, কথার, দাম আছে বলেই হাজার বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সমাজ চলছে। আমি যা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনে। আমার গুরুজন, যাঁরা বয়সে অভিজ্ঞতায় আমার থেকে অনেক উঁচুতে, তাঁরা যা করতে চাইবেন, আমার মনোমত না হতে পারে, কিন্তু দূষ্য মনে করব কেন? তবে যাকে দেখেই প্রথমে বিতৃষ্ণা আসে—আবার মাপ চাইছি, আমি টুটুর কথা বলছি—তার সম্বন্ধে আর কিছু ভাবতে রাজী নই। আর যদি এমন হয়, যে এখানেই কথা দেওয়া আছে বাবার, যেটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখছি না, তবে খোলাখুলি আমার মন উপুড় করে দেব মা বাবার কাছে, তাঁরা কখনো এমন একটা বিষয়ে আমার ভালো লাগা না লাগার দাম না দিয়ে পারবেন না।

রিণা চুপ করে বসে এই তেজী মেয়েটার মনের নরম দিকটা দেখবার চেষ্টা করে। আপসের দিকটা, অথচ নিজের জেদ বজায় রাখার বলিষ্ঠতার দিকটাও।

—মলি সেনের সেদিনকার গাওয়া গানটা মনে পড়ছে।—"মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে।"

—কিন্তু পরের লাইনগুলো মনে রেখো ভায়োলেটদি, "বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা, সুধার হাটে ফুরোবে বিকিকিনি, হে গরবিনী।"

—আমি গরবিনী নই আদৌ, মনে রাখিস্। সুসময় এলে ধরা

দিতে যান সাধ করেই। তবে সবায়ের মনে সব সাধ কি মেটে? দেখি যদি সুসময় আসেই, খবর পাবি রে পাবি।

এই সেই কথাবার্তা শেষ হতে রাত গভীর হতে থাকে। আজ আর দু'জনের মনেই কোনো গ্লানি নেই, মুক্ত পাখির মতো স্বচ্ছন্দ স্বপ্ন বিহার একজনের মনে, আর একজন সহানুভূতি বিগলিতচিত্তা।

রিণার মা জানলেন না ওদের কি কথা হলো, শুধু টের পেলেন দু'জনেই যেন বড়ো কাছাকাছি এসে গেছে জাদু মন্তরে।

ঘটনা পরম্পরা নাটুকে ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে থাকে। হাজারীবাগ থেকে বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে যতীন চলে গেল একদিন। ফিরল দিনকতো পরে।

আবার চোখে ঠেকল ওর অসহায় চেহারা। মনের মধ্যে কি একটা আলোড়ন চলছে, ও যেন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ভেতর ভেতর, বাইরে কিছু প্রকাশ করছে না।

আমি ওর কোনো গোপন কথার অংশীদার হওয়া দূরস্থান, মোটামুটি অন্তরঙ্গও ছিলাম না। এই মেস্ বাড়িতে—কেরানী-দরজি-স্কুলমাস্টার ইত্যাদির দঙ্গলে. এক কলেজের ছাত্র সুবাদে আমি একটু একটু করে ওর দোসর হয়ে উঠছিলাম মাত্র।

ও বলল যে, বাবা তার করেছিলেন এম্ এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বিলেত যাওয়ার আয়োজনে যাতে দেরি না হয়ে যায় তার দিকে নজর রাখতে। আর, বিদেশযাত্রার আগে ওকে বিয়ে করে যেতে হবে, একথাও বলেছেন।

বাবার এক ছেলেবেলার হরিহরাত্মা বন্ধু আছেন। তিনি কাজে-কর্মে বিদেশ থাকেন। সম্প্রতি নাকি কলকাতা এসেছেন, তাঁর বড় মেয়ের সঙ্গে যতীনের বিয়ের সম্পর্ক ওঁরা পরস্পর করে রেখেছেন পাত্রপাত্রী খুব ছেলেমানুষ থাকতেই। তিনিও মাসকতক পরেই ফিরে যাবেন কর্মস্থলে, তার আগে শুভকাজ যদি হয়ে ওঠে, সব দিক দিয়ে ভালো হয়।

বন্ধুর নামধাম কর্মস্থল কিছুই প্রকাশ করে বলেন নি যতীনের বাবা বিশ্বেশ্বর রায়। মা মরা ছেলে যতীন। একাধারে তিনিই মা ও বাবার কর্তব্য করে গেছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে যতীন তাঁর প্রস্তাবে গররাজি হবে। কিন্তু যতীন তাই হয়েছে। প্রথমে লেখাপড়া শেষ করা, কাজকর্মের সন্ধান করা এই সব অজুহাত দেখিয়ে। সে সব কথায় কান দেন নি বিশ্বেশ্বরবাবু।

শতাব্দীর যে দশকের কাহিনী বলছি, মনে রাখতে হবে সে আমলে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা দূরের কথা. বিবাহ ব্যাপারে বেশির ভাগ শিক্ষিত যুবকই হুকুম শিরোধার্য করে সুড়সুড় করে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসত। পৃথিবীর অন্য ব্যাপারে তার বহু সুস্পষ্ট মতামত জাহির করার স্পর্ধা ঘটত, এই একটি ব্যাপার ছাড়া। বিয়ের দায়িত্ব নেবার যে অংশটুকু থাকত, তা নিয়ে ছেলেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবতে হতো না বলেও বটে, আর প্রেম করে বিবাহ করার রেওয়াজ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি বলেও বটে।

যতীনের প্রথম অজুহাত তেমন কার্যকরী হয়নি। বিশ্বেশ্বরবাবু অল্প কথার মানুষ। একটু প্রাজ্ঞ হাসি হেসেছেন শুধু। তখন যতীন লজ্জার মাথা খেয়ে বলে এসেছে, যে বিয়ে বিষয়ে তাকে যেন পীড়াপীড়ি না করা হয়। সে মনেপ্রাণে একজনকে ভালোবেসেছে—ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। সে যে কে, কার মেয়ে, কি জাতকুল, কিছুই খুলে বলে নি। এই স্বীকারোক্তির সংঘাত তার বাবাকে একেবারে নির্বাক করে দিয়েছে। তিনি সুবিদ্বান, সুবিবেচক, সর্বোপরি স্নেহশীল। শুনে তিনি আর এবিষয়ে কোনো কথাই বলেন নি, যতীন জানে যে কি গভীর ক্ষতই না সে সৃষ্টি করে এল তাঁর বুকে।

—শুনে বাবা হকচকিয়ে, কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। আর কিছু বললেন না। শুধু বললেন, ভালো করে এম্ এর জন্য তৈরি হও গিয়ে।

—অসম্ভব শক পেয়েছেন তা'হলে ?

—নিশ্চয়। মা ছেলেবেলা গেছেন। যত আবদার বায়না সব বাবা মিটিয়েছেন ছোট থাকতে। আজ বড় হয়ে এই প্রথম তাঁর অবাধ্য হলুম।—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ভাবতে ভাবতে। খেলা ধুলো, বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, ইংরেজবিরোধী দু'একটা দলের সঙ্গে দহরম-মহরম,—কিছুতে কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে আপত্তির কথা শুনিনি তিনিই সুযোগ করে দিয়েছেন আমার নিজস্ব মতামত গড়ে উঠতে দিতে।

—তা, তুমি কেন আরও একটু খোলাখুলি সব বলোনি? তাঁর কাছেও জানতে চাইতে পারতে তাঁদের বাক্‌দানের ইতিহাস?

—সে তুই বুঝবি না মনীশ। বাবা যেন হঠাৎ চুপ্‌সে গেলেন আমার কথা শুনে। অন্যজগতের মানুষ হয়ে গেলেন, আমার মুখ দিয়ে কোনো কথাই আর বেরোল না।

—সে যেন হলো। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড করে এলে, সে কিছু জানে তোমার দিককার কথা?

—কি করে জানবে? আমার এত সাহস নেই যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা করব। তারা অন্য এক জগতের জীব।

—তবে এইভাবেই থাকো। বাবাকে আধমরা করে দিয়ে এলে, যার জন্য করলে এসব, সেও কিছু জানল না। বাঃ।

—যদি কোনো দিন সুদিন আসে বলব। প্রায় নিম্ন মধ্যবিত্ত আমরা ওদের তুলনায়, যদি সব খিলখিল করে হেসে ওঠে, তাহলে লজ্জায় মরে যাব। এখনকার মতো ঝড়কে ডানায় পুষে অগোচরে থাকি, দেখাই যাক্ কি হয়—

—এটা তুমি ঠিক করলে না যতীন। আমার মন বলছে খোলা-মেলা একটা বোঝাপড়ায় আসা ভালো ছিল।

—মিছে বকিস্‌নি তুই। সে আমি পারব না। বলতে গেলাম হয়ত অনেক সাহস করে, সব শুনে যদি গম্ভীর হয়ে বলেন, "যতীন, চটিজোড়া এগিয়ে দাও তো?"

—যদি তাই বলে, তবে ত ধন্য হয়ে গেলে তুমি! আমাকে বললে আমি ত এখ্খুনি চাকর হয়ে যেতে রাজী—

—ওরে রাস্কেল, তলে তলে তুইও—

—না না, কথার পিঠে কথায় বলে ফেললাম। তবে একটা কথা তোমায় বলি। কল্লোল কাগজের সম্পাদক গোকুল নাগ এদের সমাজের লোক। খবরটবর রাখে। ওদিক থেকেও তোমার একটা ইঙ্গিত সেদিন গোকুলের কথা থেকে পেয়েছিলাম। কাজেই, যতটা অসম্ভব ভেবে নিজেকে ট্র্যাজিক হিরো বানাচ্ছো, সেটা হয়ত মূলেই আজগবি। বললে পারতে মুখ ফুটে—

—সে হয় না, সে হয় না। আমি এম্ এ দিয়েই বিদেশ যাব, সেখান থেকে বে-পাত্তা হয়ে যাব। তোরা আর কেউ আমার খোঁজ-খবর পাবি না।

—আর তোমার বাবা ছেলের কথা ভেবে অকালে মারা যান—এবং গোকুলের কথায় এক রত্তি সত্যিও যদি থাকে, তবে ওদিকের জন ও চিরবিরহিণী থেকে যান,--এই সব হোক আর কি!

কিন্তু এসব লাইনে ভাবতেই চাইলো না যতীন। ছেলে ভালো হলে কি হয়, ভীষণ গোঁয়ারগোবিন্দ। নির্বাক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ভায়োলেটের জগৎ থেকে, এই দুর্বাতিক ওকে পেয়ে বসেছে।

অপরিণতমানস যুবকের মতি স্ব-প্রভ হয়নি তখনো, বুদ্ধি আবিল। উদ্দাম কল্পনাবিলাসকে উপজীব্য করতে চায় জীবনে।

আমি ত যতীনের থেকেও ছোটো। আমার আর কতটুকু বুদ্ধি, যে সুষ্ঠু সমাধানের রাস্তায় নিয়ে যাব ওদের। পারলে, হয়ত ভয়াবহ ভবিতব্যের ভারবাহী হয়ে মর্মপীড়া পেতে হত না আমাকে।

যতীন নিজের কাজে গেল। কি কাজ বলে গেল না। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, বাবার সঙ্গে ওর যে সম্পর্ক, একাধারে মা ও বাবার, ও বোধ হয় খোলাখুলি সব কথা তাঁকে খুলে

বললে ভালো করত। ভায়োলেটকেও কিছু বলে নি, সাহস পায় নি হয়ত। কিন্তু বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না-র যুগ তখন কাটিয়ে উঠছি আমরা, যতীন না হয় পথিকৃৎ হতো, ওর সে সুবিধে ছিল বৈকি। আর আমি ওপর-ওপর আঁচে যতটুকু বোঝার চেয়েও বেশি অনুভব করছিলুম, সেটা হলো এই, যে ভায়োলেটও ওকে ভালোবেসে থাকতে পারে, এবং তা হলে সে তার বাপ মায়ের কাছে মুখ ফোটাতে পেছপা হতো না। তার সরল স্বচ্ছন্দ সৌন্দর্যের সঙ্গে নির্ভীকতার নিবিড় যোগাযোগ ছিল বলে আমি মনে করেছিলাম। ও মেয়ে কিছু সে আমলের নেকী বাঙালীর মেয়ে নয়, এটা ত প্রথম সাক্ষাতে পরিষ্কার বোঝা গেছল।

চুলোয় যাক্‌গে যতীন, আর তার প্রেমজীবন। আমাকে কল্লোল আপিসে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। কথা ছিল দীনেশদা সে দিন আমাদের নিয়ে নাট্যমন্দিরে শিশির ভাতুড়ি মশায়ের কাছে যাবেন। জীবনের বহু মনোরম দিক খুলছিল এক-এক করে, তার সবই সমান আকর্ষণীয় ছিল। শিশিরবাবুর সান্নিধ্যে পৌঁছনো তারই প্রবলতম একটি দিক। আজকালকার উত্তম-সৌমিত্র-মাধবীর আকর্ষণের পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। তা ছাড়া আমাদেরই নজরুল, শিশিরবাবুর প্রিয়গোষ্ঠীর একজন, এ গৌরবের অংশীদার হবার লোভও ছিল বৈ কি।

সন্ধেয়-সন্ধেয় মণীন্দ্র চাকীর হাতে আপিস ছেড়ে দিয়ে আমরা রওনা দিলাম হাতিবাগানমুখো। সুকিয়ার মোড় থেকে নাট্যমন্দির সামান্য রাস্তা, পথে হেদো ও বেথুন হস্টেল পড়বে। যদি দুএকখানা ফোটাফুলের মত মুখ জানলায় কি বারান্দায় চোখে পড়ে যায়, এ রকম দুর্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা সবায়ের বুকে। পথ চলতে মেয়ে দেখতে পাওয়া তখনকার দিনে দুরাশা ছিল। বেথুন দোতলার বন্ধ জানলার পেছনে অলীকসুন্দরীর উপস্থিতি কল্পনা করে স্বপ্নের জাল বুনত আমাদের বয়সী তরুণেরা। হায় রে মান্ধাতার বাবার আমল। সেই

"সজনি সজনি রাধিকা লো, দেখ অবহুঁ চাহিয়া, কুঞ্জবনে যাওয়ে সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে"র উল্টো দিক আর কি।

কেষ্টনগরের বিজয় সেন ছাড়াও প্রিয়দর্শন সুকুমার ভাতুড়ি ছিল আমাদের দলে। বেচারা অল্প বয়সেই ক্ষয়রোগে মারা গেছে। মিষ্টি মিষ্টি ছোট গল্প লিখত। বড়ো প্রেমপ্রবণ ছিল তার মন, কিন্তু কথায় বার্তায় ব্যঙ্গকৌতুক ঠিক্‌রে পড়ত।

হেত্নয়ার ধার দিয়ে যেতে যেতে সে এক ছড়া বেঁধে ফেলল,

হেত্নয়ার ধারে সখি হৃদয় দিলাম
হতোঽস্মি বলে হা হা করেওছিলাম
কে আগে জান্‌ত বলো
জানালার অর্গল
বন্ধ সে করে দেবে শব্দে দড়াম ?
ফুটপাথে শুয়ে শুয়ে তারা গুন্‌লাম।

আমাদের দু একজন সত্যি সত্যি ফুটপাথে ধরাশয্যা নিলাম, কিন্তু দীনেশদার ভর্ৎসনায় উঠে আবার চলতে হলো। গোকুল বলল,

—তোরাই জোয়ার আনবি, বাঁধ ভাঙবি। ওদের বকছ কেন ডিয়ার ডি. আর.

—তাই বলে রাস্তায় সিন্‌ করতে করতে যেতে হবে নাকি।

বলে দীনেশদা হেসে ফেললেন।

ভারিক্কী চেহারার দীনেশদা তরল ও গরল একসঙ্গে হতে জানতেন। হাসলেন ও গম্ভীরও হলেন। আমি, অচে, ন্যাপা, সুকুমারতরিবৎ শিখলাম।

পৌঁছে গেলাম নাট্যমন্দিরে, হাতিবাগানে। আমরা সব বাইরে চৌকি, চেয়ার টুল দখল করে বসলাম। দীনেশদা সোজা শিশিরবাবুর গ্রীনরুমে ঢুকে গেলেন। নজরুল আগে থেকেই শিশিরবাবুর ঘরে ছিল। হেমেনদা মানে হেমেন রায়, মণি গাঙ্গুলি, মোহন শোভনের বাবা, অবনি ঠাকুরের জামাই, রমেন ইত্যাদি শিশিরবাবুর অন্তরঙ্গরা

সবুজ ঘরে দঙ্গল পাকাচ্ছিল। বেনারসের সুধাদা বাইরে ছিলেন, সাধারণত অত্যধিক মদ্যপানে মত্ত হয়ে থাকতেন, কিন্তু পড়াশুনার এলেম এত জোরদার ছিল যে ১৭/১৮/১৯/২০ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। সংস্কৃতেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, প্রায় ক্লাসিকগুলো মুখস্থ বলতেন।

সুধাদা আমাদের নিয়ে জমিয়ে বসলেন। ন্যাপার বাবরি, অচের হাঁপানি ইত্যাদি বিষয়ে চোখা মতামত ঝেড়ে বললেন,

—ইয়ং হোপফুলদের মধ্যে একজনকে মনমরা দেখছি যেন। কিরে পাঁঠা, তোর আবার হলো কি, What ails thee, O Absolom ?

নিজের কিছু নয় যতীন ভায়োলেটের ট্যাঙ্গ্‌ল্ মনে বাসা বেঁধেছিল। সুধাদাকে মোটামুটি গল্পটা শোনালাম। সুধাদা, কী সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর, শুনে গেলেন, তারপর আমার পিঠ থাবড়ে বললেন,

—তোর আর কি। তুই ত মরেইছিস, কথায়ই বুঝছি। কিন্তু যতীন-ভায়োলেট—

'For they
Seeking the perfect face beyond the world
Approach in vision earthly semblances,
And touch,
And at the shadows, flee away !'

সুধাদা বলেই চলেছেন,

—একটা গবেট তোর ঐ যতীন। আনতে প্যারিস না আমার কাছে, ঠুকে শিজিল করে দিতাম গোঁয়ারটাকে। কী ভুল করছে জানিস ? আজ যে রজনী যায়—তাকে কি আর ফেরাতে পারবে ঐ পাঁঠাটা, রবীন্দ্রনাথ বাদ দে। জর্মান কবি স্টুসো কি বলেছেন শোন—

'O, Fathomless sweetness of all true love
Thou meltest into the heart of thy beloved,
And nothing of thee
Remains outside,
But thou art joined and united
Most lovingly
With thy beloved.'

চণ্ডী শুন্‌বি? জার্মান কবি ত জার্মেনিতে লিখলেন। কিন্তু কয়েক হাজার বছর আগে মার্কণ্ড মুনি অম্ভৃণের মেয়ের মুখ দিয়ে কী কথা বার করিয়ে দিলেন,—

"পূর্ণতা লভো সর্বথা সঙ্গমে
ক্ষণ-ব্যবধান দ্বৈত প্রতীতি আনে
রতি শেষে বাঁধো পুন ভুজ বন্ধনে
আসঙ্গ আশ, সে কি সমাপ্তি মানে?
মধু সঙ্কেতে ডাকে হায় মায়াময়ী
বারে বারে করে মোহ দহে নিক্ষেপ।"

ওরে, দেবী সুক্ত ভালো করে পড়িস। তোর এলেম আছে, আর ওগুলা গাধা। তুই ত সংস্কৃত বাংলা ইংরেজি সমান দখলে রেখেছিস।

—কিন্তু সুধাদা, যত্‌নেটা ভাবছে নিজেকে অবলুপ্ত করে রাখাই পৌরুষ,—ঘরে আবার বিবেকানন্দ নিবেদিতার ছবি রাখে, মানে ল্যাঙট পরে, ব্রহ্মচর্য করে।

হোহো করে হেসে উঠলেন সুধাদা। বললেন,

—নেশা কাটিয়ে দিলি। গাধা, গাধা, গাধা। তোর যতীন না যত্‌নে, মানে তোর হিরো, একটা হিজড়ে। কিম্পুরুষ। যা, তার পিঠে লাঠ্যোষধি অথবা গো-বেড়েন দিয়ে বল,

Do what the manhood bids thee do
From none but self expect applause
He noblest lives and noblest dies
Who makes and keeps his selfmade laws—

লিখে নে, নইলে ভুলে যাবি। আর সময়ে দিবি ওই বাঁদরটাকে —ধুলোমাটির দুনিয়াই স্বর্গ, রক্তমাংসের মানুষেরাই দেবতা, প্রেম আর ভালোবাসাই দেবপূজা—

All other life is living death
A world where none but phantom dwell.
A breath, a wind a sound, a voice.
A tinkling of the camel bell.

সুধাদা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। যেন আত্মস্থ হয়ে অন্য জগতে চলে গেলেন।

ধ্যানস্থ ভাব কাটবার পর বললেন,

—বোস্ তোরা। দেখি, শিশির তৈরি হলো কিনা।

সুধাদা উঠে গ্রীনরুমে ঢুকে গেলেন।

সুধাদা'র মধুবর্ষণ যতীনের কানে ঢালব মেসে ফিরেই, এই পণ নিয়ে ফিরলাম। কিন্তু যতীনই বে-পাত্তা। ঘর বন্ধ। মেস্‌বাড়ি বলে ফেরবার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, কিন্তু তাই বলে এগোরাটা বেজে গেল যতীন ফিরল না। পাশাপাশি ঘর। কেবল খবরদারি করতে-করতে আমারো রাত বেড়ে চলল।

রাত্তিরে ফিরলই না যতীন। সকালেও দেখি ঘর বন্ধ। ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করতে বললেন,

—তিনি ত কাল রাত্তিরেই হাজারীবাগ চলে গেছেন।

মনটা খিতু হলো। বাবার মনে কষ্ট দিয়ে এসেছিল হয়ত সাফ্‌সুফ্ কথাবার্তা কয়ে মেটাতে গেছে। হয়ত আমার পরামর্শ নিয়ে ভায়োলেট-ঘটিত দিক্‌টা বাবার কাছে বলতে সাহস সঞ্চয়

করেছে। অনেক ধোঁয়া কেটে যাবে, পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ সামনে পথ খুলবে,—

ম্যানেজার বলে চলেছেন।

—তিনি ত দেনাপাওনা চুকিয়ে শেষবারের মতোই গেলেন মনে হলো। আপনার নামে একটা স্লিপ রেখে গেছেন।

ম্যানেজার অফিসঘর থেকে slipটা নিয়ে এলেন। তাতে শুধু লেখা—"আমাকে নিয়ে ঘোঁট পাকাস্ নে। সুধোকে বলিস কোথা গেছে, জানিনে। আর, আর,—না—দরকার নেই। যতীন।"

ভারী মুষড়ে গেলাম। এখন যদি ঐ স্বর্গের দেবী আসেন, তাঁকেও মিছে কথা বলতে হবে। কি ফ্যাসাদে ফেলে গেলো যত্নে —যার সঙ্গে আমার কোনো অন্তরঙ্গতা নেই। সে আমার সিনিয়র, বয়সে, গুণে, আমি খালি ঘরে আছি দেবী বরণে।

মাসখানেক পর একখানা চিঠি পাওয়া গেল, যতীনের বাবার কাছ থেকে। তাতে লেখা—

"পরম কল্যাণীয়েষু, মনীশ বাবাজীবন, খোঁজ লইয়া জানিলাম তুমি আমার পরম বন্ধু সুরেশের জ্যেষ্ঠপুত্র। সুরেশ ইংরাজিতে ও আমি দর্শনে সে বছর প্রথম হই। সুরেশ কি কারণে অধ্যাপনা ছাড়িয়া সরকারী চাকুরিতে যোগ দিল, ইহা অদ্যাবধি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সুরেশ বর্তমানে চট্টগ্রামের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, চাকুরিতে উন্নতি করিয়াছে, দেখিতেছি। আমি অধ্যাপক হিসাবে কলেজে ঢুকিয়া বর্তমানে হাজারীবাগের কলেজে প্রিন্সিপ্‌ল হইয়াছি।

যতীন আমার একমাত্র সন্তান। উহার আটবৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। গত সপ্তাহে মেসের ম্যানেজারের পত্রে জানিলাম যে সে মেসের পাট উঠাইয়া দিয়াছে। এখানে আইসে নাই কোন স্থানেও যায় নাই, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি। শুনিলাম, মেস ছাড়িবার পূর্বে তোমার নামে স্লিপ্

রাখিয়া গিয়াছে। অতএব তুমি যদি ওয়াকিবহাল হও, তবে তাহার বর্তমান আবাস ও গতিবিধি সম্বন্ধে আমাকে জানাইবে। তোমার পিতাঠাকুরকে আমার স্নেহালিঙ্গন জানাইবে, তুমি আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর রায়

প্রিন্সিপ্যাল, হাজারীবাগ কলেজ।

এই চিঠি পেয়ে আমার মাথা গুলিয়ে গেল। যতীনের কড়া চিঠি, তার বাবার সৌজন্যপত্র, সব তারই জবাব দিতে হবে, অথচ, কি জবাব দেব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ভায়োলেটদের বাড়ি যাব ? মেডোজ, বরানগর, গঙ্গার ধার। যদি সেখানে কিংবা কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকে হতভাগাটা, তাহলে অন্তত খোঁজে ত পাব।

রওনা দিলাম বরানগর। তখন বাস্ সার্ভিস্ ছিল না। হাঁটাপথে গেলাম, "মেডোজ" নামে বাগানবাড়ি খুঁজতে বেগ পেতে হলো না। বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছোট্ট বাড়ি, ফুলে ফলে জমি ভরা। পশ্চিমে বাড়ির গা বেয়ে গঙ্গা নদী।

ভায়োলেটের দর্শন মিলল না। আর এক দেবী মূর্তির সঙ্গে দেখা হলো, তিনি লনে বেড়াচ্ছিলেন। সময়টা সন্ধ্যা। আমাকে দেখেই বললেন,

—দিদির কাছে তোমার রূপবর্ণনা শুনেছি। তুমি মন্, জিৎএর বাড়িতে থাকো। কি বিশ্রী দেখতে তুমি। এসো, এসো,—বাবা নেই, মা আছেন। চলো তাঁর সাথে দেখা করবে চলো।

এই প্যান্‌জি! পৃথিবীতে সুন্দরী শুধু হবাই নয়, প্যান্‌ও। স্বর্গের সুষমা অকৃপণ হাতে দু'জনার শরীরেই বর্ষিত। চোখ ফেরানো যায় না, আমি ওঁর পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে বললাম,

—চলুন।

—মা, মাগো—শুন্‌ছো। এই ভদ্রলোক তোমার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

দুধে গরদ পরিহিতা লাবণ্যময়ী প্রৌঢ়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হেসে বললেন,

—এসো। কেউ ত আসে না। হুবাই সরোজিনী পিসির বাড়িতে মাসখানেক থাকতে গেছে। তাঁর স্বামী বুঝি চাট্‌গাঁ ডিভিশনের কমিশনার, বিপুল দেব। আই সি এস্‌। হয়ত চাট্‌গাঁয়েই যাবে মেয়েটা।

আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। উনি ড্রয়িংরুমে আমাকে নিয়ে বসালেন। বললেন,

—অন্য খোঁজখবর নেবার আগে বলে রাখি আমার মেয়ে দু'টিই বাউণ্ডুলে, তোমাকে খুব খেপিয়েছে বুঝি ?

—না না, খালি বিশ্রী দেখতে এই কথা বলেছেন। তা সত্যিই ত আমি অত্যন্ত ঢ্যাঙা ! ও বিশ্রী। উনি কিছু ভুল বলেন নি।

খিলখিল হাসির শব্দ। প্যান্‌জির গলা,

—মা গো মা। বিশ্রীকে বিশ্রী বললে সে চটে যায়। কিন্তু তার যে অন্য আকর্ষণ থাকতে পারে, সে কথা সে ভোলে কেন ? দিদি বলেছে, এই ছেলেটা নাকি গল্পটল্প লেখে, কাগজে বেরোয়, দেখতে বিশ্রী তাই শুধু বলেছি, কিন্তু নামও মন, মনও জয় করে নেবার কলকাটি ওর হাতে আছে।

আমি বিহ্বল চোখে হাত থেকে খোলা তরতাজা তলোয়ারের মতো রূপলাবণ্যের ঝিলিকএ চোখ ধাঁধিয়ে নিয়ে বললাম,

—ভায়োলেটদি জিজ্ঞেস করছিলেন কি করি, কোন কাগজে লিখি—

—ভায়োলেটদি আর ভায়োলেটদি ! সবারই মাথা গুলিয়ে খেয়েছে দিদি। এদ্দিন আসো নি কেন ? প্যান্‌জি কি ভেসে এসেছে ? তাকে দেখতে—

—প্যানি, তুই থাম্‌বি ? মনীশ, তোমার নাম ত মনীশ, তুমি রোজ এসো, রাতে খেয়ে মেসে ফিরো। আর ঐ দুর্মুখ মেয়েটার কথা—

—কালো কুচ্ছিত রোগা লম্বা একটা ছোঁড়াকে নিয়ে নিজের মেয়েকে বক্‌ছো মা, বকো। মন, আমার সাথে দেখা না করে—ও, মা ত আজ খেতেই বললেন। চলো, গঙ্গার ধারে ঘুরি গে।

পোষা কুকুরের মতো প্যান্‌জির পায়ে পায়ে চললাম। এরা এত সুন্দর হয় কোত্থেকে ? মা, মেয়ে—দু'মেয়েই। তবে এটি যেন বিদ্যুৎলাঞ্ছন। হঠাৎ কালো মেঘে খেলে যাওয়া। আমার বাক্‌রোধ হয়ে রইল, কিন্তু আর একজন কলনিনাদিনী। কথা বলেই চলেছে—

—তুমি নাকি পরীক্ষা দিচ্ছ এলাহাবাদে ? এসো না, আমাদের সাথে লণ্ডনে, সেখানে পরীক্ষা অনেক সহজ। দিদিকে দেখে মরেছ, শুনেছি, আমাকে দেখে ? তোমাকে খুব ভালো লেগে গেছে আমার। তুমি বলছি, তুই বলছি, অফেন্স নিচ্ছো নিশ্চয়। ইংরেজিতে ইউ বলেই সারা যায়, বাংলায় অনেক ঝামেলা। তাই বলে আপনি বলতে পারব না। জেনে রেখো।

—ভায়োলেটদি—

—আবার ভায়োলেটদি ? ভায়োলেটের চেয়ে প্যানজি কি খারাপ ? নাই বা থাকল গন্ধ—

—আমায় মাপ করুন। আজ আমি যাই।

—মা তোমায় খেয়ে যেতে বললেন না ?

—বললেন। শুনেছি। কিন্তু আমিও রক্তমাংসে গড়া মানুষ। আমার কিছুতেই থাকা হবে না, ভায়োলেটদিকে বলবেন আমি চলে গেছি।

—আমাকে ফেলে ? বেশ।

দৌড়ে কটক পার হয়ে এসে কলকাতার রাস্তা ধরলাম শরীরে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিল। প্যান্‌জি, প্যান্‌জি—

॥ বার ॥

আমি বিবাহিত, এবং পিতামাতার নির্বাচন মেনে নিয়ে। যদিও এই কন্যার প্রেমেই আকৈশোর হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। ওঁরা কেউই জানতেন না আমার মনের খবর। ওঁরা ভাবলেন যে ছেলেকে বিয়ে করতে বলা হলো আর B. A. পরীক্ষার ফল বেরোনোর আগেই ছেলে গিয়ে তাঁদের মনোনীতাকে বিয়ে করে এলো। ভাবুন। ভাবনার ওপর কার হাত আছে।

পরদিন ভোরবেলা চাটগাঁ মেল ধরব মনস্থ করে মেসে ফিরলাম। এ জীবনে অনেক প্রেম এসেছে, জুলওজিকাল বাগানে, চাটগাঁয়ের সহপাঠিনী রওশন আরা, খুব বাল্যকালের আয়েষা। এখন এই প্যানজি, এবং অবশ্যই আমার বিবাহিতা পত্নী।

মনকে নিয়ে অনেক গুনগুন করে কথাবার্তা কইলাম। ভোর নাগাদ যাবতীয় প্যাশন কেটে গেল। সকালে চাটগাঁ মেল ধরলাম। গোয়ালন্দ পৌঁছলাম এগারোটায়। "পাকা পায়খানা, খাবেন ভালো" জাতীয় একটা হোটেলে ইলিশ মাছের ঝোল ভাত খেয়ে "বাজার্ড" স্টীমারে গিয়ে উঠলাম—চাঁদপুর মেল।

স্টীমারে দেখা হয়ে গেল রুনুর সাথে। রুনু বিপুল দেব মশায়ের ছেলে। দেব আই. সি. এস্‌ তখন চাটগাঁ বিভাগের কমিশনার। আমার বাবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। রুনুরা সব প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, আমি ধরা বাঁধা ডেক্‌ প্যাসেঞ্জার, মানে থার্ডক্লাস। রুনু বলল,

—আয় না, চা খেয়ে যাবি।

—দূর্‌ দূর্‌—বেলা এগারোটায় চা কিরে। ইস্টিমারে উঠেছি যখন,

পাৎলা ঝোল মুর্গির কারি আর ভাত খেতেই হবে। বাট্‌লারকে অর্ডারটা দিয়ে রাখি—

—আমরো একটা, মানে ছু'জনার অর্ডার।

তাকিয়ে দেখি ভায়োলেটদি।

—কিরে, খুব হকচকিয়ে গেলি যে।

—ভায়োলেট্‌দি, আপনি—মানে কাল বরানগর গিয়েছিলাম। মার সাথে দেখা হলো। বাবা ছিলেন না।

—বুঝেছি, মন্‌ বুঝেছি। যার নামটি করছো না, হলো প্যান্‌জি। পট্‌কে গেছ, চেহারাতেই মালুম।

ভায়োলেটদি, আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী চাটগাঁয় আছেন, সেখানেই যাচ্ছি।

—অনেক মিছে কথা বলতে যাচ্ছো। চলো, দেখি প্লিবিয়ান হওয়া যায় কিনা, তোমার ডেকএ চলো। আচ্ছা, জিৎএর খবর কিছু রাখো মন্‌?

—না, ওযে কোথায় চলে গেল কাকুকে কিছু না বলে। ওর বাবা একখানা চিঠি লিখলেন আমায়।

জবাব দিই নি, তবে দিতেই হবে। বাবাব ক্লাসফ্রেণ্ড, নাম ধরে ডাকেন।

আচ্ছা, পাগ্‌লাটা গেলো কোথায়। তুমি ত অন্তত জানো?

—না ভায়োলেটদি। চলো তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে।

ছু'জনে স্টীমারের মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে চা'য়ের স্টল থাকে সেইখানে এলাম। রেলিং ঘেঁষে শতরঞ্জি বিছিয়ে জায়গায় ক্লেম্‌ দিয়ে রেখেছি। সেইখানে ছু'জনে বসলাম।

বললাম সব কথা খুলে। কেন পালিয়েছে তাও বললাম।

ভায়োলেটদির চোখ মুখে আগুন জ্বলে উঠল। শেষ পর্যন্ত ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

কিন্তু আশ্চর্য বিচিত্র ওই দেবী! হেসে ফেলল তথখুনি। বলল,

—কিরে, খুব অবাক হচ্ছিস্, না?

—তোমার বোনও কিন্তু তুই তোকারি করেছে আমার সাথে—

—তাই পালিয়ে যাচ্ছিস? আচ্ছা যা, তোর বউকে যদি চাটগাঁয় পাই, সব বলে দেব।

—ভায়োলেটদি।

—নারে, কিছু বলব না। সুখের ঘর গড়া শক্ত, ভাঙা খুব সহজ। ভাঙব না, ভাঙব না। আচ্ছা, তোর ইডিয়ট বন্ধুটা, মানে জিৎ, মানে যতীন, কার ছেলে বলত?

—প্রিন্সিপ্যাল বিশ্বেশ্বর রায় হাজারিবাগ কলেজ।

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ভায়োলেটদি অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

—মন্, রুনুদের বলে আয়, আমি তোর সাথে যাচ্ছি, তোদের বাড়িতে উঠব।

আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম। বললাম,

—বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশ্বেশ্বর রায় আর,

—শোন্, আমারও বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশ্বেশ্বর রায়। ধীরেন মিত্তিরের নাম শুনেছিস্? আমার বাবা, সানি মিত্তির। ওই পাঁঠাটার সাথে আমার বিয়ে দেবে পণ করে বসে আছেন দুই বাবা—

—ভায়োলেটদি আমি, আমি, যেখানে হোক্ যতীনকে খুঁজে বার করছি। তুমি হেঁটে গেলে নাকি পদ্মফুল ফোটে, আর সেই ধুলো বুকে মাথায় মেখে যতীন বিবাগী হয়ে গেছে—

—চুপ কর। ওর নাম করিসনে আমার কাছে। সাহস নেই মুখোমুখী কথা কইবার। Imbecile।

আমি আর কি বলব। ভায়োলেটদির দিকে তাকিয়ে রইলাম শুধু।

—কি রে, আবার আমার প্রেমে পড়ছিস্ বুঝি? প্যান্জিকে ত খুব এড়িয়ে এসেছিস্, চল্, একবার চাটগাঁয়—

—ভায়োলেটদি, আপনি কি যে সব যা তা বলেন—

—দ্যাখ, মনকে চোখ ঠারিস্ নে। আমি তোর সাথে মিশি কমরেডের মতো, আমি ল্যাসকি, বেট্রিচে-সিডনির ছাত্রী, রেখে ঢেকে কথা কইতে পারিনে, ওই রুনু-বেবি-বেটসির কম্পানি আমাকে জেরবার করে দিয়েছে। তবে যেহেতু বিপুল দেব বাবার বন্ধু। আর তাদের ওখানেই প্রোগ্রাম হলো যাবার, কিন্তু আমি যাচ্ছি নে, আমি তোর সাথে তোর বাড়ি যাচ্ছি। ইনোসেন্ট একটা মেয়েকে বখাতে।

—ভায়োলেটদি—

চুপ চুপ। চল্, কারি রাইসের অর্ডার দিয়ে আসি।

বাজার্ড তখন আরিচা ছেড়ে মাঝ-পদ্মায় ভেসেছে। দুপুর। হীরে মোতি জ্বল্‌জ্বল্ করছে ভাঙা ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায়। গাঙ্‌চিল আর গাঙ্‌শালিকেরা উড়ে উড়ে স্টিমারের কাছে এসে আবার সরে যাচ্ছে।

দোতলাতে বড় একটা জায়গা কাটামতো, নিচে প্রপেলার চলছে দেখা যায়। বিরাটকায় দু'টো ইস্পাতের ডাণ্ডা পালা করে জাহাজের চাকা চালাচ্ছে। অসম্ভব তাত, সেই অগ্নিকুণ্ডে খালাসীরা কাজ করছে।

তরতর করে নিচে নেমে গেলাম দু'জনে। কিচেনে গিয়ে অর্ডার দেওয়া হলো। ভায়োলেটদি বললেন।

—এইবার মায়া কাটিয়ে আসি চল্। রুনুর বড়দি বেট্‌সি হস্টেস্, তাঁকে ত বলতে হবে। আমার দলছাড়ার কথা।

—চলো।

বেট্‌সি (ভালো নাম কি, জানি নে) বললেন,

—ও ত এক কথাই হলো। কমিশনারের কুঠিতে না উঠে, তুমি ডি এম-এর কুঠিতে উঠবে তবে, তোমার বাবা যদি শোনেন—

আমার বাবা ও মনের বাবা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিরে, বাত্‌লা ঠিক্ ঠিক্ হচ্ছে কিনা বল্? আমার বাবা যদি শোনেন আমি সুরেশ

ঘটকের বাড়িতে উঠেছি, খুশীই বেশী হবেন মনে হয়। তা ছাড়া বড়দি, আমার বাবা আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো কাজে বাধা দেননি।

বেট্‌সি দিদি বেবি বলে মেয়েটার কানে কানে কী কথা বললেন। বেবির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটল। বুঝলাম, আমার কুলশীল নিয়ে কথা হচ্ছে কিছু। আমার বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থেকে প্রমোশন পেয়ে ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন, আর দেব সাহেবরা জাত আই. সি. এস্। কিন্তু ভায়োলেটদি যেন Oracle, মনের কথা বুঝে ভবিষ্যদ্বাণী করতে অদ্বিতীয়া।

—সাদামাঠা ঘরের ছেলেমেয়ে আমরা, মনের মা'র কাছে গিয়ে মায়ের আদর পাব, মনের বৌটাকে দেখব। বাবা তোমাদের সাহেব সমাজে দম বন্ধ হয়ে যাবে।

—তুই, তুই না আজন্ম বিলেতে ?

—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে ? আমার বাবা কলকাতায় কায়েত গোষ্ঠীর ছেলে, আমরাও যখন আসি তখন ঠাকুমা দিদিমার কাছেই আরাম পাই। লণ্ডনেও আমাদের বাড়িতে ইংরাজীয়ানা অচল। মা পছন্দ করেন না।

—আচ্ছা, আচ্ছা খুব খোঁটা দিয়ে কথা কইতে শিখেছিস্। চল্‌ত চাটগাঁ পর্যন্ত, তখন দেখা যাবে—

—আমি তোমাদের সাথে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছি না। মনের সাথে থার্ড ক্লাসে যাচ্ছি।

বলে ভায়োলেটদি ক্যাবিন থেকে দুটো সুট্‌কেস্ ধাঁই ধাঁই করে নিয়ে বেরোল। অবশ্য দুটোই আমি হাতে নিলাম।

রুনু সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলল,

—অ্যাবসার্ড মেয়ে! তাল বোঝা শক্ত। টুটুর সাথে বিয়ে হবে শুনেছিলাম, কিন্তু কে একটা গেঁয়ো চাষার দিকে নাকি ঝুঁকেছে,—

ভাগ্যিস্ কথাগুলো ভায়োলেটের কানে যায়নি। রুনুর চিপ্‌টেন

কেটে কথা বলা, প্রায় অস্ফুটের পর্যায়ে ফেলা চলে। শুনলে ভায়োলেট ছেড়ে ত কথা কইতই না, বিরাট একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করত।

ডেকে আমার জায়গায় যেতে যেতে ভায়োলেটদি বললেন,

—মন্, জিৎএর কথা কিছু বলো। এ ভুল বোঝাবুঝি কেন হলো বলতে পারো? দু'জনার বাবা পরস্পর কথা দিয়ে রেখেছেন—আচ্ছা বাবাগুলো কিন্তু! আমাদের কাছে নামধাম ঠিকানা কিছু ভাঙেননি। সবজানা হয়ে থাকলে এই বিপাকের সৃষ্টি হতো না।

—যতীন যদ্দূর জানি, গাঢাকা দিয়েছে। কবে যেন, কবে যেন—এম্ এর পরেই বিলেত যাবে। সাহস পায়নি কিছু বলতে, আর, আর—

আর কি? Do what thy manhood bids thee do. এই সহজ কথাটা যে বোঝে না তাকে কি আর বলা যায়। বল্ তো। মন্, মন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে রেসিপ্রসিটি না থাক্লে—

—বাবাদের অনুশাসন বাধা হয়েছিল—যে

—কথাবার্তায় সব বেরিয়ে পড়ত।

—তা হয়ত পড়ত, কিন্তু যতীন প্রথম থেকেই নিজেকে গিল্টি পার্টি মনে করে রেখেছে, অসম্ভবকে সম্ভব করবার দুরাশা একেবারেই বুকে পোষেনি।

—ফল? বেপাত্তা? বোকা গোঁয়ার ঐ যে রিণার মা বলেছিলেন "গেঁয়ো চাষা"। ঠিক তাই—

ভায়োলেট্দির চোখ ছলছল করতে লাগলো। নদীর বুকে শুশুকগুলো ম্যাগনাম সাইজের রাগবি বলের মতো ওঠা নামা করছিল।

প্রচণ্ড দুপুর। জাহাজ তারপাশা স্টেশনের দিকে ভিড়ছে। প্রপেলারের শব্দ জোরদার হচ্ছে। আমার শতরঞ্জির ওপর আরাম করে বসে ভায়োলেটদি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

ইস্টিমার ঘাটে ভেড়াবার আগেই স্টেশনের প্রস্তুতির শোরগোল শোনা যায়। স্টেশন মানে দুখানা বিরাট ফ্ল্যাট জাহাজ, নদীর ধার ঘেঁষে ডাঙা নয়। পাড় থেকে কাঠের পাটাতন বেশ চওড়া, দু'পাশে লোহার শিকল ঝুলছে। সে সোপান মোটামুটি হাত চারেক চওড়া হাত দশেক লম্বা। তার সঙ্গে লাগানো জোড়া ফ্ল্যাট অর্থাৎ এঞ্জিনহীন বিপর্যয় সাইজের দুখানা জাহাজ। ওই হল স্টেশন। ওর ভেতরেই স্টেশন মাস্টার থেকে মাল কুলি পর্যন্ত সবায়ের ডেরাডাণ্ডা, ছোটখাটো একটা নগর আর কি।

আমাদের বাজার্ড অভ্যস্ত কসরতে ফ্ল্যাটের সঙ্গে ভিড়ে গেল। তবুও মাঝখানে অনেকটা ফাঁক, সিঁড়ির কাঠ উঠিয়ে দিতে লাগল মাল্লারা ফ্ল্যাট থেকে জাহাজে, ভাঁজ করা রেলিং পড়ে গেল দু'পাশে, মোটা দড়াদড়ি দিয়ে ক্যাপস্টানের সঙ্গে বাঁধা হলো দু'মুড়ো, নারকেলের গালিচার রোল টেনে দেওয়া হলো সিঁড়ির ওপর দিয়ে ডাক জাহাজের সম্মানে। চারিদিকে মুখর হয়ে উঠল।

এতক্ষণ যা বলছি, সুশৃঙ্খলায় সেগুলো যে একটার পর একটা ঘটছে এমন নয়। হনুমান শোনা যায় একলাফে ভারত থেকে লঙ্কা লাফ দিয়ে পৌঁছেছিলেন। এখানেও ফারাক অতটা না থাকলেও কুলির দল সমান বিক্রমে ফ্ল্যাট থেকে ডাকজাহাজ আক্রমণ করল। পাতক্ষীরের ফেরিওয়ালারা প্রায় চল্‌তি স্টীমারের গায়ে ডিঙি ভিড়িয়ে তড়াক করে উঠে আসছে। কেউ পা পিছলে নদীতে পড়ে যাচ্ছে, কোনো তোয়াক্কা না করে ভাসমান সওদা এক হাত মাথার ওপর তুলে ধরে বাঁচিয়ে আর একহাতে খাড়া সাঁতারে জাহাজের মুড়ো ধরছে এসে।

এদিকে জাহাজেও লণ্ডভণ্ড শুরু হয়ে গেছে। তারপাশার আর এক নাম লৌহজঙ্গ, বিক্রমপুর পরগনার একটা বড়ো গঞ্জ জায়গা। বহু যাত্রী উঠবে নাম্‌বে, বহু মাল উঠবে নাম্‌বে। ডেকযাত্রীর দল ছড়ানো বিছানা গুটোচ্ছে, কুলির দল কাড়াকাড়ি করে মোট মাথায়

নিচ্ছে। দোতলা থেকে নিচে নামবার সিঁড়ি কয়টাতে অসম্ভব ভিড়—যদিও ফার্স্ট ক্লাস সেলুনের সিঁড়ি দিয়ে অনধিকারীর ওঠা নামা নিষেধ। কিন্তু কে কার কথা শোনে? হুড়তাড় করে লোকেরা নামছে, উঠছে। জাহাজের চাট্গেঁয়ে খালাসীরা সব কটা দাঁত বার করে হাসছে, আর মজা দেখছে।

বাপ ছেলেকে বলছে,

—হালা প্রাণধন, চ্যাহস্ না পোটমাণ্টু লইয়া হালা কুলির পুত ভাগতেয়াছে, খারাইয়া চ্যাহস্ কি, লগে যা, লগে যা—

'অল্প বয়সী বৌ মেয়েরা শাশুড়ী ননদের আঁচল আঁকড়ে ধরে টানতে টানতে প্রায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পুনরাভিনয় করছে আর অভিভাবিকা স্থানীয়ার কনুয়ের গুঁতোয় বৌঝিকে সামাল করছেন, বলছেন—

আলো শতকে খেয়ারিরা, হাটের মইধ্যে আমাগো ন্যাংট প্যাংটা কইরা মজা দেখতে চাইস্ বুঝিন, ঘরে চল একবার দেহি, উদ্লা কইরা বারণ দিয়া পাছার ছাল উঠাইয়া ছারুম—

মেয়ে বউগুলো যেন খুব মজার খেলা পেয়েছে, গালাগালি শুনেও হাসছে। কিন্তু আঁচল টানতে ছাড়ছে না।

পাতক্ষীরের পসারিরা দৌড়োদৌড়ি করছে আর চেঁচাচ্ছে,

—মাগ্নায় খিরা, খাইয়া দাম, চাইর পয়সা হালি, লন্ লন্ কর্তা, ফুরাইয়া গেলে আর পাইবেন না—

ভায়োলেট আমার হাত শক্ত করে মুঠোবন্দী করে ধরে বলল,—ও, হোয়াট এ ব্যাবেল।

—ঢাকাই, চাটগেঁয়ে, নওয়া খাইল্লা প্লাস হাফ্কলকাতাই সকলের বাক্ স্বাধীনতার সমন্বয়। তা ব্যাবেলই বলো, আর যাই বলো।

—আর দূর দূর। আমি নিন্দে করছি নাকি? জাস্ট ডেস্ক্রাইব করছি। কিন্তু, কি লাইভ্লি লোকগুলো, কলকাতার মতো স্নিবিশ

ক্রাউড্ নয়। এ দেশে দেখছি নদীও যেমন বিরাট, মাঠও যেমন খোলা, মানুষও তেমনি সতেজ। বাট্ হোয়াট ইজ্ কিরা—ওই লোকটা যা ভেড্ করছে?

—কিরা নয়, ক্ষীর, খিরা। কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ মিল্ক প্রোডাক্ট। খুব ভালো খেতে।

—লেট্ আস্ হ্যাভ্ সাম। কিন্তু এক্‌সপোজ্‌ড্ জিনিস—অসুখ করবে না ত?

একটুও না। আমরা বরাবর খাই।

কলাপাতার ফালির ওপর পরিপাটি করে বেলা ক্ষীরের লুচি, আর একখানা পাতা দিয়ে ঢাকা। কি তার সু-ঘ্রাণ, আর কি সুস্বাদু! ভায়োলেট চারখানা খেয়েও আরো চায়। আমি বলি,

—মরবে, পেট ফুলে ঢাক হবে। ভেরি রিচ্।

—বাট্ লাভ্‌লি, হাউ লাভ্‌লি—এর আর জোড়া নেই।

ক্ষীরওয়ালা আমাদের জগাখিচুড়ে ভাষার কথাবার্তা কিছু বোঝে না, কিন্তু এটুকু বোঝে যে একজন বোধ হয় আরো খেতে চায়, আর একজন বাধা দেয়।

—কন্ কি কর্তা? প্যাট্ ফুইলা ঢাক্ আইব আর খিরা খাইলে? দুফুর ব্যালায় দুই থাল পান্তা ভাত খাইয়া একখান্ খিরা খাইলে পন্দ্র মিনিটের মইধ্যে আবার খাই খাই কইরা ফাল্ পারবেন। লৌহ জঙ্গের খিরা আর বহরের ননী—ঔষধ কর্তা ঔষধ। খিদার আর ঘাওয়ের।

আমি বললাম—ঘাওয়ের কথা বাদ দে, বাদ দে, মাইয়া ডরাইব।

জিভ কেটে ক্ষীর অলা বলে,

—আর কমু না কর্তা, মাইয়ায় বুঝি ম্যাম্? ইংরাজি কয় ফট্ ফট্ কইরা—

—না না, ম্যাম্ হইব ক্যান্, আমাগো মতই বাঙালি, তবে বিলাত আছিল পোলাপান কাল থিকা।

—হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট ?

—কিছু না, কিছু না ক্ষীরওয়ালা বলছে ওর ক্ষীর নাকি স্পেসিফিক ফর্ ইন্‌ডিজেস্‌সান। গুরুভোজনের পর একখানা খেলেই বাস, বেমালুম সব হজম।

খিলখিল করে হেসে ওঠে ভায়োলেট।

—মাইয়ার দাতগুলিন মুক্তার মতন! লন্ লন্ ম্যাম দিদি, আর দুইখান লন্—

আরো দু'পাতা ক্ষীর গছিয়ে বিদেয় নিল লোকটা।

খুব সুইট্ টকার লোকটা, কিন্তু কি বলল কিছু বুঝলাম না। কই দাম দিলে না ওকে? কত হলো?

বলে সোনালি জলের কাজ করা মরোক্কো চামড়ার বটুয়া খুলতে যায় ভায়োলেট।

—আরে না না, চার আনাও পুরো হয়নি, ও দাম আমিই দেব। তবে গেল কোথা লোকটা? দাম না নিয়ে এক পা নড়ে না ওরা—ভারী আশ্চর্য ত!

বলে খুঁজতে চললাম। ভায়োলেটকে বললাম,

—এইখানেই রেলিংয়ের পাশে দাঁড়াও, আমি আসছি।

ভিড়ের দাপট কমে গেছে ততক্ষণ, যাত্রী ওঠা নামা শেষ। ফেরিওয়ালারা যে যার ডাঙায় ফিরছে। মাল নামছে, শেষ মোট্‌রে নামলেই গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক তুলে নেবে।

কিন্তু আমাদের ফেরিওয়ালা? ওপরে নিচে কোথাও তার টিকি দেখতে পেলাম না। সেলুনে সিঁড়ির কাছে ফেরসাহেবের ছেলের সঙ্গে দেখা, সে বলল,

—হ্বাই তোর সাথে গেল যে, কোথায় সে?

—গল্প করছিলো আমার সাথে। ওই ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

—তুই যাচ্ছিস্ কোথায়?

—আরে একবেটা পাতক্ষীরওয়ালা দাম না নিয়ে চলে গেছে, খুঁজছি তাকে।

স্টীমারের ওপর পাতক্ষীরওয়ালার কোনো সন্ধান পেলাম না। স্টীমারও ছাড়বার আগে দম নিয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। এঞ্জিনের গুরু গর্জন আর মাঝিমাল্লার কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে।

জাহাজ ছাড়বার আগে ফ্ল্যাট থেকে পাশাপাশি বেরোতে থাকে, তারপর ভরা গাঙে এসে সোজাসুজি চলে। জেটি থেকে হাত দশেক দূরে চলে এসেছে যখন, তখন ভায়োলেটের চীৎকার শুনলাম।

—এই ক্ষীরঅলা, তোমার দাম নিলে না ?

ছোট্ট এক মাল্লার ডিঙি একজোড়া ঢেউয়ে নাচছে। দাঁত বার করে একগাল হেসে ক্ষীরওলা বলল,

—দাম লাগব না। মুক্তাহাসি ম্যাম্ মায়েরে খাইতে দিলাম। আশীর্বাদ করবেন মা—

জাহাজ ততক্ষণ দাম ছুঁড়ে নৌকোয় ফেলে দেবার নাগালের বাইরে চলে এসেছে। দাঁত বার করে লোকটা হাসছে কি সরল সুন্দর সে হাসি। মনে ভারি দাগ কেটে রইল।

—দেখলে মন্, লোকটা দাম না নিয়ে খাইয়ে চলে গেল, ভারী মজার ফেরিঅলা ত, . অন্তত এক টাকা ত। লোকসান হলো নিশ্চয়ই—

—এক টাকা নয়, আনা চারেক—আর তাও ঐ গরীবদের কাছে অনেক। কিন্তু ওর মুখভার দেখেছিলে ? দাম দিলে ওই তৃপ্তির হাসিটুকু দেখতে পেতে না। ওরা ত কত লাভ করে—বিনি পয়সায় খাইয়ে অনেক বেশী লাভ করেছে, তাই ওই হাসি। ও কৃতার্থ মনে করেছে নিজেকে—

ভায়োলেট বোকা হাসি হেসে বলল,

—বিনি পয়সায় খাইয়ে লাভ ? সে কি করে হয় ?

—ওই জানে—

বলে আমি হাসলাম। ভায়োলেট, মুখরা ভায়োলেট যেন লজ্জাই পেল, আর গুনগুন করে বলতে লাগল,

—মা বলে ডাকল আমাকে, বলল মুক্তোহাসি মেমসাহেব মা—

জাহাজ তখন জোর ছুটেছে।

রাজাবাড়ি স্টেশনের কাছ বরাবর নদীপথ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাঁয়ে কমলাঘাট পেরিয়ে শীতলাক্ষার বুকে নারায়ণগঞ্জ, যেখান থেকে ঢাকা যেতে হয়। আর ডাইনে পদ্মা গিয়ে মেঘনায় পড়বে, গভীর অতল কালো মেঘনা, যার ওপর চাঁদপুর। আমরা সেই দিকে চলেছি।

দক্ষিণ-পূর্ব থেকে সাদা ফোঁটার মতো যে জলযান আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, কাছাকাছি এসে গেলে দেখলাম সেটা একটা সরকারী মোটরলঞ্চ, ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে, নাম পড়া গেল—"ডরোথি"।

জাহাজী কেতায় কি সব ইশারা ইঙ্গিত হলো লঞ্চের মাল্লাদের সঙ্গে আমাদের বড়ো জাহাজের সারেং মাল্লার আমাদের মেল স্টীমারের গতিবেগ মন্থর হয়ে এল।

লঞ্চ এসে জাহাজ ভিড়লো, মাঝ গাঙেই। পুলিশের পোশাক পরা এক ভদ্রলোক তড়াক্ করে লাফিয়ে বাজার্ডে উঠলেন। সঙ্গে এলেন হাফপ্যাণ্ট পরা অল্পবয়সী আর একজন। মুখের পাইপ দেখে হাকিম জাতীয় বলে মনে হলো।

তাঁরা সোজা ফার্স্ট ক্লাস সেলুনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেব সাহেবের পরিবারবর্গকে খুঁজে বার করলেন। বড়ো জামাই সাহেব, বড়ো মেয়ে, দেব জুনিয়র—এদের সঙ্গে কি বাচন-কথন হলো, শুনতে পেলাম না, কিন্তু প্রত্যেকের মুখভাব দেখে উত্তেজনা ও ভয়বিহ্বলতার আমেজ পাওয়া গেল।

আমার সঙ্গে ভায়োলেট, হঠাৎ এতই আপনার করে নিয়েছে আমাকে, ছ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা আমি যেন কেঁচো হয়ে ওর সাথে ঘুরছি।

—চল্ মন্, কিছু একটা বড়ো ব্যাপার—শুনে আসি চল্।

রুনু দেব বলল,—

—জানিস্ মনীশ, জানো হুবাই, সর্বনাশ হয়েছে। চাঁদপুর স্টেশনে রেলোয়ের কুলিরা ধর্মঘট করেছে আজ কদিন ধরে, গড নোজ্ কি কারণে, সেই গ্যাণ্ডির বাতাস আর কি! সোজা কথা আজ সকালে গুলি চলেছে। অনেক উণ্ডেড, অনেক ক্যাজুয়ালিস্ট। জাহাজ ঘাটে নয় আঘাটায় ভেড়াতে হবে। বাবা লঞ্চ পাঠিয়েছেন আমাদের নিয়ে যেতে জাহাজ থেকে নামিয়ে—সেফ্‌টি জোনে যাতে পৌঁছতে পারি নজর এড়িয়ে। ওঁরা অনেকেই লোকেশনে আছেন।—

আমি কথা বলবার আগে ভায়োলেট বার্স্ট করে উঠলো।

কুলির ধর্মঘট? ওয়েজস্, হিউম্যান বিহেভিয়র, এই রকম কিছুর দাবীতে নিশ্চয়। গুলি চল্‌ল কেন, বলতে পারো?

সোশ্যায়িলিজ্‌মের তৈরী ছাত্রীর মতো প্রশ্ন। সোজা, তরোয়ালের মতো।

আমি বললাম,

—ভায়োলেটদি, থামো। আগে জেনে নেই, কি ব্যাপার—

পাইপ-দাঁতে ছোকরা সাহেব, ব্র্যাকেটে বাঙালি, বলল,

—হ্যাঁ, গোড়ায় লেবার ওয়েলফেয়ার স্টাইক্‌ই ছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে জে. এম. সেনগুপ্ত, বসন্ত মজুমদার, লেডী মায়া রায়—কে কে সব লীডর এসে জিনিসটাকে টেরিবল অ্যান্টিগভার্নমেণ্ট টার্ন দিয়েছেন। লেডী রায় ত কলকাতা থেকে একরাশ ভলান্টিয়ার পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। She is a stormy petrel. স্বামী ইংরেজ সরকারের চাঁই, উনি ইংরেজ সরকার ওঠাতে অ্যাডামাণ্ট।

মনে পড়ল গোকুলদার মায়াদির কথা। কানে কানে বললাম ভায়োলেটদিকে। ভায়োলেট বলল—কী সে দৃপ্ত মুখভঙ্গিমা—আজ সত্তর বছরের বুড়ো আমি সেদিনকার কুড়ি বাইশের ছেলের মতোই অভিভূত হয়ে লিখছি—

—হোয়াই নট্, হোয়াই নট্, হোয়াই নট্? তিনি ত আর ফরেন রুলারের আণ্ডারে দাসখৎ লেখেন নি! সী ইজ্ হোয়াট এনি হেলদি থিঙ্কার ফর দি ইম্যান্সিপেসন অফ্ ইণ্ডিয়া শুড্ বি।

দিশী সাহেব কালো মুখে বললেন,

—তা তা—বলতে পারেন, মানে সাব্ভারসিভ্ কিছু মুভ্মেণ্ট লীড্ করলে স্বামীর দৌলতে তিনিও ছাড়া পাবেন। হয়েছেও তাই। দিন দুয়েক কুলিরা কাজ বন্ধ করেছিল, তারপর অথরিটিরা অর্ডার দেন ওদের কাজে যোগ দেবার জন্য। ওরা দিন আনে, দিন খায়। কাজ বন্ধের সময় ওদের খাবার-দাবার ব্যবস্থার জন্যে কংগ্রেস থেকে ভলান্টিয়াররা এসে দঙ্গল পাকিয়েছে। তাদের লীডার লেডি রায়। আর তিনি এসেই সমস্ত জিনিসটাকে অ্যান্টিগভর্নমেণ্ট মুভ্মেণ্টে টার্ন দিয়ে দিয়েছেন।

ভায়োলেট ছাড়বার পাত্রী নন্। জিজ্ঞেস করলো—গুলি চল্ল কেন? ক্যাজুয়াল্টি কি?

—তা দু একটি ভলান্টিয়ার আর জন দশেক কুলি মারা গেছে—উণ্ডেড্ও জন কত। এখন অবশ্য পিস্ফুল। আর্মড্ পুলিশের হাতে এখন কণ্ট্রোল। কুমিল্লার এস্ পি, কলেক্টর, চাটগাঁর ডিভিশনাল কমিশনার দেব সাহেব, কলকাতা থেকে আই. জি., চীফ্সেক্রেটারী। সব হাজির।

—বাব্বা! স্টীমার ঘাটের কুলির স্ট্রাইক, তাতেই ইংরেজরাজ ভয়ে কাঁপছেন!

—আজ সি আর দাশ আসবার কথা। বোধ হয় সাথে সাথে সরলাদেবীও আসবেন। ওঁরা আসছেন ময়মনসিং হয়ে। দেব—গেট্রেডি—আপনারা সবাই লঞ্চে আমাদের সাথে চলে আসুন।

কমিশনারের গুষ্টি তল্পীতল্পা গুটিয়ে নিল। ভায়োলেট ওদেরি গেস্ট—সেও যাবে। আমি আলগোছে সরে পড়ছি। জুনিয়ার দেব আমাকে ডেকে বলল,

—পালাচ্ছিস্ কোথা ? তুইও চল আমাদের সাথে।

—না।

—ব্রাভো মন্, ব্রাভো। স্টীমারশুদ্ধ লোক, তারা যাবে কোথায়—নিজেরা যে বড্ড সরে পড়ছ ?

—তারা জেটিতেই নামবে। ব্যবস্থা আছে। পুলিশের তদারকে চৌকিদার দফাদারেরা কাজ করছে কুলির। ওদের কোনো অসুবিধা হবে না। তবে, হোটেল, চায়ের দোকান, সব বন্ধ। সেই কালীতলা বাজারে গেলে খেতে-টেতে পাবে।

—মন্, আমরা ওদেরি সাথে থেকে যাই। যাও ভাই তোমরা বাপের সুপুত্তুর মায়ের আঁচলে ফিরে। ভেরি মেনি থ্যাঙ্কস্।

—সে হতেই পারে না। বাবা তাহলে আস্ত রাখবেন না আমাদের। তোমার একটা কিছু হলে হ্বাই, আমরা মুখ দেখাব কি করে ?

—যেমন করে এখন দেখাচ্ছ। আমার মুভ্‌মেণ্ট, আমার ব্যাপার। সেখানে মাথা গলাতে যেও না।

পাইপমুখো কিমসাহেবটি নিপুণ হয়ে ভায়োলেটকে দেখছিল। ওদের সবায়ের ফিস্‌ফাস্ কি কথাবার্তা হলো, তারপর বলে উঠ্‌ল—

—গুড্ গ্রেসাস্! আপনি মিস্ ভায়োলেট মিটার ? লণ্ডনের ডেপুটি হাই কমিশনার সানি মিটারের মেয়ে ? তাঁর কাছে আমি চিরকাল ঋণী থাকব—সার্বিস্ পরীক্ষার সময় কতো হেল্‌প্ করেছেন আমাকে! আপনাকে যেতেই হবে আমাদের সাথে, একটা কিছু আন্‌টুওয়ার্ড ঘটে গেলে ভারী গিল্‌টি ফীল করব—

—ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দি হ্বাই। ও হলো ডাটা, আই সি এস, চাঁদপুরের এস্ ডি ও।

—খুশী হলাম চিনে। বেঁচে বর্তে থাকলে আপনার পাইপ ঠুঁটো মুখের সাথে আবার দেখা হবে। মন্, চল্, আমরা ডেকে

যাই। আমি আমার ভ্যালিস্ ব্যাগ আগেই নিয়ে গিয়েছি থার্ড ক্লাসে।

ডাটা হতাশ হয়ে চেয়ে রইলো। দেব পরিবার এ দুর্দান্ত মেয়ের সাথে নতুন তক্‌রার না পাকিয়ে সুড়্‌সুড় করে গিয়ে ডরোথিতে উঠল।

—ছি ছি হুবাই—মানে ভায়োলেটদি—এটা কি করলে তুমি? ওদের গেস্ট, ওদের সাথে না গিয়ে—

—কাওয়ার্ড মন্, একটা মেয়ের ভার নিতে ভয় হচ্ছে? যা তুই তোর মতো যা, আমি অন্ মাই য়োন যাব।

—ভায়োলেটদি।

হাত নয়, পা ধরে বললাম চিরজীবনের ভার হয়ে থাকো তুমি, তোমার মন্ তোমার গায়ে আঁচও লাগতে দেবে না—

—সে কি রে? প্রেম নিবেদন করছিস্ নাকি?

—সে কপাল আমার হবার উপায় নেই। দেবীপূজা করছি।

—বাঁদ্রামো করিস্ নে—ওঠ্। কি ব্যাপার বলত?

—প্যান্‌জি, মানে

—মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে?

—ভায়োলেটদি আমি বিবাহিত।

—তোর বৌকে দেখব বলেই তোর সাথ ধরেছিরে হতভাগা। যে আগুনে যে কোনো পোকা পুড়ে মরে, সে আগুন ভায়োলেটে প্যানজিতে তোর সামনে দাউদাউ করে জ্বলছে—তুই কীসের আড়ালে থেকে বেঁচে যাচ্ছিস দেখবো না দুষ্টু ছেলে?

বলেই আমার চুলের গোছা ধরে নেড়ে দিল ভায়োলেট।

—চল, বসি গে চল। এখনো তো চাঁদপুর দূর আছে। কেমন যেন মন উতলা উদাস হয়ে আসছে। চল্ চল্।

ডেকে শতরঞ্চির ওপর বসে পড়ে ভায়োলেট ভ্যালিস্ খুলে একখানা বই বার করল। নাম দেখলাম উইলফ্রেড্ ওয়েনের

কবিতা। এ নাম অজানা নয়, কিছু কবিতাও অ-পড়া নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক কবি যুদ্ধবিরতির আগেই মৃত।

ভায়োলেট নিবিষ্ট মনে পড়তে লাগল। আমার মন ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খেতে লাগল। মেঘনার কালো জলে সাদা ফেনার ফুল ফুটিয়ে বাজার্ড তীব্র বেগে চাঁদপুরমুখো ছুটতে লাগলো।

ভায়োলেট বইয়ে মনোনিবেশ করেছে। চেনাজানারা ডরোথিতে উঠে আগেভাগেই পাড়ি দিলেন। কেমন নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল।

নিজে থেকেই কথা পাড়লাম।—

—ভায়োলেটদি, ওদের ছাড়লে, আমার ত তেমন আপনার ডেরাডাণ্ডা কিছু নেই চাঁদপুরে। শুন্‌ছো অবস্থা অশান্ত, এক্ষেত্রে থাকবার, খাবার ব্যবস্থা।

—তুই কি করবি ঠিক করেছিস্‌?

—যে কোনো পাইস হোটেলে খেয়ে নেব। না খেলেও যায় আসে না। সে অভ্যেস আছে। কিন্তু তুমি, অগাষ্ট গেস্ট, তার ওপর, তার ওপর—

—তার ওপর আবার কি?

—না মানে আমাদের মতো দুঃখ কষ্টে ত আর অভ্যস্ত নও, এই আর কি!

—ওঃ,

বলে সে ওয়েনে মনোনিবেশ কবল।

আমি সাত পাঁচ ভেবেই চলেছি। কালো মেঘনা উত্তাল ঢেউ তুলে আতঙ্কের মতো এগিয়ে আসছে, মুহূর্তের মধ্যে স্টীমারের গলুইয়ে চিড় খেয়ে সফেন কলহাসিতে দ্বিস্রোতা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিপদও অলীক, সমাধানও স্বতঃসিদ্ধ, তবু ক্রমান্বয়ে উত্তেজনা ও উপশম ভোগ করতে ভালো লাগছে।

পেছন থেকে দু'খানি হাত কখন জড়িয়ে ধরেছে। যেন বার্মার

বাচ্চা সাদা হাতীর দু'টো শুঁড়—কোমল ও পেশল বেষ্টন। বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে যায় সর্বাঙ্গে।

—ওরে দুঃখে কষ্টে মানুষ সাদাসিধে বাঙালী ঘরের ছেলে—মন ব্যাজার করা ত তোর সাধারণ নয়—

—করছো কি, করছো কি—ছাড়ো, ছাড়ো চারদিক ভরা লোক, কী ভাবছে সব—

—ছাই ভাবছে। দিদি ছোট ভায়ের গোসা ভাঙাচ্ছে এতে সাত সতেরো ভাবার কি আছে শুনি? আর দিদি ত বলেছিস্‌ই আমাকে, আমিও নাম ধরেই তোকে ডেকেছি। পুরো নামে ডাকা আসে না আমার, ছোট করে নিই নামটাকে তাই তোকে মন্‌ বলি—

—আর যতীনকে জিৎ?

ভায়োলেটের গাল কপালে রং ধরল যেন। একটু চুপচাপ থেকে বলল,

—ওর সম্বন্ধে যা যা জানিস, বল ত আমাকে।

সেই পড়ন্ত বেলায় মেঘনার বুকে জাহাজের থরথর কাঁপনের মধ্যে অনেক কথা বলে গেলাম। ভায়োলেট স্থির হয়ে বসে শুনল। তারপর বলল,

—ওর বাবার, মানে প্রফেসর রায়ের সেই বন্ধুর নাম জানিস? ছুটিতে যিনি এদেশে এসেছেন? তাঁর মেয়ের নাম জানিস?

—না ত। জানো, যতীনের মা ছোটবেলা থেকেই নেই। ওর বাবাই ওর মা বলো গুরু বলো সব। তিনি যখন বললেন, যে কোন এক বন্ধুর মেয়ের সাথে যতীনের বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠাতে চান, তখন সে ঝাড়া বলে দিয়েছে যে সে পারবে না। তার অপরাধবোধ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল, যে সে একরাত্রে আমার কাছে অনেক কথা বলে অজান্তে মেসের পাট উঠিয়ে চলে গেল। তার বাবা ম্যানেজারকে লিখলেন, আমাকে লিখলেন, কিন্তু বেপাত্তা মানুষকে কোথায় খুঁজে পাব বল? বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার

মতো, তোমাকে পাবার আশা তার দুরাশা। এটা ঠিক তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে গেঁথে গেছে।

—তাই একবার মুখ ফোটাতে পারল না? গা ঢাকা দিল?

—তাই দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত।

—প্রফেসর রয়—প্রফেসর রয়—ঠিক ধরে উঠতে পারছি না। মা বাবাতে কথাবার্তায় আমিও বাগ্‌দানের কথা শুনেছি। মা পেড়াপিড়ি করছিলেন টুটুর সাথে এনগেজমেণ্ট কাগজে বার করে দিতে। বাবা অল্পবয়সীদের বিয়েতে বিশ্বেস করেন না। তিনি বলছিলেন, তাড়া কি! আমরা ত লম্বা ছুটিতে এসেছি। টুটুর সাথে বিয়েতে আমার একেবারেই মত নেই, ভায়োলেটেরও নেই, সে ত জানোই। বিশুকে কথা দেওয়া আছে, তার ছেলেটিকে দেখি—এইবারেই লিখব চিঠি,—

—বিশু? বিশু?

আমার বাক্‌রোধ হয়ে আসে। ভায়োলেট বলেই চলে,

—বাবার সেই বাল্যবন্ধু বিশুর নাকি একটা চৌকস ছেলে আছে। পড়াশুনায় খুব ভালো। দুই বাবাতে আমাদের ফেট্‌ সীল করে বসে আছেন। জানিনে সে আবার কী চীজ্‌! আর টুটুকে ত আদৌ আমি টলারেট করতে পারি না, কাজেই তার সাথে কোনো কথা আর প্রসীড্‌ করতে পারেই না। যাক্‌গে, বাবাদের কথার সম্মান অবশ্যই রাখব আমি, তবুও খোঁজখবর পেলে তাকে, মানে সেই চৌকস্‌টিকে একবার দেখতাম। কিন্তু কী জানো মন্‌—আমার মন বাঁধা অল্‌রেডি পড়ে গেছে এক জায়গায়। বাবারা কথাই যদি দেন, তবে চাইল্‌ড্‌ ম্যারেজ করিয়ে দেন না কেন?

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল উত্তেজনায়। বললাম—ভায়োলেটদি, তোমার বাবার বাল্যবন্ধু বিশু থাকেন কোথায় জানো?

—রাঁচি না হাজারিবাগ—এমনি কোথাও।

—ভায়োলেটদি—

—ওকিরে, অমন পাগলের মতো চেহারা করে ফেল্‌লি কেন ? হলো কি তোর ?

—ভায়োলেটদি—যতীনের বাবাই তোমার বাবার বিশু। প্রফেসর বিশ্বেশ্বর রায়, এখন হাজারিবাগ কলেজে প্রিন্সিপাল আর যতীনই তোমার চৌকস্ চীজ। দাঁড়াও—দেখি—

বলে সুট্‌কেস্ খুলে প্রফেসর রয়ের চিঠি, যতীনের চিঠি বার করলাম। হাতের লেখায় বাংলা হয়ত পড়তে পারবে না তাই পড়ে শোনালাম চিঠিগুলো।

আমিই যেন অপরাধী, এই বোধে নিজেকে অসহায় ঠেকছিল।

ভায়োলেটের প্রকাশ্যত কোনো চাঞ্চল্য নেই। এক এক বার সুন্দর মুখখানা আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠেছে, এই মাত্র। বেশ শান্ত ধীর গলায় বলল,

—তার পর ? তোর হতাশ প্রেমিক বন্ধুটি গা ঢাকা দিলেন কোথায় ? নিরেট গাধা বুঝলি ? সে তাই—

নিজের কথার পিঠে কথা বলতে ভায়োলেট উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল,

—কে তাকে বাবার অবাধ্য হতে বলেছে ? কে তাকে গুরুজনের নির্দেশ অমান্য করতে বলেছে ? কেন সে জেনে নিল না তার বাবার বিলেতি বন্ধুর নাম ধাম ? কেন সে, কেন সে—

কথা বন্ধ হয়ে গেলো আবেগে।

—পেতাম একবার কাছে, চুল ধরে ঝাকিয়ে মগজে বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতাম। গাইয়ে, স্পোর্টস্‌ম্যান্, পড়াশোনায় ফার্স্ট, thousand thunders !

এ মেয়ে যে প্রায় কেঁদে ফেলে দেখি ! না না, আমারই বোঝবার ভুল।

—এখন কোথায় খুঁজব—মানে তোরা খুঁজবি তাকে ? কাগজে পার্সোনাল কোলামে ইন্‌সার্শন দিলে হয় না ?

হায় ভায়োলেটদি ! এদেশে হতাশ প্রেমিকেরা 'হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' পড়ে না। কিছু বললাম না।

—আমি একটু চোখে মুখে জল ঢেলে আসি। টিকেট ত ফার্স্ট ক্লাসের আছেই—

আমি Wilfred Owen এর কবিতা ওল্‌টাতে লাগলাম। ভায়োলেট যে পাতায় চিহ্ন রেখে গেছল, সেই পাতার কবিতাটার শেষের ক'লাইন অনেকবার পড়লাম।

'I would have poured my spirit without sting.

But not through wounds ; not on the Cess of War.

Foreheads of men have bled where no wounds were.

I am the enemy you killed, my friend.

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওয়েনের কবি মনের উপলব্ধি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল কিছুক্ষণ।

সন্ধে ঘনাচ্ছে—চাঁদপুর আসতে দেরি নেই আর। উঠে পায়চারি করতে লাগলাম।

সেখানকার পরিস্থিতি যতদূর সম্ভব ঘোরালো, হয়ত বিপজ্জনকও। ডরোথির আগমন ও প্রস্থানেই সেটা মালুম।

হয়ত নামতেই দেবে না, নয়ত ট্রেন ছাড়বে না, না হয় আর কোনো অঘটন ঘটবে। তার ওপর সাথে ভায়োলেট। যাচ্ছিল ব্রিটিশ সরকারের উচ্চতম স্থানীয় আমলার অতিথি হয়ে, ঝট্‌কে পড়েছে খেয়ালের ঝোঁকে। এখন ত মন চঞ্চল হয়ে উঠল তার, কি সে করবে, আমি কি করব—কিছুই বুঝে উঠছিলাম না।

এই সব অনিশ্চয়ে মন দুলছে, ভায়োলেট ফিরে এল। হাত মুখ ধুয়ে ছিমছাম হয়ে এসেছে। আগেই জানতাম, ওকে সামলানোর ভার আমার ওপর পড়বে না, ও-ই দরকার হলে নিজেকে, সাথে আমাকে সামলাবে। এসেই বলল,

—আমরা বোধ হয় পৌঁছব এইবারে—দূরে অনেক আলো চিক্‌-চিক্‌ করছে, ওইটে নিশ্চয় চাঁদপুর। সেলুনের খাসনামা আমায় বলল, যে চাঁদপুর ভিড়বার আগেই আমাদের খাইয়ে দিতে পারবে। চল, খেয়ে নিগে—

খেতে খেতে বলল,

—কলকাতার দিকে জাহাজ আবার ফিরবে কাল সকালে শুনলাম। এই জাহাজখানাই। রাত্তিরে যদি থাকতে দেয় কেবিনে, খুব সুবিধে হয়।

—কিন্তু আমাকে যে চাটৃগাঁ যেতেই হবে। না হলে বাবা ভীষণ দুর্ভাবনায় পড়বেন।

—সে ত সত্যি। কিন্তু আমি আবার দেবসাহেবের দলে পড়ে গেলে বিপদে পড়ব। তখন কর্তার ইচ্ছে ছাড়া কিছু করা চলবে না, ফ্রী মুভমেণ্টও হয় ত হবে না। অফিসিয়ালি আমি ওদেরি গেস্ট—

কথার জবাব দিলাম না। মনে মনে বললাম, তোমাকে চালায় মা ঠাকরুণ, এমন গার্জেন ত এখনও চোখে পড়ল না। মুখে বললাম,

—তা তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমার সাথে চাটগাঁ যেতে পারো ভায়োলেটদি। মাকে বললেই কালই ফেরার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাবা সব ঠিকঠাক করে দেবেন সময়মতো। তবে ট্রাব্‌লড টাইম্‌স, যদি কম্যুনিকেসান ডিস্টার্বড না হয়, তবেই—

—সে রিস্‌ক ত এসব সময় থাকবেই।

সাময়িক সেই ব্যবস্থাই রইল। জাহাজ তখন ভিড়েছে। অত বড় স্টেশন, অন্যদিন হলে কোলাহলমুখর হয়ে উঠতো। কিন্তু সেদিন সন্ধেয় অল্পকটা কেরোসিন আলোয় ভুতুড়ে লাগছে। দু'খানা মেলট্রেনের প্যাসেঞ্জার নামে, সুরমা মেল, চাটগাঁ মেল। লোক অগুন্‌তি আছেই, সবাই যেন ছায়ার মত চলাফেরা করছে। কেউই আগে জানত্‌'না জায়গাটা নামার অযোগ্য হয়ে গেছে রাতারাতি।

কাজেই প্যাসেঞ্জার যেমন নামে তেমনি নামতে লাগল কিন্তু কুলির দেখা নেই। পাড়াগেঁয়ে কোমরবন্ধওয়ালা চৌকিদাররা টহলদারি করছে। মাল ওঠাচ্ছে, নামাচ্ছে, যাত্রীদের তদ্বির করছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ফৌজি সান্ত্রীরা টহল দিচ্ছে। একে ঠিক অব্যবস্থা বলা চলে না, বরং সুব্যবস্থাই। তবে শান্তিটা কবরের শান্তি। জনতা নির্বাক, দু'একটি ছোট ছেলের কান্নার আওয়াজ পাচ্ছি।

ভায়োলেট আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, তুই প্যানকে দেখে এসেছিস্?

—প্যান্? কে প্যান্?

--আহা, আমি যেন জানিনে। প্যান্‌জি আমার ছোটবোন। তোকে দেখে পাগলি হয়ে আছে।

—ভায়োলেটদি আমি বিবাহিত।

হোহো করে হেসে ওঠে ভায়োলেট মিত্তির।

—প্যান্‌জি মাকে বলেছে সেও বিবাহিতা। মানে বুঝিস্ ওরে পাঁঠা—মানে বুঝিস্?

এ রাক্ষসীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে একে ছাড়তে হয়। কিন্তু এ-ও এখন আমার সর্বস্বা—একে নিয়ে কি করি। বললাম,

—চলো, বাড়ির গাড়ি অর্থাৎ চাটগাঁ মেলে গিয়ে জায়গা নি। তারপর সব বলব।

—তুই প্যান্‌জিকে দেখিস্ নি?

—দেখেছি, পটকে গেছি ভালোবেসেছি, আরো কত কি করেছি —ফিরিস্তি দেব না। তবে এটা জেনো জীবনে অন্য কোন মেয়ে আসবে না কারণ আমার বৌ আছে।

—আরে সেতো আছেই। প্যান্‌জি যেদিন প্রথমে তোকে দেখে সেদিন থেকেই কান্না আরম্ভ করেছিল। মা, তাই, শক্ত মেয়েমানুষ, অনেক যাচাই করেছেন। তোর সাথে প্যান্‌জির—

—ভায়োলেটদি আমি বিবাহিত।

—রেখে দে তোর বিয়ে। সব খবর রাখিরে, সব খবর রাখি। কি করে ওর হাত ছাড়ালি বল্‌ত ?

—সত্যি বল্‌ব ভায়োলেটদি ? আমি পালিয়ে যাচ্ছিলাম—পেছন থেকে এসে—

—তারপর ?

—তারপর কিছু বল্‌তে পারব না। তবে—

আমি তখনো অনভিজ্ঞ ছিলাম। দু ঘণ্টা ধরে কথা কয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হলো। স্টেশনে নামলাম। পা যেন মাটিতে পড়ছিল না।

চাটগাঁ মেল ট্রেন শুনলাম ঠিক সময়েই ছাড়বে। কিন্তু মিলিটারি দিয়ে। এঞ্জিনচালক, চেকার, গার্ড, সব ফৌজি।

—ওরে গাধা একবার খোঁজ নে। স্ট্রাইকার যারা উণ্ডেড হয়েছে, তাদের কোথায় রেখেছে।

সাম্‌নে ফ্রাম্‌জির রেস্টুরেণ্ট। দু'টি লোক বেরিয়ে এল। সেই ডাটা চাঁদপুরের এস ডি ও। সঙ্গে দেব জুনিয়র। পেছনে আর্মড গার্ড।

দেব বলল,

—হ্বাই, গাভ্‌নর কি রকম অ্যানয়েড হয়েছেন তুমি জানো না। তোমার বাবা, প্রায় আমাদের হর্তাকর্তা বিধাতা। তুমি আমাদের গেস্ট্‌ হয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা একটা—

সেই খিল্‌খিল্‌ হাসি।

—শেষ পর্যন্ত কিনা একটা পাঁঠার পাল্লায় পড়ে এদিক ওদিক ঘুরছি। ওরে গাধা মন আমার মুক্ত, চোখ আমার উজ্জ্বল। তোদের সাথে কোন সম্পর্কই আমার নেই। তোরা ত এদেশী, আমি বিলেতে মানুষ, নিজের কেয়ার নিজেই নিতে জানি।

ডাটা বলল, ও সব কথা বুঝিনে। আমাকে বিয়ে করতে কলকাতা যেতে হবে। জাস্টিস্‌ মল্লিকের মেয়ে রিনী মল্লিকের সাথে আমার বিয়ে। আসবেন কিন্তু।

—কন্‌গ্র্যাচুলেসন্‌স্‌। আমার ত মনে হচ্ছে, উনিশ বছর পর ভারতবর্ষে নেমে এই একটি সুখবর শুনলুম।

ডাটা বলে চলল, আমাকে ত একঘর লোকের সামনে কমিশনার ওয়েভারার, ইনকম্‌পিটেন্ট, ওয়ার্থলেস্‌ বলে যা খুশী তাই বললেন আপনাকে নিয়ে না যেতে পারার জন্য, চাটগাঁ কুমিল্লার এ. পি. চীফ্‌ সেক্রেটারী, এ বি আর এর বড় সাহেব, আরো, কে কে ছিল মনে নেই।

—কেন আপনিই ত লোক্যাল ম্যাজিস্ট্রেট, আপনিই ফায়ারিং অর্ডার দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আপনি ইন্‌কমপিটেন্ট হলেন কি করে ?

—সে ত কর্তার ইচ্ছেয়। আন্‌আর্মড্‌ কুলি ক্রাউডের ওপর এর কোন দরকার ছিল না। But the violence of the non-violent Congress ! তারাই ত প্রভোক করল—

—কংগ্রেস্‌ ভলান্টিয়াররা বুঝি আর্মড্‌ অ্যাটাক করেছিল আপনাদের ওপর ?

—আরে না না, আপনি এদেশে থাকেন নি, ঠিক বোঝানো শক্ত। মব্‌কে আন্‌লফুল অ্যাসেম্বলি পাকানো থেকে থামানোর জন্য ডিস্‌-পারস্যাল অর্ডার দিতে হয়। ওয়ার্নিং দেওয়া হয় আগে—পিসফুলি ছত্রভঙ্গ হবার জন্যে। মব্‌ বলতে এখানে কুলিরা, কিছু সাপোর্টিং পাব্‌লিক, আর কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের দল। ওই ভলান্টিয়ারগুলো না থাকলে হয়ত বাকী সবাই ডিস্‌পার্স করত। কিন্তু বসন্ত মজুমদারের ঐ ভলান্টিয়ারের দল। অন্‌ দি স্পট একজন মহিলা লীডার ছিলেন, সরলাদেবীর চেলা, কি নাম যেন। লেডী রায় হ্যাঁ হ্যাঁ মায়া রায়, এঁরাই গোল পাকালেন। ১৪৪ মানবেন না। অগত্যা—

—অগত্যা গুলি চালালেন ?

—স্মাই ! কি যে বলেন মিস্‌ মিটার !

—যা বললুম, সেটা বুঝি প্রাঞ্জল হয় নি ?

—আমি গুলি চালাব কেন ? তিনটে আইনসঙ্গত ওয়ার্নিং দিয়ে,

অ্যাজ্ এ ম্যাজিস্ট্রেট,—মানে আমাকে ল অ্যাণ্ড অর্ডার বজায় রাখতে হবে, অর্ডার দিতেই হলো।

—Shoot to kill ?

—ছিঃ ছিঃ, তা কেন। প্রথমে ব্ল্যাঙ্ক, তারপর তাতে কাজ না হলে লেড্। তাও হাঁটুর নিচে।

—তবে লোক মরল কেন ?

—সে লোকদের দোষ। আনরুলি হয়ে লাফালে ঝাপালে যারা ফায়ার করছে তাদের পক্ষে টার্গেট রাখা শক্ত।

—অথচ সব আন্‌আর্মড্ এবং আদার ওয়াইজ্ পিস্‌ফুল ?

—ও ঠিক বুঝবেন না আপনি। Law as it stands,—এন্‌ফোর্স করতে গেলে কন্‌সিকোয়েন্স বিচার করা চলে না। যারা আইন মানছে না, ভাঙছে, তারাই ত ডেকে আনছে বিপদ তাদের ঘাড়ে।

জুনিয়র দেব এই সময়ে বাধা দিয়ে বলল,

—হ্বাই, ডাটাকে ঘামিয়ে দিয়েছ জেরার তোড়ে। একি তোমার ইংলিশ ইলেক্‌টোরেট না লণ্ডন পুলিশ ? চলো, ওদিকে বাবা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

—ঠিক বলেছ। ভুলে যাই যে এটা ব্রুটিশ গভর্নমেণ্ট। চলো, কোথায় তোমাদের ডেরা।

—ডাটার বাংলো, খুব দূরে নয়।

—আমি কিন্তু আজকেই ফিরে যেতে চেয়েছিলাম কলকাতায়। কিন্তু মনীশকে কথা দিয়েছি ওর মা বাবার সাথে দেখা করব তাই চাটগাঁ যেতে হবে একবার। তুমি তোমার বাবাকে বোলো—আচ্ছা আমিই বলব—

আমি ট্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা তিনজন রওনা দিল।

দু'পাও যায়নি, রেলওয়ে শেডের আড়াল থেকে দীর্ঘমূর্তি এক ইংরেজ বেরিয়ে এল আমাদের দিকে। বলল,

—হ্যাল্লো দেব, আফটারনুন্ ডাটা,—বলে ভায়োলেটের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

—মিস্ ভায়োলেট মিটার। ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড গেস্ট্।

—গুড্ আফ্টারনুন মিস্ মিটার

বলে সাহেব ঘাড় মাথা নামিয়ে নড্ করল। ভায়োলেট যথোচিত জবাব দিল।

ঠাহর করে দেখলাম শ্যালো সাহেব। চাটগাঁর এস্. পি। আমাকে চেনে। বলল,

—হ্যালো মনীশ, ইউ অল্সো।

—না সাহেব, আমি ওদের দলের নই। একাই বাড়ি যাচ্ছি। মা বাবা ভালো আছেন?

বেশ বাংলা বলত শ্যালো। বলল,

—খুউব ভালো আছেন। কিড্কে কাছে পেলে আরো ভালো থাকবেন।

শ্যালোর আর একটা পরিচয় ছিল। এ সেই ডাকসাইটে টেনিস্ খেলোয়াড় শ্যালো, যে সেবছর বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের কোনো একটা রাউণ্ডে যতীনের কাছে হেরেছিল। শ্যালো বলে চলেছে,

—আই সে, জানো, I got the nastiest surprise of my life just now, এই একটু আগে। দেব, তোমার এবারকার চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা মনে আছে? That brilliant colt from the University যার কাছে আমি হারলুম, he is amongst the wounded volunteers কি নাম যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, রে, জে, জে।

—রে? জে রে? যতীন?

ভায়োলেট বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে শ্যালোর হাত চেপে ধরেছে। শ্যালোকে টানতে টানতে ছুটছে, আর বলছে

—কোথায় সে? চলো, নিয়ে চলো আমাকে—

শ্যালো হক্‌চকিয়ে গেছে। পুলিশ এবং সাহেব হওয়া সত্ত্বেও সে ভদ্রলোক ও স্পোর্টস্‌ম্যান। আর হাত ধরেছেন যিনি তিনি মহিলা। বুঝেছে যে রে নিশ্চয় এঁর কোনো নিকট আত্মীয় হবে। বলল,

—চলুন। কিন্তু আপনি ঘাবড়াবেন না। রে'র গায়ে কোনো উণ্ড্ নেই, সিরিয়স্ কিছু হয় নি। তবে স্ট্যাম্পিডের মধ্যে পড়ে চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমি তাকে কোড্ থেকে সরিয়ে স্টেশন মাস্টারের বাংলোয় কম্‌ফর্টেব্‌ল্ করে দিয়ে এসেছি। After all, we played tennis together.

ভায়োলেটের মুখ কাগজের মতো সাদা, কব্‌জির মুঠো থরথর করে কাঁপছে।

শ্যালো খুব বিস্মিত হয়ে গেছে, এর ওর দিকে তাকাচ্ছে।

ডাটা বলল,

—Then Mr. Shallow, you better take charge of Miss Mitter. ওঁকে আবার পৌঁছে দেবার ভার আপনার। কমিশনার অপেক্ষা করছেন ওঁর জন্যে—উনি কমিশনারের গেস্ট।

আমি গিয়ে শ্যালোর কানে কানে কথা কইলাম। শ্যালো ভায়োলেটকে মিষ্টি করে বলল,

—নাউ, স্টেডি মিস্ মিটার স্টেডি। রে'র কন্‌ডিশান সিরিয়স্ নয়। নিশ্চয় ভালো হয়ে উঠবে শিগগির। কুমিল্লা থেকে সিভিল সার্জনকে আনতে লোক গেছে। তবে ল ব্রেকার গ্রুপের লোক, ভালো হয়ে উঠলে অথরিটিজ্ প্রসিড্ করবেন কিনা তাঁরা জানেন। আমার যতটুকু সাধ্য আমি তার কোনো অসুবিধে হতে দেব না। ওকি, আপনি কাঁপছেন যে!

আমি গিয়ে ভায়োলেটের পাশে দাঁড়ালাম। এক হাত আমার কাঁধে, আরেক হাতের মুঠোয় শ্যালোর হাত, ভায়োলেট বলল,

—চলো।

কলের পুতুলের মতো চলতে লাগলো ভায়োলেট আমার আর শ্যালোর সাথে।

স্টেশন মাস্টার সাহেব। বাংলোটিও ছিমছাম।

জুঁই ঝুমকোলতা দিয়ে ছাওয়া সামনের বারান্দায় যতীনকে শুইয়ে রেখেছে একটা নেয়ারের খাটে। গলা থেকে পা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখটুকু শুধু বেরিয়ে আছে। ডাক্তার হয়ত হিপ্‌টনিক দিয়েছে। মনে হলো ঘুমিয়ে আছে।

ভায়োলেট গিয়ে খাটের পায়ার দিকটা, মানে শক্ত দিকটায় বস্‌ল। অপলক চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল মুখের দিকে। তারপর ঘুম না ভাঙে, এমনি আস্তে আলগোছে কপালে হাত বুলিয়ে দিল, চুলের গোছা শিজিল করে দিল।

শ্যালো ফিস্‌ফিস্ করে বলল,

—যদ্দূর পারি কম্‌ফর্টেব্‌ল্ করবার চেষ্টা করেছি। রেলের ডাক্তার মর্ফিয়া ইনজেক্‌সন দিয়েছেন। এখানে ত ভালো হস্‌পিটালাই-জেসনের ব্যবস্থা নেই, দরকার বুঝলে কুমিল্লা সদর হাসপাতালে রিমুভ করব। আগে সিভিল সার্জন আসুন—

ভায়োলেট বলল,

—মিঃ শ্যালো, যদি উণ্ডেড্ না হয়ে থাকে তবে অজ্ঞান হয়ে গেল কেন?

—আমি লে ম্যান, আমার পক্ষে বলা শক্ত। রেলের ডাক্তার এলে বলতে পারবে। সে প্ল্যাটফর্মে গেছে, উন্ডেড্‌দের অ্যাটেণ্ড্ করতে। তবে আমি বলে দিয়েছি রে কে স্পেশ্যালি দেখতে। এসে পড়বে এখুনি।

—আচ্ছা মিঃ শ্যালো, আমার থাকবার ব্যবস্থা এখানে করা যায় না? অন্তত আজকের রাতের জন্যে···

—আপনি তবে কমিশনার, মানে ডাটার বাংলোয় যেতে চান না?

—কখনো না।

আমি খুব বিব্রত বোধ করলাম বটে, কিন্তু ভায়োলেটের এ পাগলামি ত অর্থহীন নয়। এলো দেবেদের গেস্ট হয়ে, কেটে পড়লো আমার সাথে, এখন সাতরাজার ধন পেয়ে গেছে, আর ওকে নড়ায় কে। তবু বললাম,

—রাতে থাকবার দরকার কি ভায়োলেটদি? সিভিল সার্জন এসে পরীক্ষা করার পর যখন রিলীজ হবে, তখন এলে হতো না? তা ছাড়া, দেখছ ত শ্যালো কতখানি পার্সন্যাল কেয়ার নিচ্ছে—

নিষ্প্রভ হাসি হেসে শ্যালো বলল,—তা নিচ্ছে বটে, তবে ভালো হয়ে উঠলেই ত হাজতে নিয়ে যেতে হবে। পলিটিক্যাল কেসের আসামী বলে নাম উঠে গেছে।

—পলিটিক্যাল? লেবার স্ট্রাইক, তাও নন্ ভায়োলেণ্ট, এর ভেতর পলিটিক্স এলো কোত্থেকে?

—ল' অ্যাণ্ড অর্ডার অমান্য করা ত পিন্যাল কোডের অপরাধ, মব্এর মধ্যে সবাই যে নন্ ভায়োলেণ্ট ছিল, তাও নও। এছাড়া সেনগুপ্ত, লেডী রায়, এইসব লীডাররা এসেই বিপদ বাধিয়ে তুলেছেন। কংগ্রেস ভার্সাস্ গভর্নমেণ্ট ব্যাপারটা ঘোরালো দাঁড়িয়ে গেছে।

ভায়োলেট কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল—ভলাণ্টিয়ারদের লীড করতে কে এসেছেন বললেন যেন—

—লেডি রায়। মায়া রায়।

—তিনিও কি অ্যাণ্টি ব্রিটিশ, মানে কংগ্রেসের—

—না না, তিনি সোস্যাল ওয়ার্কার। এসেছিলেন কুলিদের রিলিফ্ অর্গানাইজ করতে। স্ট্রাইক ত ঢের দিন আগে থেকে চলছিল, Poor beggars were starving. মাঝখান থেকে জি এম্ অ্যাণ্ড কম্পানি এসে পলিটিক্যাল কালার দিয়ে ফেললেন। তা না হলে রেলওয়েতে কুলিতে একটা সমঝোতা হয়ে যেত হয়ত, ওরা কাজেও যোগ দিত।

—সমঝোতা মানে ত রেল কম্পানি যা ডিক্‌টেট্‌ করবে—

—অতশত জানিনে। কংগ্রেস মাথা গলিয়ে এসে পড়বার পর কুলিরা খেতে-দেতে পেয়ে তাজা হয়ে উঠল। তখন লীডাররা একটা কড়া রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ তৈরী করে ফেললেন। ফলে, যারা কাজে যোগ দিতে আসছিল তাদের বাধা দেবার জন্যে পিকেটিং শুরু হলো। রিলিফের ভলান্টিয়াররাই রাতারাতি পিকেটার হয়ে গেল। তাদের ডিস্‌পার্স করবার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটকে শেষপর্যন্ত ফায়ারিং-এর হুকুম দিতে হলো। দু'টো ডেথ্‌ও হয়েছে, এগারো জন ইন্‌জার্ড।

—সবাই ভলান্টিয়ার?

—ও গড্‌, নো নো! কেবল জন দুয়েক ভলান্টিয়ার ইন্‌ক্লুডিং রে আঘাত পেয়েছে। আর সব কুলি।

ভায়োলেট শ্যালোর দু' হাত ধরে বলল,

—আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই মিঃ শ্যালো, এ পর্যন্ত আপনি যা করেছেন যতীনের জন্যে, নিকটতম আত্মীয়ও কেউ করতে পারত কিনা সন্দেহ। তাই আপনাকেই আমার এখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, শুনুন,—বলে শ্যালোকে দূরে টেনে নিয়ে কি সব বলল ভায়োলেট।

শ্যালো ফিরতে ফিরতে বলল,

—গড্‌ ইন্‌ হেভেন্‌। ইয়ং ঘটক হিণ্ট দিয়েছেন অল্‌রেডি। অফ্‌কোর্স। I'll do it, কিন্তু, কিন্তু, you are commissioner's guest—

—I was. No longer am. I am this poor fellow's guest. বলে আমাকে দেখিয়ে দিল।

শ্যালো সসম্ভ্রমে ভায়োলেটের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখি কি করতে পারি।

আমাকে বলল, Play host to her. আমি আসছি।

বলে শ্যালো বেরিয়ে গেল।

আমি বললাম,

—একি করলে ভায়োলেটদি! একটু ভাব্‌লে না,

—তোর ভয় হচ্ছে, না রে? তোর বাবাও ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজস্ট্রেট পলিটিক্যাল আসামী—তার কাছে থাক্‌ব···

জ্বলে পুড়ে তেতে উঠলাম।

—বিনা চাবুকে খুব চাবকাতে শিখেছো, না? যা মুখে আসে তাই বল্‌ছ—

সেন্টিমেণ্টের বয়স সেটা। চোখে জল ভরে এলো। মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

কিন্তু ভায়োলেটের চোখ এড়ায় না। তড়াক করে দাঁড়িয়ে দু'হাতে আমার মুখ ফিরিয়ে ধরল। টপটপ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

—এত বোকা তুই? আমাকে ভাল বাসিস্‌ বুঝি?

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিল। বলল,

—সেন্টিমেণ্ট্যাল হস্‌ নে। ওজন করে কথা বলার মতো মনের স্থিরতা নেই তা ত জানিস্‌। রাগ করিস্‌ নে ভাই। শোন্‌। কলকাতায় বাবাকে আসতে বলে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দে এখুনি। আর একটা হাজারিবাগে। যতীনের বাবাও যেন আসেন। তার পর তুই তোর বাবা মায়ের কাছে চাটগাঁ চলে যা—তোর ছুটি।

আমি সত্যিই বোকা ছিলাম অনেক বিষয়ে। আসন্ন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে দেখিনি ভায়োলেটদির ফেরানো মুখও চোখের জলে ভেসে গিয়েছে।

—যাই না যাই, সে আমি বুঝব। ছুটি দিলেই সবাই ছুটি নেয় না। যাক্‌। দু'টো তার করবার কথা যা বললে, আমি এখুনি করে আসছি। আর, আর, এস্‌ ডি ওর বাংলোতেও একটা খবর দেওয়া দরকার।

—Not till father's reply is received. আর্জেন্ট প্রিপেড কোরো। যাও।

রেলের তারঘরে প্রথমে গেলাম। তারা বলল, রেলের তার সিভিল পাড়ায় বিলি হতে বহু সময় লাগবে। অগত্যা দু মাইল হেঁটে চাঁদপুর ডাকঘরে গিয়ে তার দুটো করলাম।

ভেবে-চিন্তে ঠিক করে ফেলিছি আমি চাটগাঁ, যাব না।

যে ভায়োলেটের মুখে হাসি কৌতুকের খৈ ফুট্‌ত, সে থমথমে হয়ে আর একরকম হয়ে গেছে। কতটুকুই বা পরিচয় আমার সাথে, তাও ওর মনের ঝড় আমার মনকেও দোলা দিয়েছে। ওকে যতীনকে নিয়ে যে নাটক দ্রুত পট পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, তার শেষ পর্যন্ত আমাকে নেপথ্য দর্শক থাকতেই হবে।

আমার ফিরতে ঘণ্টাদুয়েকের বেশীই লেগেছে। ভেবেছিলাম গিয়ে হয়ত ওদের পাব না। এসে দেখি ভায়োলেট যেমন বসেছিল, তাই আছে।

যতীন একটু একটু করে চোখ মেলছে, কিছু বুঝতে পারছে না, অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কি বলবে বলবে করে ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে বলে উঠতে পারছে না।

অস্ফুট স্বরে বলল শুধু,

—আপনি—তুমি—ভায়োলেট—

—হ্যাঁ, আমি, আমি। আমি তোমার ভায়োলেট।

যতীন মুখের ওপর মুখ রেখে বলতে লাগল।

—তোমার, তোমার ভায়োলেট।

সর্বাঙ্গ চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। যতীন কষ্টে হাত তুলে ওর পিঠে বুলিয়ে দিতে দিতে ওর চোখের কোল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল বালিশে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি নিঃশব্দে ওখান থেকে সরে ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালাম। সাদা রং করা কাঠের ফটক। ওপরে মাচায় অজস্র আইপোমিয়া

ফুলে ভরা লতার কেয়ারি, বেগুনি রঙের ফুলে ভরে আছে। রাতের আবছা আলোয় তাদের ঘুমন্ত লাগছে। ভোর হলেই হাসিমুখে দিক আলো করে দেবে। চলতি নাম মর্নিং গ্লোরি। সার্থক নাম।

বাংলোর হাতার ফেন্‌সিং লোহার পেটানো পাত. তাও সাদা রং করা। হাতাটুকু কম হবে না, বিঘেখানেক ত বটেই। লাল সুরকির পথ নানারকম ফুলের বেড-এর এদিক ওদিক দিয়ে। বাইরের রাস্তাও লাল সুরকির, যদ্দূর পর্যন্ত রেলের এলাকা।

শহরের দিক থেকে বাংলোর দিকে আসছে দেখলাম, কুণু দেব, শ্যালো, ডাটা, কুণুর বড়দি। আমি গেটের ওপর ভর দিয়ে ওদের পৌঁছনোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

ওরা পৌঁছে গেলে বললাম,—এখন যেও না। একটু থেমে যাও।

কুণুর দিদির হুকুম করা অভ্যেস, মানা নয়। তিনি আমাকে এক পাশে সরিয়ে সোজা বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু দূর থেকেই ফিরে এলেন। ডগমগ খুশী খুশী গলায় বললেন—তাই বলো। ছুঁড়ি ত জন্মাবধি বিলেতে, এই চোয়াড়েটাকে চিনলই বা কবে, আর এত কাণ্ড পাকিয়ে বস্‌লই বা কবে।

—টুটুদের বাড়িতে। যতীন টুটুর বন্ধু। ওর সাথেই মল্লিকরা রিণির বিয়ের কথা ভাবছিলেন।

—ওঃ, সেই ফার্স্ট হওয়া টেনিস্‌চ্যাম্পিয়ান ছেলেটা! কিন্তু রিণার ত ডাটার সাথে পাকাপাকি—

—সে সব পরের অধ্যায়। মাঝখানে অনেক নাটক নভেল হয়ে হয়ে গেছে। ভায়োলেটের সাথে টুটুর, রিণার সাথে যতীনের, গোড়ায় এই সবই ছিল কর্তা গিন্নিদের প্ল্যান। যে হেতু ওরা নির্জীব তাসের দেশের সাহেব বিবি নয়, রক্ত মাংসের মানুষ, তাই খেলুড়ের মর্জি মত চলেনি, নিজেরাই নিজেদের ভালো লাগা না লাগার দাবিতে পথ করে নিয়েছে।

—বেশ করেছে। বড় হয়েছে, করবেই ত। ওদের বাপ মা সব জানেন ত?

—সে আমি কি করে জানব বলো—

—এত কথা জানিস, আর এটা জানতে পারিস নি?

—যতীনের সাথে এক মেস্ বাড়িতে থাকি, ওর দিকটা জানি। ভায়োলেটদের মেডোজ-এ গিয়েছি, তার মা কি বোন কি জানেন আর না জানেন, আমাকে বলেন নি। স্টিমারে একত্র এসে ভায়োলেটকে জেনেছি। তা ছাড়াও ওদের পেছনে পূর্ব ইতিহাসও কিছু আছে।

—কি ইতিহাস?

—বলা বারণ।

রহস্যের গন্ধ পেলে মাঝবয়েসি মেয়েরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। রণুর দিদিও ব্যতিক্রম নন। বললেন,

—বলবি না?

—বলা বারণ।

—না বললি। যা চোখে দেখেছি, তাই সত্যি। তাই ভালো। দিদির উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারী শ্রদ্ধা হলো ওঁর ওপর।

—শ্যালো বলছিল দুবাই এখেনেই থাকবে। আমাদের কাছে যাবে না। নিশ্চয় থাকবে। আমি ভার নিচ্ছি। ডাটার ওখানে একরাশ লোক, বড়ো মেজো ছোট সাহেবের ভিড়। সেখানে না যাওয়াই ভালো। শ্যালো, তুমি সাইডিংএ একটা খালি ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেণ্ট লাগানোর ব্যবস্থা করে দাও। আর দ্বিজদাস, প্লিজ্ ফিরে গিয়ে তিনজনার মতো বিছানা বালিশ—না, না, দু'জনার হলেই চলবে, যতীন ত শুয়েই আছে, পাঠিয়ে দাও গে। রুণু, তোরা যা এইবারে। বাবাকে বলিস্, আমি ভায়োলেটের কাছে এখানেই রাত্তিরে থাকব।

আমি বললাম, দিদি, শাণ্ট করে গাড়ি এলে লাগাতে রাত

কাবার হয়ে যাবে। তার চেয়ে কোনো স্টীমারের ক্যাবিনে থাকলে হয় না ? অবশ্য, মিঃ শ্যালো যদি নাইট গার্ডের ব্যবস্থা করে দেন—

শ্যালো বলল, দি আইডিয়া! চিটাগং মেল জাহাজই ত রয়েছে। কম্পানির ছোক্‌রা সাহেবটাকে আমি চিনি, লোক ভালো। এখুনি খবর দিচ্ছি ওকে। আর গার্ডের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছি।

রুণু ও দ্বিজদাস ডাটা ফিরল এস্ ডি ওর বাংলোর দিকে। শ্যালো বাজার্ডের জেটির দিকে রওনা দিল।

রুণুর দিদি এইবার আমাকে পেয়ে বসলেন। গায়ে হাত বুলিয়ে কথায় মধু ঢেলে বললেন, হ্যাঁরে ভূত, ইতিহাসটা কি বল এইবার। আমরা জানতাম টুটুর সাথে ওর এন্‌গেজ্‌মেণ্ট অ্যানাউন্সড্ হবে, সানি মিটারকে ধরে ঐ যতীনের একটা হিল্লে, মানে বিলেতে গিয়ে সার্ভিস্ পরীক্ষার বিলিব্যবস্থা—পাকা হলেই রিণির সাথে তারও এন্-গেজমেণ্ট। কিন্তু তলে তলে কি যে কাণ্ড সব হলো, সবই ভেস্তে গেল। যতীনটা কার ছেলে রে ?

—হাজারিবাগ কলেজের প্রিন্সিপাল বি. রয়ের ছেলে।

—তার ওপর পড়াশুনো খেলাধুলোয় চৌকস, ওকে গেঁয়োভূত বলছিল কেন রিণার মা ? কিন্তু, এদিকে যে আবার অ্যান্টিগভর্নমেণ্ট আন্দোলনেরও পাণ্ডা, সেটাও ত—

—ঠিক নয়, কেমন ? যতীন, যদ্দুর জানি, বিলেতে যাবে নিজের পয়সায়, এই ঠিক ছিল। এডুকেশন ছাড়া অন্য কোনো ডিপার্টমেণ্টে সরকারী কাজ করবে না, এও ওর মনের ইচ্ছে। কংগ্রেস কোরাসে সরলা দেবীর দলে গান গাওয়া অবধি ও মনে মনে ইংরেজ বিদ্বেষী। এখানকার গোলমাল শুরু হতেই লেডী রায়ের সোশ্যাল ওয়ার্কারদের দলে ভিড়ে চলে এসেছে।

—লেডী রায় ? মানে মায়া মাসী ?

—হ্যাঁ, মায়াই ত নাম, তাই শুনেছি।

—তিনি ত পলিটিক্যাল কেউ নন্।

—পলিটিক্যাল রং চড়ল তাহলে, তা'বড়া তা'বড়া কংগ্রেস লীডাররা এসে রণং দেহি করে হুঙ্কার ছাড়বার পর। তার আগে ত শুধু লেবার স্ট্রাইক ছিলো, শুনেছি মিটেও আসছিল।

—যতীনকে ভায়োলেট দেখল কোথায়?

—ওই টুটুদের টেনিস লনেই। যতীনকে আগে কখনো বাড়ি নিয়ে যায় নি টুটু, তবে পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর যখন শুনল, ও বিলেত যাবে, খবরটা বাপ মাকে বলেছিল। তাঁদেরও মনে ঝিলিক দিয়েছিল রিণার কথা, বিলেত থেকে জলচল হয়ে এলে অমন সুপাত্র কটা আর পাবেন তাঁরা। এই সুবাদেই যতীন ওবাড়িতে প্রথম গেল। ভাগ্যক্রমে—না না, দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ভায়োলেটও ও বাড়িতে।

—প্রথম দেখাতেই ওদের মন দেয়া নেয়া হয়ে গেল?

—তা আমি কি করে জানব? আমি ত ওসব সমাজে হরিজন, নো এন্ট্রি!

—আর বাড়াস্ নে।

—বাড়াচ্ছি কোথায়? বাপের রাজত্বে, মানে চাটগাঁয়ে আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে, সর্বত্র অবাধ গতিবিধি, ধরো না দিদি, তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত। কিন্তু কলকাতায়? সেখানে রাংতা মোড়া বাঙালী সাহেবদের সমাজে আমার স্থান কোথায়?

—নে নে, আর ন্যাকাপনা করতে হবে না। রাংতা মোড়া! খুব যে চটক! কে যেন বলছিল, গল্পটপ্প লিখিস নাকি কাগজে, তাই বুঝি এত রংদার কথা কইতে শিখেছিস্—

—সে কথা যাক।

—আচ্ছা হ্যাঁরে, তোদের যতীন ত এখন উধাও, কিন্তু ভালো হয়ে উঠলে ওকে যদি সিডিশনের দায়ে ধরে?

—সে ত ধরবেই। ব্যাপার যা দাঁড়ালো, ও যে রাজদ্রোহের আসামী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আদালতে সোপর্দ হবেই। তার

পর মামলা মোকদ্দমা—জেল কি খালাস—সে সব ভবিষ্যতের কথা।

দিদি আই সি এস্ কমিশনারের মেয়ে, ব্যারিস্টারের বৌ। কিন্তু খাঁটি ভালো মানুষ। আইন আদালত রাজদ্রোহ এসব প্রসঙ্গ গায়েই মাখলেন না। রোমাঞ্চকর একটি প্রেমকাহিনীর শ্রোত্রী হয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছেন।

—অ্যাঁ, এ যে গল্পকথার মতো রে! সানি মিটার ত কিং মেকার। অমন ভালো ছেলে, সদ্বংশের ছেলে, বাপ একটা বড়ো কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—কু-লোকে বলে গেঁয়ো ভূত—মুখে ঝাঁটা মারি তাদের—আর ভায়োলেটের মতো লাখে একটা মেয়ে। মিত্তির সাহেব যদি গররাজি না হন ত যতীন এডুকেশন সার্ভিসে বিলেত থেকেই কভ্‌ন্যান্টেড্ হয়ে আসতে পারবে, অপূর্ব চন্দর মতো। সবচেয়ে বড়ো কথা ভায়োলেট সুখী হবে—বাপ নিশ্চয় নারাজ হবেন না।

—সুখী হবে কিনা জানিনে, তবে এখন যে হয়েছে, তাতে নিজের চোখেই দেখে এলেন দিদি—যতই ফোঁপাক, আর কাঁদুক—

দিদি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখে এলেন ভায়োলেট সামলে উঠে চোখ মুছছে। বললেন—আয়।

দিদির বয়স যদিও ত্রিশে পৌঁছয়নি এখনো, মানুষটি ভারি ভারভারিক্কি চালের। 'গজহুঁ গামিনী' চালে এসে ভায়োলেটকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ভায়েলেট আর একবার দিদির কাঁধে মাথা রেখে চোখের জল ফেলল। দিদি নীরবে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এই সব কান্নাকাটি দেখলে আমার যেন কেমন খেইহারা মতো লাগে। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

অন্ধকার বেশ জমে এসেছে। যতীনটা ঘুমোচ্ছে না পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে সব দেখছে, ঠাহর করিনি।

দিদি বললেন,

—হাবাই, কোন ভয় নেই তোর। তোকে ডাটার বাংলোয় যেতে হবে না। কাছাকাছি এখানেই থাকবার ব্যবস্থা হচ্ছে। শ্যালো গেছে সব ঠিকঠাক করতে, এলো বলে।

বলতে বলতেই শ্যালো সাহেব এসে হাজির হলো সঙ্গে আর একটা সাহেব। বলল,

—জাহাজের ক্যাবিনের ব্যবস্থা পাকা। রাত্তিরে ডিনারও ওরাই দেবে। ছু'জন আর্মড গার্ড থাকবে জাহাজে। কোনো অসুবিধে হবে না।

দিদি জিজ্ঞাসু চোখে অন্য সাহেবটির দিকে তাকাতে শ্যালো বললেন,

—ইনি ডঃ গ্রীন অর্মিটেজ্। কুমিল্লার সিভিল সার্জেন। এঁকে খবর দিয়ে আনিয়েছি। উনি রে-কে দেখুন।

যতীন জেগেই ছিল। গ্রীন আর্মিটেজ্ গভীর মনোযোগ দিয়ে ওকে পরীক্ষা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন,

—বাইরে ত কোনো উণ্ড নেই, তবে অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন? শকে? ওকে গরম দুধ আধ আউন্স ব্র্যাণ্ডি দিয়ে খাইয়ে দিন। আর ঘুমের ওষুধ দেব। রাত্রে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি ত রাত্রে থাকবই, কাল সকালে আবার দেখব।

শ্যালো বললেন,

—দুধ আর ব্র্যাণ্ডির ব্যবস্থা হয় তো জাহাজ থেকেই করতে হবে। না না, দেখছি, ফ্রামজি হেল্প্ করতে পারে কিনা।

এর মধ্যে যতীন আবার ডাক্তার সাহেবকে ইশারায় ডেকে কানে কানে কি যেন বলেছে। গ্রীন আর্মিটেজ্ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন।

—গুড্ গ্রেসাস—আগে বলেন নি কেন? দেখি, দেখি—

জামা খুলে বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন। টিপে ঠুকে নানাভাব

দেখতে দেখতে বুকের এক জায়গায় গায়ে হাত পড়তেই যতীন কাতরোক্তি করে উঠল।

ডাক্তার সাহেব সেখানটা টিপে ধরে বললেন,

—জোরে নিশ্বাস টানুন ত।

—লাগছে, খুব লাগছে।

হাত সরিয়ে নিয়ে ডাক্তার গম্ভীর হয়ে গেলেন। একবার দিদি আর একবার ভায়োলেটের দিকে তাকিয়ে শ্যালোকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে ফিসফাস করে কি যেন বললেন।

কথাবার্তার ধরনে মনে হলো ডাক্তার সাহেব বিলক্ষণ বিচলিত বোধ করছেন। তারপর আমাদের কাছে এসে বললেন,

—সন্দেহ হচ্ছে হার্টএর রিজিয়নে দুটো রিব্ ফ্র্যাক্চার হয়েছে। এখানে ত X'Ray-র ব্যবস্থা নেই, সদরে নিতে হবে। তবে প্ল্যাস্টার করে দিচ্ছি, সাময়িক আরাম পাবেন। এখনো কোনো টেম্পারেচার নেই, তবে রাত্তিরে ওঠা অসম্ভব নয়। সজাগ থাকতে হবে, রাত্তিরে টেম্পারেচার নিতে হবে।

ততক্ষণে শ্যালোর বাহনেরা স্টেশন মাস্টারের গোলকামরা থেকে বেতের চেয়ার, মোড়া অনেকগুলো বার করে ফেলেছে। দু'টো কেরোসিনের ঝকঝকে রেলোয়ে মার্কা লণ্ঠনও জ্বেলে দিয়েছে। আমরা বসলাম। শ্যালো রেল হস্পিটাল থেকে প্ল্যাস্টার আনতে চলে গেল। ফিরেও এল দশমিনিটের মধ্যে।

ডাক্তার সাহেব যতীনের বুক পিঠ পেঁচিয়ে অ্যাঢেসিভ্ প্ল্যাস্টার জড়িয়ে পরিপাটি ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

শ্যালো এইবার রাতের খাওয়া, থাকা, ইত্যাদির ব্যবস্থার কথা তুলে বলল,

—কমিশনারকে একটা খবর দিয়ে দিই,—আলাদা আর খবর দিইই বা কেন,·আমি আর সিভিল সার্জন ত যাচ্ছিই সেখানে। কে

কোথায় থাকছে তা হলে? রে-র কাছে মনীশ থাকবে, অ্যাণ্ড ইউ লেডীজ—জাহাজে।

ভায়োলেট এতক্ষণ ধন্দ ধরেছিল। এইবারে বলল,

—তুমি বাংলোয় ফিরে যাও দিদি। জাহাজে সাহেবরা থাকুন গে। মন্, তুই কিছু খেয়ে আয়, আর একটা থার্মোমিটর যোগাড় করে নিয়ে আয়, এখেনেই পড়ে থাকিস্ কোথাও। আমার ঘুমেরও দরকার নেই, খাবারও না। আমি যাব না।

দিদি বলতে যাচ্ছিলেন যে, এখানে অন্য কোনো বর্ষীয়সী মেয়ে নেই, সমস্ত রাত ভায়োলেটের পক্ষে এখানে কাটানো ভালো দেখাবে না,—এই জাতীয় কিছু। মানে পুরুষরাও যারা আছে, আত্মীয় ত কেউই নয়—

শ্যালো বলে উঠলো,

—ইউ আর রাইট মিস্ মিটার। আপনি এখানেই থাকবেন।

সিভিল সার্জেন পকেট থেকে থার্মোমিটার আর ঘুমের ওষুধের দু'টো পিল বার করে ভায়োলেটের হাতে দিলেন।

শ্যালো বলল,

—আমি দুধ আর ব্রাণ্ডি নিয়ে আসছি।

রুণুর দিদি ভায়োলেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তার পর ওকে আর একবার বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

—ঠিক বলেছিস। তোকে এখানেই থাকতে হবে। আমি ও মনীশ থাকব। শ্যালো, তুমি স্টেশন মাস্টারের একটা ঘর খুলিয়ে ব্যবস্থা করে দাও।

শ্যালো আর সিভিল সার্জন রওনা দিয়েছিলেন। শ্যালো ফিরে এসে বলল,

—আলবাৎ করে দেবো। জাহাজ থেকে ডিনার এখানেই আসবে সবার জন্যে। দুধ আর ব্র্যাণ্ডিও। গার্ড় দু'জন এখানেই

থাকবে। জাহাজের সেলুন থেকে তিনজনার মতো বিছানাও পাঠিয়ে দিন, যদি ডাটা অলরেডি না পাঠিয়ে থাকে,—

তারপর ভায়োলেটের দিকে ফিরে বলল,

I hope you will get your Ray in shape tomorrow. ও ভালো হয়ে উঠবে।

অন্ধকারে ফটকমুখো দীর্ঘদেহ সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেল।

'যাব না' বলে ভায়োলেট বাহানা তুলল, দিদি আর শ্যালো তাতে সায় দিলেন। ইংরেজ তাঁবেদার আমীর ওম্‌রাও বাড়ির মেয়েরা খোলাখুলি রাজদ্রোহের আসামীর রোগশয্যার পাশে রাত কাটাবে। খাঁটি ইংরেজ শ্যালোর মনে এতে কোন খটকা লাগেনি। সিভিল সার্জেন গ্রীন আর্মিটেজেরও না।

কিন্তু বাংলার মালিক ফিরিঙ্গী স্টেশন মাস্টারের এটা মনঃপূত হয় নি। সে যে কোন ফাঁকে এসে হাজির হয়েছে, তাও আগে চোখে পড়ে নি।

রাত্তিরে নিজের ডেরায় বসে মালটাল খাবে, হয়ত সমশ্রেণীর আধা-ইতর সঙ্গী সাথী জুটবে—সে মজলিসে উঁচুদরের ভদ্রমহিলাদের উপস্থিতি অস্বস্তিকর হবে।

ব্যাটা আমাদের কিছু বলছে না, বেশ খানিকটা দূরে ঘন ঘন পায়চারি করছে।

ইতিমধ্যে জাহাজের খানসামাদের হাতে ডিনার, দুটো কনেস্টবলের হাতে একরাশ বিছানা বালিশ, শ্যালো এসে হাজির হলো। খানসামাগুলো করিতকর্মা, চট্‌পট্‌ স্টেশন মাস্টারের খানা কামরায় ঢুকে টেবিলে যাবতীয় খাবার সাজিয়ে ফেলল তিনজনের মতো। বাবুর্চিখানা থেকে কাঠকয়লার লোহার উনুন ধরিয়ে নিয়ে এল, তাতে পালা করে খাবার পদগুলো গরম করতে লাগল।

শ্যালো বল্লল,

—দুধ গরম করে আনলেই রে-কে খাইয়ে দিন। এই যে ব্র্যাণ্ডি—

বলে আউন্সখানেক ব্র্যাণ্ডির ছোট্ট একটা শিশি বার করল।

খানসামা গেলাসে গরম দুধ আনতে শ্যালো নিজে তাতে ব্র্যাণ্ডিটা ঢেলে চামচে দিয়ে নাড়িয়ে ভায়োলেটের হাতে দিয়ে বলল,

—এইবার খাইয়ে দিন।

ভায়োলেট যতীনের শিয়রে বসে সন্তর্পণে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে শোয়ালো। বলল,

—পারবে খেতে?

—পারব।

—তবে খেয়ে নাও। না না, এক চুমুকে নয়, গরম আছে। আস্তে আস্তে খাও।

যতীনের দুধ খাওয়া শেষ হলে বলল,

—এইবার ঘুমের ওষুধ দেব।

—পরে দিয়ো। আগে তোমরা খেয়ে এসো।

—আমি পারব না কিছু খেতে। তোমার কাছ থেকে নড়তেও পারব না।

যতীন ভায়োলেটের ডান হাত অনেকক্ষণ মুঠোয় ধরে রাখল। তারপর বলল,

—পারবে, পারতেই হবে। তুমি খেয়ে এস কাছে বোসো, তার পর ঘুম পেলে, ঐ ত ওরা বিছানা করছে, গিয়ে শুয়ে পোড়ো। আমার আর কষ্ট নেই, তুমি এসেছো, দেখ সঙ্গে সঙ্গে আমি ভালো হয়ে গিয়েছি।

—কেন তুমি পালিয়ে এলে? সেই প্রথম দেখার দিন থেকে আমি তোমার, কেন এ কথা বোঝোনি?

বলতে বলতে ভায়োলেটের শরীর চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

যতীন বলল,

—হ্বাই, ভায়োলেট—লক্ষ্মীটি—তোমার সাথে আমাকে কাঁদতে হলে বুকে খুব ব্যথা লাগবে। আমি শুনেছি, দুটো রিব্ ভেঙেছে হার্টের রিজিয়নে।

ভেঙে পড়া ভায়োলেট হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বলল,

—বাহাদুর ছেলে! রিব্ ভেঙেছে! আরেকজনার যে সব ভেঙেছে, তার খোঁজ রাখো?

বলে, কে উপস্থিত আছে না আছে আদৌ কেয়ার না করে যতীনের কপাল গাল চুমোয় ভরে দিল। বলল,

—যাচ্ছি, খেয়ে আসছি। চলো দিদি, আয়রে মন্—

শ্যালো বলল,

—আমি বসছি রে-র কাছে। কিচ্ছু ভাববেন না। নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে আসুন।

যতীনের পাশে একটি চেয়ার টেনে শ্যালো বসল। যতীনের এক হাত মুঠোয় ধরে বলল,

You have made a mess of things, Ray. যদ্দুর বুঝলাম, পালিয়ে না এসে, কলকাতায়ই মিস্ মিটারের সাথে মন দেয়া নেওয়া করা উচিত ছিল তোমার।

—শ্যালো, তুমি বুঝবে না। ওকে আমি beyond reach মনে করেছিলুম, নিজের mediocrity নিয়ে আত্মম্ভরী হয়ে ছিলাম। ওর মুখ চোখের দিকে তাকাতেও সাহস পাইনি।

Fool, oh you poor fool

স্টেশন মাস্টারটা এতক্ষণ পায়চারি করছিল। এইবার এসে ইঙ্গিতে শ্যালোকে ডাকল। একটু দূরে নিয়ে গিয়ে কানে কানে গুজগুজ করে কি যেন বলল।

শ্যালো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো। চেঁচিয়ে বলল,

—This bungalow is commandeered by Govern-

ment. You can go and find shelter elsewhere. Do you want an official order ?

ধমক খেয়ে, আম্‌তা আম্‌তা করে ফিরিঙ্গিটা কি যে বলল, শোনা গেল না।

শ্যালো বলল,

—Not only for tonight, for the whole of next week. ডাটার বাংলোয় already there is a crowd. Should better leave now and find accomodation somewhere else. Go.

ল্যাজ গুটিয়ে স্টেশনে মাস্টার চলে গেল।

কোনো মতে খাওয়া সেরে আমরা ততক্ষণ ফিরে এসেছি যতীনের কাছে। শ্যালো বলল,

—এ বাংলো এখন আপনাদের দখলে। অনেক খাটিয়া আছে, মস্‌কুইটো নেটও। ঐ ত বিছানা সব করে ফেলেছে দেখছি।

ভায়োলেট বলল,

—আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না। আমার খাটিয়াটা এইখানে এনে দিতে বলুন, আমি ঘরে থাকবো না।

দিদিও ধুয়া ধরে বললেন,

—বারান্দাটা ত খুব চওড়া, আর স্পেশাস্‌? এল্‌শেপের ওই উইংটাতে আমার আর মনীশেরটাও। এ উইংসে ওরা নিরিবিলি থাকবে, অথচ আমরাও কাছেই থাকব।

—Easily done, বলে শ্যালো হুকুম দিয়ে দিল। বলল,

—Miss Mitter—আপনি কি কোনো ট্রেইন্‌ড্‌ হেল্প চান রাত্তিরে? এখানে ত নার্সের ব্যবস্থা নেই, তবে স্টেশন স্টাফের বাড়ির কোনো মেয়েকে অনুরোধ করলে—

—কিচ্ছু দরকার নেই। নার্সিং এর সামান্য যা কিছু দরকার

এখন, সে আমিই পারব। লণ্ডনে স্কুলিং-এর সময় first aid. আর নার্সিং, দুই-ই শেখায় আমাদের।

—Deliverance. গার্ড দু'জন রাতে থাকবে। আমি আপাতত চলছি। যদি ইমার্জেন্ট কিছু রাত্তিরে পাকিয়ে ওঠে, আমাকে খবর দেবেন। গুড্ নাইট।

শ্যালো চলে গেল। হিতাকাঙ্ক্ষী হলেও পুলিস সাহেব কর্তব্য ভোলে না। গার্ড মোতায়েন করে গেল।

দিদি বলল,

—ঘুম পাচ্ছে না। যতীনকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে আয় আমাদের ওদিকটায়। গল্প করিগে।

—ওষুধ দিচ্ছি, কিন্তু আমার গল্প করতে ভালো লাগছে না দিদি। এইখানেই থাকি আমি।

ভায়োলেট খাটিয়ায় ঢুকলো না। যতীনকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মশারী গুঁজে ওর শিয়রে একটা মোড়া নিয়ে বসল।

এই মেয়ে, এর বাপ ইংরেজের কেউকেটা আমলা। যাদের অতিথি, তারা ভারতীয়দের মধ্যে যতো বড়ো হতে পারে সেই দরের চাকুরে।

এক আহত রাজদ্রোহী কি ওলটপালটই না আনলো এতগুলো জীবনে। গুলি-বারুদের বিপ্লবী সবাই হয় না, কিন্তু মান্ধাতার আমলের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তখনকার অনেক তরুণ। কল্লোলের আমরা পুরোপুরি না হলেও অনেকটা শেষের দলে। এই সব বিপরীত ঘটনা সংস্থান কোনো ভয় কি দুর্ভাবনা আনেনি মনে, কল্পিত এবং বাস্তব প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে বেপরোয়া লড়াইয়ের মনোভাব সঞ্চিত হচ্ছিল মনে।

ভায়োলেট আত্মসমাহিত হয়ে যতীনের শিয়রে বসে আছে। সমস্ত দেবতার শরীর থেকে উদ্ভূত তেজ সম্মিলিত হয়ে যেন একটি নারী মূর্তি পরিগ্রহ করেছে—এই ধরনের একটা সংস্কৃত শ্লোক বাবার

মুখে শুনেছি। তিনি সাহেবি-ভাবাপন্ন হলেও সংস্কৃতবিশারদ ছিলেন। ধর্মশাস্ত্রের মধ্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডী আদ্যোপান্ত তাঁর মুখস্থ ছিল।

মনে পড়ল, শ্লোকটিতে ছিল, ওই নারীমূর্তির কান্তিতে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠলো, নিরবয়ব জ্যোতিঃ সত্তা নয়, এক অপার শক্তিশালিনী নারী। অভিভূত হয়ে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

কতক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলাম মনে নেই, গেটের দিকে লোকজনের সাড়া পেয়ে ধন্দ কেটে উঠলাম। কেউ গোলমাল না করে, যতীন ঘুমের ওষুধ খেয়েছে—এসব কথা জানাতে হবে যারা আসছে, তাদের।

এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন হাতে চাপরাশীর পেছনে ডাটা, রুণু আর রুণুর বাবা মিঃ বি. দেব আই সি এস্, চিটাগং ডিভিশনের কমিশনার।

গেটের কাছেই ওঁদের থামিয়ে দিয়ে বললাম সব কথা খুলে। যতীনকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাও বললাম। রাত্রে থাকবার সুচারু ব্যবস্থা শ্যালো সাহেব করে গেছেন তাও বললাম।

ওঁরা গেট খুলে ঢুকে, যে দিকটায় দিদি শুয়েছিলেন সেই দিকে গেলেন, যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে। আমি সাথে গেলাম।

রুণুর বাবা কমিশনার বিপুল দেব আই সি এস্ সার্থকনামা পুরুষ। কম্‌সে-কম্ ছ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা এবং মানানসই প্রস্থে। খুব কম কথা বলেন, অবসর সময়ে নাটক নভেল না পড়ে উঁচু গ্রামের অঙ্কের প্রশ্নের সমাধান করেন একা বসে। চাকুরীতে প্রবীণ, চালচলনে খানদানী সাহেব। ওটা ওই জাতীয় চাকুরে কিংবা ডাক্তার ব্যারিস্টার-বণিকের মধ্যে—দোষ বলব না—বিশেষত্ব ছিল, লক্ষ্য করেছি। তাই ওঁরা সাধারণ বাঙালিসমাজে মিশতে পারতেন না সহজ মানুষের মতো, নিজেরা নিজেদের মধ্যে কৃত্রিম সমাজ গড়ে মেলা-মেশা করতেন আর আমার এ কাহিনীর বেশীর ভাগ পাত্র-পাত্রী ত ঐ সমাজের, এক এক সময় আমার মনে হত যে এরা পটলডাঙার

বস্তিবাসীদেরই মতো মাটির সুস্থ রসাস্বাদনে বঞ্চিত, নকলগড় বানিয়ে তার চৌহদ্দির মধ্যে কোণঠাসা হয়ে আছেন। বস্তির বেলায় সমাজ তাদের বঞ্চিত করে রেখেছে, আর এঁরা আত্মম্ভরিতায় নিজেকে নিজেরা দেশের শিল্পসাহিত্য সঙ্গীত অভিনয় যা কিছু দেশজ, সহজ, স্বাভাবিক সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। বস্তির বাসিন্দাদের তবু আশা আছে—ইঙ্গবঙ্গদের দেখলে আমার মনে হত এরা সমাজদেহে কুৎসিত ব্যাধি, আপনারাই আপনার বিষে মরবে। অথচ এই সমাজের যাঁরা ভারতবর্ষে না থেকে বাইরে স্বাধীন কোনো দেশে বসবাস করছেন, যেমন ভায়োলেটদি তার বাবা, মা বোন—তারা একেবারে অন্যরকম। দেশে এলে একান্ত দেশেরই একজন বলে চিনে নিতে ভুল হয় না। কথার মধ্যে প্রচুর বিদেশী বুলির ফুটকড়াই চিটপিট করে ফুটলেও, ভেতরকার খাঁটি জীবটিকে চিনে নিতে দেরি হয় না। আর ভায়োলেটদি? তাং মা দেবা বাদধঃ। বহুভাবে অবস্থিতা নিত্যাকে জ্ঞান-বীর্যসম্পন্ন মানুষ ভজনা করে।

এই জাতীয় কর্তা-সাহেবদের গিন্নীরা কিন্তু সবাই 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' এই মনোভাব পোষণ করেন না। রুণুর মা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। বনেদী কায়েত ঘরের মেয়ে। স্বামীর সাহেবিয়ানা আর বাপের বাড়ির হিন্দুয়ানির সমন্বয় বজায় রেখে চলেন। স্নেহশীলা,—সবাই তাঁকে ভালোবাসে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। বিলক্ষণ রসজ্ঞান আছে। একবার এ. বি. রেলের বড়কর্তা নোলান সাহেবের বাড়ির পার্টিতে তাঁকে বলনাচে যোগ দিতে বলা হয়েছিল, পায়ে ব্যথা বলে কাটিয়ে এসেছিলেন। তারপর কি একটা বৈষ্ণব পার্বণে বোধ হয় রাস কি রথযাত্রা, মনে নেই, বাড়িতে একরাশ সাহেব মেমকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। খাইয়েছিলেন মালপো আর ফলফুলুরি, শুনিয়ে ছিলেন কুড়ি কি পঁচিশ খোল করতাল সহযোগে কীর্তন। খোল করতালের আওয়াজ কমিশনার সাহেবের সু-উচ্চ টিলা থেকে

দু'মাইল দূরে পাহাড়তলি আস্করদীঘি অন্দরকিল্লা পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। কীর্তনিয়ারা নেচে নেচে গান করছিল, অর মিসেস্ দেব সাহেব-মেমদের বলেছিলেন নাচেগানে যোগ দিতে। যা জমেছিল সে আর কহতব্য নয়। একটা বিভাগের প্রধানতম রাজপুরুষের পত্নীর অনুরোধ—সব সাহেব মেম অমান্য করে—সাধ্য কি? ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বীমিশের মেম, আর রেলের সাহেবদের বাড়ির গোটা কত ছুঁড়ি সত্যিই পাছা-কোমর দুলিয়ে কীর্তনিয়া নাচিয়েদের মতো অঙ্গভঙ্গী করেছিল। সে এক রৈ রৈ ব্যাপার।

দেবসাহেব বেট্‌সি দিদিকে ডেকে কি বললেন, শুনতে পেলাম না। দিদি গিয়ে ভায়োলেটকে ডেকে নিয়ে এলেন। ভায়োলেট উঠে এসে দাঁড়াল দেবসাহেবের সামনে। দেবসাহব অনুচ্চ গলায় ভায়োলেটের সাথে কথাবার্তা কইতে লাগলেন।

ভাবভঙ্গী হাত নাড়া থেকে যতদূর পারা যায়, বোঝা যাচ্ছিল যে দেবসাহেব ভায়োলেটের মতিগতির বিরুদ্ধে কিছু বলছেন, হয়ত বলছেন যে তাঁর পরিবারের একজন মান্য বন্ধুর অতিথি কন্যার রাত কাটানো অত্যন্ত দৃষ্টি কটু, বিশেষ করে যাকে উপলক্ষ্য করে এই প্রথা বিরোধী কার্যকলাপ, সে ব্রিটিশ সরকারের শত্রু স্থানীয়।

দূর থেকে দেখলাম, ঘাড় ঝাঁকিয়ে মাথা সোজা করে দাঁড়ালো ভায়োলেট দি। কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বেট্‌সিদি ওর মুখ চাপা দিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাবার সাথে কি কথাবার্তা হলো আমি দূর থেকে শুনতে পেলাম না। দেবসাহেব যেন বিস্মিত বিচলিতভাবে দুহাত ওপরে তুলে ধপ করে নামিয়ে ফেললেন। ভায়োলেটদি তেমনি দৃপ্তভাবে, কি যেন অসীম বলে বলীয়সী হয়ে, অভিমানিনীর মতো বিরুদ্ধ শক্তির সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। একৈবাহং। মুখ ফুটে না বললেও ধরনধারণে প্রতীয়মান হলো সে ছাড়া আর কেউ নেই, সেই সত্য, সে যা বলবে তাই বক্তব্য।

বড় সাহেব কথাই কইলেন না। রুণু প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো।

—তবে যে শুনেছিলাম জাস্টিস্ মল্লিকের ছেলে টুটুর সাথে—

—ভুল শুনেছিলে। এক হাতে তালি বাজে না। আমার মত নেওয়া হয়নি।

—তাই বলে, তাই বলে, একটা অচেনা, অজানা কেমন ফ্যামিলী জানা নেই—মানে,—ছিলে ত ছেলেবেলা থেকে লণ্ডনে, কলকাতায় মাসখানেকও আসো নি—এর মধ্যে

—আমার ভালো লাগা ভালোবাসা, পছন্দ, অপছন্দ, এ সবের জবাবদিহি তোমার কাছে করতে হবে? Do'nt be a cad, Moreover, you are getting bumptious.

রুণু তো তো করতে করতে আমতা করে বলল—Excuse me.

বলে চুপ করে গেল।

বেট্সিদির গলা শুনলাম।

—যতটা অচেনা অজানা ভাবছো, ততটা নিশ্চয় নয়। তা হলে ওর সাথে রিণার,—মানে টুটুর বোনের বিয়ের কথা ওঁরা ভেবেছিলেন কি করে? রিণা ত এখন শুনছি ডাটার সাথে এন্গেজ্ড।

রুণুর বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে। সে কথাই কইল না, দেবসাহেব বললেন,

—তুই কিছু জানিস মনে হচ্ছে। কে এই ছেলেটি?

—আমি এদের কাছেই যা শুনেছি বাবা, তাই বলতে পারি। ছেলেটির নাম যতীন, ওর বাবার নাম বিশ্বেশ্বর রায়, তিনি হাজারিবাগ কলেজের প্রিন্সিপাল। ছেলের বাবা আর ভায়োলেটের বাবা নাকি অতীতে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে একমত হয়ে ছিলেন। মিঃ মিটার সেই কথা রাখতেই কলকাতা এসেছেন, কিন্তু ট্র্যাজেডি, ছেলে কি মেয়ে বাবাদের এইরকম একটা পণ সম্বন্ধে কিছু খোঁজ রাখলেও পরস্পরের পরিচয় জান্তো না। যতীন সাদামাঠা ঘরের

ছেলে, কিং-মেকার আজীবন বিলেতবাসী সানি মিটারের মেয়ের দিকে হাত বাড়াতে সাহস পায়নি। আর ভায়োলেট বে-পরোয়া, যতীনকে ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করবে না সে, শুধু বাবার মনে কষ্ট হবে বলে মুখ ফোটায় নি—

দেবসাহেব প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন,

—সাদামাঠা ঘরের ছেলে? বিশু, মানে প্রিন্সিপ্যাল রায়, পাঁচ বছরের মধ্যে ইউনিভার্সিটির সেরা ছেলে, অক্সফোর্ডের ট্রাইপস্,—সে হল সাদামাঠা? সাহেব নয়। হ্যাঁ বরাবর স্বদেশীর দিকে ঝোঁক, তাও জানি, কিন্তু তার ছেলে—এর চেয়ে বড়ো পরিচয় বাঙালির ঘরে আর থাকতে পারে?

বেট্সিদি বলে চল্‌লো,

—ছেলেও ইয়ুনিভার্সিটির রত্ন, গতবার ফিলসফিতে ফার্স্ট হয়েছে, টেনিস্ চ্যাম্পিয়ন—তাই ত শ্যালো এত খাতির করছে—আর স্বদেশীর দিকে ঝোঁক—সে ত দেখতেই পাচ্ছো বাবা। ভলান্টিয়ারি করতে এসে উণ্ডেড হয়ে পড়ে আছে।

ভায়োলেটও যেন দেবসাহেবের কথা শুনে ঐ বিশাল দীর্ঘকায় রাজপুরুষের মধ্যে আশ্বস্তির পাত্র খুঁজে পেল। তাঁর কাছে গিয়ে কোটের বোতাম ধরে দাঁড়াল। তিনি অগোছালো চুলভরা মাথায় হাত বুলিয়ে থুতনি ধরে মুখখানা উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন,

—মা ভালো আছেন? একটি বোন ছিল না? সে ভালো আছে? ধীরু, মানে সানির চিঠি আমি পেয়েছি কিছুদিন আগে। তোমার মাসখানেক চাটগাঁয়ে কাটিয়ে যাবার কথা ছাড়া আর কিছু নেই তাতে।

ভায়োলেট ঘাড় নেড়ে জানালো সবাই ভালো আছেন।

—হ্যাঁ, ঐ ছেলেটির বাবা, মানে বিশুকে খবর দেওয়া হয়েছে? বিশু আর তোমার বাবা এক ক্লাসে পড়ত,—

দেবসাহেব যেন তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার জীবনে ফিরে

গেলেন। প্রায় নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো স্বপ্ন—এক্ষেত্রে অতীত—চারণ করতে লাগলেন।

—আমরা, এই আমি, সরোজ. তোমাদের জাস্টিস্ মল্লিক. আমরা ছিলাম দু'বছরের সিনিয়র। ধীরুটা কি দুষ্টুই ছিল, আর বিশু ছিল ভীষণ গম্ভীর ভাল ছেলে। কিন্তু দু'জনে কী যে বন্ধুত্ব ছিল বলতে পারি না। অমন বন্ধুত্ব দেখি না। শোয়া বসা ওঠা একসাথে—ধীরু আসত শ্যামবাজার থেকে, বিশু থাকত ইডেন হিন্দু হস্টেলে। হস্টেলের গেট রাত ন'টায় পাকাপাকি বন্ধ হওয়া পর্যন্ত দু'জনে এক সাথে থাকত।

দেবসাহেব মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললেন।

—হ্যাঁ, বিশুকে তার করা হয়েছে?

ভায়োলেট ঘাড় নেড়ে জানালো হয়েছে। বলল,

—বাবাকেও।

গুড। শ্যালো পরিপাটি ব্যবস্থা করেছে দেখছি।

বলে দেবসাহেব এগিয়ে এসে যতীনকে দেখলেন। আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজেছিল যতীন। বাংলোর বারান্দায় সার সার খাটিয়া মশারী দেখে গেলেন। শ্যালোর পুলিশ গাডেরা দু'পা খট্ করে স্যালুট করল। ভ্রূক্ষেপ না করে এক রাউণ্ড ঘুরে আবার ভায়েরর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—ফাইন স্পেসিমেন অফ এ বয়। আনফচুনেট, মোস্ট আন্‌ফচুনেট। বেট্‌সি, তুই থাকছিস্ এদের সাথে?

—হ্যাঁ বাবা।

—খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা?

—সে সব শ্যালো করে গেছে। কোনো ত্রুটি নেই।

—আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

বলে অ্যাবাউট্ টার্ন করলেন—যাবার আগে আবার ভায়োলেটের চুলে হাত বুলিয়ে বললেন,

—কিছু ভাবনা নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল সকালে যে করেই হোক ভালো হাসপাতালে—কুমিল্লার হাসপাতাল ভালো নয়, তবে সিবিল সার্জন গ্রীন-আর্মিট্রেজ ফেমাস্ ডাক্তার। হাস-পাতাল চাটগাঁর বেস্ট। পাহাড়তলির রেলোয়ে, টাউনের সদর, দুই হাসপাতালই ভালো। সদরের সিভিল সার্জন স্যাণ্ডস্ খুব ভালো ডাক্তার—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন সতীশ ঘোষও। চাটগাঁয়েই নেবার ব্যবস্থা করব। ডাটা—এখুনি গিয়ে সুরেশকে তার করে দাও। চাটগাঁর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। রাতেই যেন একখানা সেলুন ডাক্তার ঘোষকে নিয়ে চাঁদপুর রওনা হয়ে আসে। A.B.Ry-র বড়কর্তা নোল্যান এখানেই আছে, ওকে বলছি—ওরাও লগ করে চাটগাঁর রেলোয়ে স্টাফকে জানিয়ে দিক। চলো ডাটা।

এক সঙ্গে এত কথা বলতে দেবসাহেবকে কখনো দেখিনি।

স্নেহের স্পর্শে বোধ হয় লড়ায়ে মনের বাঁধ ভেঙে যায়। ভায়োলেট ফুঁপিয়ে কেঁদে বেট্সিদির বুকে মুখ লুকালো।

আমি যতীনের কাছে গিয়ে বসলাম। দেখি যে যত্নেটা ঘুমের ভান করে ছিল, এখন পিট্পিট্ করে তাকাচ্ছে। চোখের কোল দিয়ে জল গড়াচ্ছে। উঁণ্ডেড—তাই রক্ষে। না হলে এক থাবড়া কশাতাম ওর গালে। বললাম,

—এ যুগের প্রাইজ অ্যাস্,—গাধা, গাধা, গাধা।

—চুপ কর্।

—কেন চুপ করব কেন? পাঁচদিন আগে খোলাখুলি কথা কইলে কোনো কম্প্লিকেশন ঘট্ত না। তা নয়, মনের কথা বুকে চেপে নিজেও ডুবলে, আর একজনকে ডোবালে।

—তুই থাম্।

—তা না হয় থামলাম। এখন ত সব জানাজানি হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝখানে হাসপাতাল, আদালত, সিডিশন, কতো কি দাঁড়ালো এসে।

যতীন অসুস্থ, তাও দৃঢকণ্ঠে বলল,

—আসুক। না হয় জেল খেটে আসব। যা ভালো মনে করেছি, কপুর বাবা কি বলে গেলেন শুন্‌লি না? বাবাও স্বদেশী ছিলেন। আমিও তাই হতে চেষ্টা করছি।

—তুমি জেলে গেলে ভায়োলেটদির কি হবে?

—কাল দাশসাহেব আসবেন।

—আর অম্‌নি তোমাদের সব ছেড়ে দেবে, না?

—আমরা ভায়োলেণ্ট হই নি, মারামারি করিনি, উপোসী কুলিদের জন্যে খাবার এনেছি, বিলিয়েছি, এই ত অপরাধ—

—তোমাদের আন্‌-ল-ফুল্‌ ডিক্লেয়ার করবার পরও তোমরা নড়ো নি।

—সেটা যদি সিডিশন হয়, হয়েছে। যা হবার হবে।

—যা হবার হবে?

ও যে আহত, ভুলে গিয়ে মাথায় চাঁটি মারলাম একটা।

—মনীশ—মন্‌, ও যে ইনজিওর্ড, ও কি করছ?

ভায়োলেটদি কখন থেকে পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। এসে যতীনের শিয়রে বসল। আস্তে আস্তে কপাল মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যতীন কষ্টে একখানা হাত বার করে ভায়োলেটের কোমর জড়িয়ে ধরে চোখ বুজল, বলল,

—ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুমোও। মন্‌, তুই শুগে যা। আমি আছি।

ওরা যেন সেই জগতের বাসিন্দা, যেখানে দু'জন ছাড়া তৃতীয় জনের স্থান নেই। আমি মাথা নীচু করে নিজের খাটিয়ার দিকে চললাম। বারান্দার দেখতে না পাওয়া কোণ থেকে বেট্সিদির গলা শুনলাম,

—শুয়ে পড়্‌, ঘুমিয়ে নে। কাল সকালে অনেক কাজ, ভায়োলেট সময় মতো এসে শোবে'খন, না এলেই বা কি? সাবিত্রী সত্যবানের গল্প জানিস্‌ ত?

—বেট্‌সিদি—সত্যবান যে মরে গিয়েছিল।

—বালাই, ষাট। অত কি ছাই তলিয়ে দেখেছি! তবে ভায়োলেটের ওর শিয়রে বসে থাকা সাবিত্রীকে মনে পড়িয়ে দেয়।

ডাক্তার যে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলেন, তার গুণে যতীন সারারাত অঘোর ঘুমোলো। আমি ভোরে উঠি। সূর্য ওঠবার আগেই তড়াক করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নাবলাম। যতীনের খাটিয়ার দিকে এগোতে দেখি, যতীন প্রশান্ত ঘুমে আচ্ছন্ন, ভায়োলেট শিয়রে স্থির হয়ে বসে, চোখের পলকও বুঝি পড়ছে না। যতীনের মুখের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ, আমার উপস্থিতি বুঝতে পারেনি। আস্তে পিছু হেঁটে আমি সরে এলাম। ভাবলাম, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। কোথায় আর বেওয়ারিস্ ঘুরব, স্টেশনে গেলাম।

বাথরুম সেরে একখানা চেয়ার নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসলাম। কিছু খোলে নি, চায়ের দোকান, ময়রার দোকান! চৌকিদার দফাদারেরা প্ল্যাটফর্ম ঝাড়ু দিচ্ছে। একজন মাতব্বর রেলকর্মচারী যাচ্ছিল, সেটাও ট্যাঁস্। তবে বাংলা বোঝে ও বলে। ও জাতের তিন পুরুষের বাঙালী কেরেস্তানরা সবাই বাংলা বোঝে ও বলে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম,

—কি সাহেব, চা'টা কিছু পাওয়া যাবে?

—বাইরের দোকানের আগেই ফ্রামজী খুলবে, সেখানে যাও, সব পাবে।

ফ্রামজী হলো এ, বি রেলোয়ের পার্সী রেফ্রেসমেণ্ট রুমগুলোর কনট্রাক্টর। সেখানে গিয়ে দেখি উর্দি পরা খানসামা ছোট ছোট তেপাই চারখানা করে ভেনেস্তা চেয়ার দিয়ে ঘেরা, সাজাচ্ছে। ক্রুয়েট, ন্যাপকিন গোছ করে রাখছে কতকগুলোর ওপর।—যারা ছোট হাজারী খাবে তাদের জন্য। বাকী কয়েকটার ওপর শুধু ফুলদানি—ফুলদানি সব টেবিলেই—সেখানে যারা স্রেফ চা খাবে তারা বসবে।

ম্যানেজার তখনো এসে অভ্যস্ত জায়গায় বসে নি। পাণ্ডা গোছের একজন খানসামাকে ধরে চায়ের হুকুম দিলাম। নিজের খাওয়া হলে, তাকেই মুরুব্বী পাকৃড়ে ব্যবস্থা করলাম তিন চার জনের মত ব্রেকফাস্টের। লোক দিয়ে সঙ্গে দেবে—স্টেশন মাস্টারের বাংলোয় পৌঁছোনোর জন্যে। কমিশনার সাহেব, পুলিশ সাহেব এঁদের অনেক রাত পর্যন্ত আনাগোনা, স্টেশন মাস্টারের বিতাড়ন. এসব ঘটনা ছোট জায়গায় কারো অজানা নয়। মাস্টারের বাংলোয় যাঁরা আছেন, তাঁরাও কেউকেটা, এ বোধ সবায়ের মনেই এসে গেছে, বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

হু'টো পেল্লায় ট্রে হাতে হু'জন বয়ের সাথে বাংলোয় পৌঁছতে ভায়োলেটদি উঠে এল। ফিস্ফিস্ করে বলল,

—ঘুমোচ্ছে। তুই একটু বোস। আমি হাতে মুখে জল দিয়ে আসি। বেট্সিদি এখনো ওঠে নি, ওঠাব ?

—উঠিয়ে দাও। না হলে চা জুড়িয়ে যাবে।

—আচ্ছা। এই বেয়ারা, মেরে সাথ আও।

ভায়োলেটদি চলে গেল। আমি যতীনের খাটে বসলাম না. পাছে ঝাঁকি লেগে উঠে পড়ে। কাছেই মেঝেতে বসে পড়লাম।

তখন সূর্য উঁকি দিয়েছে। কিন্তু রোদ এসে যতীনের গায়ে পড়েনি। বিরাট বিরাট গাছ, তার মধ্যে ফুলন্ত গাছও আছে। জ্যাকারাণ্ডা, ক্যাসিয়া, নডেসা কেষ্টচূড়া—কেয়ারী করে পূর্ব দিকে পাহারা দিচ্ছে। অনেক পাখি একসাথে বিভিন্ন পর্দায় গান ধরেছে —ঐকতান মন্দ লাগছে না। কিন্তু কোনো একজনার বিশেষ কেরামতি কানে আসছে না তখনো। হঠাৎ দূর থেকে চোখ গেল পাখির সুরেলা আর্তনাদ কাছে আসতে আসতে থেমে গেল।

পাখির ডাকেই বোধ হয় যতীনের ঘুম ভেঙে গেছল। ওর গলা শুনলাম।

—হ্বাই, ভায়োলেট—

আমি উঠে কাছে গিয়ে বললাম,

—এখ্খুনি হাত মুখ ধুতে গেছে। সারারাত শিয়রে জেগে ছিল।

—জানি।

—কেমন লাগছে বল। বুকের ব্যথাটা ?

—বেড়েছে।

আমি কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেলাম। দেখলাম তোয়ালে আর এক জগ জল হাতে ভায়োলেট আসছে।

—উঠে গেছ ? জিৎ, নোড়ো না, আমি মুখচোখ পরিষ্কার করে দিই।

নিপুণ হাতে তোয়ালে ভিজিয়ে যতীনের বাসি মুখ পরিষ্কার করে দিয়ে বলল,

—ঐ চা আসছে।

একজন বয় ছোট একটা কর্নার টেবিল বেয়ারা হাতে ট্রে নিয়ে এসে গেল। বিছানার পাশে টেবিল বসিয়ে তার ওপর ট্রে রাখল। ঢাক্‌না উঠিয়ে চা ঢালতে যেতে ভায়োলেট বলল,

—ছোড় দো। মন্, তুই চা'টা ঢাল। আমি ওকে একটু উঁচু করে ধরে বসি, তা না হলে ত খেতে পারবে না।

খানসামাকে বলল বেট্‌সিদিকে চা খাইয়ে আসতে।

আস্তে যতীনের মাথা তুলে ধরে বুকের ওপর রাখল। দু'হাত কাঁধের তলায় দিয়ে আস্তে উঠিয়ে বসাল। বলল,

—লাগছে ?

—না।

কিন্তু ওর মুখের দিকে বিবর্ণ ভাব লক্ষ্য করে ভাবলাম, লাগছে নিশ্চয়, কিন্তু বলছে না। পরম আশ্রয় পেয়ে গেছে, ছাড়তে চাইছে না।

আধা সেদ্ধ ডিম দুটো সুরুৎ করে খেয়ে নিল। পিরীচে চা

ঢেলে ঠোঁটের কাছে ধরে ধরে এক পুরো পেয়ালা খাইয়ে দিলাম। শক্ত জিনিস—টোস্ট, মাছের ফ্রাই—এগুলো খেতে পারল না।

ভায়োলেট আবার ওকে শুইয়ে দিল।

আমি বললাম,

—ভায়োলেটদি, বেট্‌সিদিকে এ খানসামা ঠেকিয়ে দিলে, নিজে যাও একসাথে বসে খেয়ে এসো গে। আমি বসছি।

ভায়োলেট উঠে যেতে আমি উঠে গিয়ে চেম্বার পট এনে যতীনের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিলাম। নিজেই আবার নিয়ে গিয়ে বাথরুমে রেখে এলাম।

এসেই দেখি ভায়োলেট এসে গেছে। বলল,

—তুই যা, বেট্‌সিদি ডাকছে। কিছু খেয়ে নি'গে যা, আমি বসছি। আর শোন, খেয়ে-দেয়ে খোঁজ নিয়ে আয়, চাটগাঁ থেকে সেলুন আর ডাক্তার পৌঁছল কিনা।

আমি যেতেই বেট্‌সিদি বললেন,

—আয় ভাই আয়। হ্যাঁরে, মেয়েটা কি ঠায় সারারাত বসে ছিল? একটুও চোখ বোজেনি?

—না দিদি, একেবারে না।

বেট্‌সিদি নিজের মন গড়া ভগবান নিশ্চয় মানেন। অথবা চিরাচরিত কালী, দুর্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর। দু'হাত জোড় করে কপালে ঠুকতে ঠুকতে বললেন,

—ভগবান, ছেলেটাকে ভালো করে তোলো।

ফুল ভোর, হ্যাঁ ফুলেরই ভোর সেটা। গেটের মাচান মর্নিং গ্লোরি গাছের পাতা প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সরু লাল রাস্তাগুলোর দুধারে সার দিয়ে ভার্বিনা, স্নোড্রিফট্ থোকা থোকা ফুটেছে। কমপাউণ্ডওয়ালের পাশ দিয়ে রঙ্গন আর ক্যানার লাইন। তেকোনা ইটের বেড়ের মধ্যে শস্তা অথচ সুগন্ধ গোলাপ, অ্যাডভোকেট, এতোয়াল-দ্য-ফ্রাঁস, অজস্র ফুটেছে। ভার্বিনা আর গোলাপের গন্ধ

মিশে ভারী মিষ্টি সকাল সেটা। পাহারাদার ইউক্যালিপটাস্ ক্যাসিয়া জাকারাণ্ডা সগর্বে মাথা উঁচু করে চারধার ঘিরে রেখেছে। মনখুশী সুপ্রভাত, খুশীর আমেজ বুঝি আমাদের মনকেও আলগোছে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

বেট্সিদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন,

—যা ছুঁড়ি যা। ছাপছন্দ হয়ে আয়। বাবা ভার নিয়েছেন, আর ভাবতে হবে না। চাটগাঁ থেকে ডাক্তার ওষুধ এলো বলে। আমি আর মনীশ বস্ছি।

আমি চট্ করে যতীনের শিয়রে গিয়ে বসলাম। প্রায় ধাক্কা মেরেই ভায়োলেটদিকে উঠিয়ে দিলাম।

—ধাক্কাচ্ছিস্ যে বড়ো?

—বেশ করছি। না হলে তুমি উঠবে না। আয়নায় মুখ দেখে এসো গে যাও। রাজ্যের দুর্ভাবনায় চাঁদমুখ মেঘলা হয়ে আছে, ও দেখলে যতীন আরো মুচড়ে পড়বে।

বেট্সিদি বললেন,

—কথার বাঁধুনি কি ছেলের। ওঃ, তুই ত আবার গল্প-টল্প লিখিস্। ওর সঙ্গে কথায় পারবিনি হুবাই, যা ভাই, স্নান কর জামা কাপড় ছেড়ে ফিট্ফাট্ হয়ে আয়। বাবার খবর এলেই ত চাটগাঁ রওনা দিতে হবে।

ভায়োলেটদি আমার কান মলে দিয়ে উঠে গেল।

—দেখলে দিদি তোমার হুবাইয়ের কাণ্ড

—ওর বুকের মধ্যে কি কাণ্ড হচ্ছে, বুঝিস্? তোর কান মুলে দিল, এত ভালো লক্ষণ রে। মানে স্বাভাবিক হচ্ছে। আর কান মলা খেয়েও ত তোকে সত্যিকারের ব্যাজার ঠেক্ছে না, মনে হচ্ছে খুশীই হয়েছিস্।

বেট্সিদির সত্য ভাষণ আমতা আমতা ভাষণ করে হজম করলাম। কানে একবার হাত বুলিয়ে নিলাম শুধু।

যতীন যেন কি বলবে, উস্‌খুস্‌ করছে। ওর মুখের কাছে কান নামিয়ে ধরতে প্রায় অস্ফুট গলায় বলল,

—আমাকেও ওই করেছে সারারাত। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলছে। এই চুমো খাচ্ছে, এই চুল ধরে টেনে দিচ্ছে—

—তুমি হলে আপনার জন, তোমাকে যা খুশী তাই করবার অধিকার আছে। ভালো হয়ে ওঠো না একবার। ওই ডায়নার হাতে কতো হেনস্তা হয় দেখো। তা বলে আমি নিস্পর—

—পর মনে করলে তোর গায়ে হাত দিত নারে, তোকে ছোটো ভাইয়ের মতো ভালোবাসে।

মেয়েরা চোখের সামনে কারো গুজ্‌গুজ্‌ করে কথা কওয়া সইতে পারে না। বেট্‌সিদি হাঁক ছাড়লেন।

—বলি কি সলাপরামর্শ হচ্ছে দু'জনে? ওটা রুগী, সে খেয়াল আছে? ভায়োলেট এলে আস্ত রাখবে না তোকে, বলে দিচ্ছি।

সেটা বাস্তব ভয়েরই ব্যাপার, বিলক্ষণ মানলাম। ওই শ্রীহস্তে আমার চুলের গোছা ধরে টান দিলে নিদারুণ বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটবে। আমি আবার সে সময় লম্বা চুল রাখতাম। ঘাড়ের দিকে নয়, কপালের দিকে।

যতীন জেগেছে, আমার সাথে কথা কইছে—বেট্‌সিদির পক্ষে আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়। বললেন,

দেখ ত, কি সব বাধিয়ে বসলে ভাই। দু'জনায় ভাব হয়েছে. করণীয় ঘর, ভালোয় ভালোয় দু'হাত এক হয়ে যেতো, তা না— মায়া মাসীর পাল্লায় পড়ে সিডিশনের আসামী সেজে বসে আছ। মায়া মাসীকেও বলিহারি যাই বাবু—কত চ্যাংড়া ছেলের মাথা যে আজ পর্যন্ত খেলো! নিজে কিন্তু পলিটিক্‌সের ধার কাছ দিয়ে ঘেঁষে না—সোশ্যাল ওয়ার্কার! জোয়ান জোয়ান ছেলেদের মাথা চিবিয়ে খাবার জন্যে ভেক ধরে বসে আছে! রাক্ষুসী!

বেট্সিদিকে আমার খুব ভালো লেগে যাচ্ছে। সনাতন বাঙালীর মেয়ে, তা হোক্ না বাপ আই সি এস, সোয়ামী ব্যারিস্টার! জমিয়ে পরনিন্দা পরচর্চা করতে পেলে আর কিছু চান না। মনে-মনে ভাবলাম, একটা গাল গুণ্ডি পানের বোঁদলায় ফুলো হয়ে থাকলে আরও মানাতো। আর হাতে পানের বাটা।

ভায়োলেটদি যখন ফিরে এলো, তাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। পার্সী শাড়ির মতো আলগা পাড় বসানো সাদার ওপর সাদা কাজ করা ভয়েলের শাড়ি পরেছে। ডানাকাটা মানে কাঁধ পর্যন্ত আসে, এমনি সাদা জামা—যে স্টাইল বহুকাল পরে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত চালু করেছিলেন,—ভিজে চুলের গোছা মোচড়ে বাঁ কানের দিকে ঢিবি করা। তাকালে চোখ ফেরানো শক্ত—রংবেরঙি ফুলে ভরা লনে প্রথম সূর্যোদয়ে রবীন্দ্রনাথকে পালটে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, "কোন দেবী তুমি আনিলে দিবা!"

এসেই আমার মাথা পেছন থেকে দুহাতে ধরে শুঁকে দেখল। বলল,

কি তেল দিস রে, ভারী সুন্দর গন্ধ ত তোর চুলে—

—আমি তেল সাবান কিছু মাথায় দিই না।

—সে কিরে, তবে গন্ধ এলো কোত্থেকে?

নিজের মাথা নিজে শোঁকা যায় না। কাজেই গন্ধ আছে কি নেই, থাকলেও কেমন গন্ধ, ও বিষয়ে নিরুত্তর থাকা ছাড়া আমার গতি নেই। বেট্সিদিও এসে শুকলেন। বললেন,

—সত্যিই ত খুব নরম একটা গন্ধ, ভারী ভালো?

ভায়োলেট গন্ধের প্রসঙ্গ থেকে এক লহমায় প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল,

দেখি দেখি—আহা, কানটা ত সত্যিই লাল—মানে বেগুনি—তুই কালো কিনা—হয়ে আছে! খুব লেগেছে, না রে?

পারলে ঠাস্ করে চড় কশাতাম ওই শ্রীমুখে।

চোদ্দ সাইজের টেনিসর‍্যাকেটের হাতল যার মুঠোয় ম্যাজিক

দেখায়, তার বোম্বেটে আঙুলের কামুটি যে না খেয়েছে, সে তার মর্ম কি বুঝবে। আমি কথাই কইলাম না।

আমার কানে হাত বুলিয়ে আদর করে বলল,

—ওঠ্ মন্—আমি বসছি। যা না ভাই, একবার খোঁজ নিয়ে আয় চাটগাঁর ডাক্তার এলো কিনা।

গলায় মধু ঢালা—কার সাধ্যি রাগ পুষে রাখে। একটা কিছু বলতে গিয়ে, ঢোক চিপে, শুধু ঘাড় নাড়লাম।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে ভায়োলেট।

—তুই যে মেয়েমানুষেরও অধম রে—

—চোখের কোলে জল চিক্‌চিক্ করছে! না, তোকে দিয়ে আর পারা গেল না।

বলে আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল। আমি বিষ্টির পরে নিমরোদ ওঠার মতো হাসি জাতীয় ঠোঁট ভঙ্গী করে রওনা দিলাম গেট বরাবর।

পেছন থেকে ভায়োলেটের গলা শুনলাম,

—নো রিগ্রেট্‌স, কম্‌রেড। অন্যের বেলায়ও।

আমি পেছন ফিরে দেখলাম, যতীনের কানের দিকে হাত বাড়াচ্ছে।

এবারে আর নিমহাসি নয়, তরতাজা হাসির ফোয়ারায় মন, মুখ ধুয়ে গেল। হেসে এগোতে যাচ্ছি, দেখি দূরে দীর্ঘকায় দেবসাহেব, সঙ্গে শ্যালো আর একজন টাক মাথা মাঝবয়সী ভদ্রলোক আসছেন। আমি গেটের পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ওপরওয়ালার সাথে একত্র থাকলে অধীনস্থ অফিসার আগে কথা কন না। শ্যালোও কথা কইল না, শুধু গুড্‌মর্নিং জানাল। টাকমাথা ভদ্রলোক কাছে আসতে চিনলাম। চাটগাঁর ডাকসাইটে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন সতীশ ঘোষ। তিনি কিছু বলবার আগেই দেব-সাহেব মৃদুস্বরে বললেন,

—কেমন আছ সব ?

মাথা নেড়ে জানালাম, ভালো।

সতীশ ঘোষ ঘোর বাঙাল, বাবার বন্ধু, আমাদের ছেলের মতো দেখেন। দেবসাহেব এগিয়ে যেতেই বললেন,

—ছ্যামরা, তুমিও আইয়া জুটছ ? খুন-খারাবী দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধলেই তুমি থাকবা না ? কপাল ফাটাইছ নাকি ?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, না। একবার ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় কংগ্রেস ভলান্টিয়ার দলে যোগ দিয়ে ভাটিয়া ভলান্টিয়ারদের সাথে মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছিলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারের স্পেশাল কংগ্রেসে। সেই কথার উল্লেখ করলেন ডাক্তার ঘোষ।

পথ চলতে চলতে কথা হচ্ছিল। শ্যালো বলল,

—হাউ ইজ রে ?

সতীশ ঘোষের দিকে চোখ দিয়ে দেখিয়ে বললাম,

—ডাক্তার দেখলেই বুঝতে পারবেন। বেশী কথা বলছে না। একটু লো মনে হচ্ছে।

ততক্ষণে আমরা যতীনের পাশে পৌঁছে গেছি। খানসামারা বেতের চেয়ার এনে দিয়েছে বাংলার ভেতর থেকে। সবাই তাতে বসলেন। বেট্‌সিদি দেবসাহেবের চেয়ার ঘেঁষে পেছনে এসে দাঁড়ালেন, ভায়োলেট অমনিই দাঁড়িয়ে রইল। দেবসাহেব পাশে একটা খালি চেয়ার টেনে বললেন,

—বোসো মা। বেট্সি, তুইও একটা চেয়ার টেনে বোস্। ডঃ ঘোষ—

কিছু বলবার আগেই সতীশ ঘোষ যতীনের পাশে বসে পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। হাত তুলে ধরে, কনুই ভাঁজ করিয়ে, বুক ঠুকে নানাভাবে পরীক্ষা করছেন। যতীন মাঝে মাঝে উঃ আঃ করে উঠছে আর ভায়োলেট সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে। দেবসাহেব শক্ত হাতে ওর হাতের মুঠো ধরে আছেন, বলছেন,

কিছু ভয় নেই। ডঃ ঘোষ খুব কম্‌পিটেণ্ট সার্জন। পরীক্ষার সময় এক আধটু লাগবে—ওতে ভয় পেয়ো না তুমি।

পরীক্ষার পর ডঃ ঘোষ ঢাকাই বাংলা ও ইংরেজির জগা খিচুড়িতে যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো যে বাঁ দিকের বুকের তিনটে রিব ভেঙেছে। এবং আশঙ্কা করছেন যে ইণ্টারন্যাল হেমারেজ হচ্ছে। টেম্পারেচারও রয়েছে। আর একটুও দেরি না করে অবিলম্বে চাটগাঁ সদর হাসপাতলে নেওয়া দরকার। হালার রেল কোম্পানি নাকি মগজ খাটাইয়া সেলুনের লগে অ্যাম্বুলেন্স কারও জুইরা দিছে, অল্প কিছু যন্ত্রপাতি ও স্ট্রেচার আছে সেইখানে। অখন লণ্ডনের বন্দোবস্ত যত ঝটপট করা যায়, তত ভালো।

সতীশ ঘোষের বাচনভঙ্গীর সাথে দেবসাহেব পরিচিত। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিলেও গাম্ভীর্য টেনে এনে বললেন,

—তবে আর দেরি কেন। স্ট্রেচার আনতে লোক পাঠাও।

রাত্তিরের দুজন পুলিস গার্ড ছিল। শ্যালো গিয়ে তাদের হুকুম দিয়ে এল।

ভায়োলেট আমাকে বলল,

—দি ডক্ স্পীক্‌স লাইক দি কিরাওয়ালা ইন্ দি স্টীমার—ডু দে কাম ফ্রম দি সেম্ পার্ট অফ্ দি কাণ্ট্রি?

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

ভায়োলেট বলল,

—কিন্তু বাবা এলেন না, ওর বাবাও এলেন না, যতীনকে নিয়ে গেলে আমি সাথে যাবই, এসব অ্যাড্‌জাস্টমেণ্ট—

দেবসাহেব বাধা দিয়ে বললেন,

—তার করেছ কালকে ত? আজকে সানি আসবে। কাল বিশু। তুমি সেলুনে চলে যাও, বেট্‌সি আর মনীশও যাক্। পেশেণ্টকে ডাক্তার যেখানে ওঠাবার ওঠাবেন। তুমি বেট্‌সির সাথে আমাদের ওখানে চলে যেও। বেট্‌সির মা আছেন, কোনো

অসুবিধে হবে না। সানি আর বিশুকে নিয়ে আমরা কাল, কি পরশু যাচ্ছি।

—ডাক্তার ওকে যেখানে ওঠাবার ওঠাবেন, আমি সাথে থাকতে পাব না?

শ্যালোতে ডক্টর ঘোষ আড়ালে কথাবার্তা হচ্ছিল। ডক্টর ঘোষ এগিয়ে এসে বললেন,

—হগল বন্দবস্ত্‌ই কইরা দিমু, তোমার লগে থাকনেরও। অখন অরে লইয়া না গেলে if may be too late.

—ওর কাছে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন?

—কইলাম ত, দিমু।

—তবে চলুন, যাই।

স্ট্রেচার এলো, যতীনকে চৌকিদারেরা বয়ে নিয়ে গেল সেলুনে। বেট্‌সিদি, ভায়োলেট ও আমিও গেলাম।

শ্যালো পুলিশ গার্ড সঙ্গে নিতে ভোলেনি।

দেবসাহেব বললেন,

—তোমাদের ট্রেনে খাবার ব্যবস্থা ডাটার ওখানে করিয়ে গাড়িতে পাঠাচ্ছি।

বলে তিনি ফিরে গেলেন।

আমরা সবাই স্ট্রেচারের সাথে সাথে গিয়ে পৌঁছলাম। ট্রেন বলতে একটি ইঞ্জিন, অ্যাম্বুলান্স, সেলুন আর গার্ডের গাড়ি। সেলুনটি একটি এলাহি ব্যাপার। দুজনের মতো শোয়ার ব্যবস্থা, লেখাপড়া করবার টেবিল, অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম, আলো, পাখা, কিছুরই অভাব নেই। তখন ইলেক্‌ট্রিসিটি ব্যাপক হয়নি, কিন্তু সেলুনে অ্যাম্বুলেন্সে নিজস্ব জেনারেটর দিয়ে পরিপাটি ব্যবস্থা করা আছে।

যতীনকে সেলুনে না উঠিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠালো। কামরার মাঝ বরাবর উঁচু তক্তপোশের মতো আসবাব একটা, তার

ওপর স্ট্রেচার রাখল। দেয়ালগুলো ওষুধের কাবার্ডে ছাওয়া—এক কোণায় একটা ডিস্‌পেন্সিং টেবিলও আছে। অন্য সবার বসবার জন্যে কোচ কেদারা কিছু নেই, অনেকগুলো গোল টুল।

যতীন, ডাক্তার আর ভায়োলেট অ্যাম্বুলেন্সে গিয়ে উঠলো, আমি বেট্‌সিদি সেলুনে। পুলিশ গার্ড দু'জন অ্যাম্বুলেন্সে। আমি কিছুতেই সেলুনে থাক্‌ব না ভাবছি, আবার এও ভাবছি বেট্সিদিকে একা ফেলে চলে গেলে কেমন হবে। এ সংশয়ের সমাধান বেশ ভালোভাবেই হলো, যখন দেখলাম ডাটার বাংলো থেকে খাবার নিয়ে দু'জন আর্দালী আসছে, আর তার সাথে আসছে রুণু আর ছোট বোন বেবি। একটা লোক ব্যাগ, ভ্যালিস্‌ বয়ে আনছে দেখে বুঝলাম ওরাও যাচ্ছে আমাদের সাথে।

আমি গিয়ে ডক্টর ঘোষকে বললাম,

—আমিও যেতে চাই অ্যাম্বুলেন্সে।

—চল, তবে ঠায় বইয়া থাকতে হইবো কইল। খান কতক খারা খারা টুল, শোওনের জায়গা পাবি না। মাইয়াডারে লইয়া যে কি করি অহন—

—ভায়োলেটদির জন্যে ভাববেন না। ও কাল সারারাত সোজা জেগে ছিল যতীনের শিয়রে, আজও দরকার হলে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যতীনকে চোখ ছাড়া করবে না কিছুতেই।

—বুজছি—তবে পেশেণ্টএর কণ্ডিশন ক'ইল খুব হোপফুল না—টেম্পারেচার বারতেই আছে। কষ্টও পাইতেয়াছে মনে লয়, মুখ খান থাইকা থাইকা কেমন করতেয়াছে ছাখ। দেহি, একটা মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়া দেই, ঘুমাউক খানিকক্ষণ।

মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল।

আমাদের দু'জনের কথাবার্তা ভায়োলেটদি কিছু শোনেনি। সে একটা টুল নিয়ে যতীনের মাথার কাছে বসেছে। ডাক্তার ইনজেক্‌শন দেবার সময় বলল,

—দেখুন, বেশী যেন লাগিয়ে দেবেন না।

—মাইয়া ভারি ফাজিল দেহি—বিড়বিড় করে বলতে বলতে সতীশ ঘোষ বললেন,

—ডর নাই। লাগবো না। ঘুমের অষুধ দিলাম।

ওদিকে সেলুনে বেবি রুণু বেট্‌সিদি কলকল করে কথা বলছে। আমি আমার শতরঞ্জি জড়ানো পোঁটলাটা আনতে যেতে বেট্‌সিদি বললেন,

—তুইও ওদের সাথে নাকি?

—হ্যাঁ দিদি।

রুণু বলল,

—হুবাই কেন ওখানে আন্‌কম্‌ফর্টেবল হচ্ছে বুঝি না। ওখানে বসবার কিছু নেই খালি কতকগুলো টুল।

—হুবাই ওখনে সবচেয়ে কমফর্টেবল হচ্ছে। কেন হচ্ছে রুণু, সে বোঝাবার ক্ষমতা তোর নেই। তোদের কারু নেই, শুধু মনীশটা বোধ হয় বুঝেছে। যা মনীশ, কাছে কাছে থাকিস। স্টপেজগুলো গার্ডকে বলে দেওয়া হয়েছে?

বেট্‌সিদির কথার জবাবে আমি বললাম,

—হ্যাঁ, শুনলাম ত। ফেনী, ধুম, সীতাকুণ্ড তার পরেই চাটগাঁ। আর কোথাও দাঁড়াবে না। বেলাবেলি পৌঁছে যাবে, আড়াইটে তিনটের মধ্যে। যতীনকে আবার হসপিটালে নিতে হবে—সেখানে মেজর স্যাণ্ডস অপেক্ষা করবেন।

বেট্‌সিদি বললেন,

—এখন ভালোয় ভালোয় পৌঁছি, ত সর্বরক্ষে।

বলে বেট্‌সিদি কপালে জোড় হাত ঠেকালেন।

বেবি একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল,

—দিদি ইজ্ গেটিং টুবি অ্যান আইডোলেটর। হাউ ফানি!

ঘৃণা মেশানো বিষ দৃষ্টিতে বেবির দিকে চেয়ে আমি বললাম,

—দিদি ট্যাঁসফিরিঙ্গি বনে যায় নি, ফানি ত বটেই। কালী-দুর্গা কেষ্ট শিব ছেড়ে যিশুর ভজনা শুরু করেনি এখনো, তোমার মতো ছোট বোন থাকতে, অহো, কি দুর্দৈব!

বেবি জাতীয়ারা আমাকে কোনো দিন মানুষ বলেই গণ্য করে নি, কথাবার্তাও কচিৎ কখনো কয়েছে আমার সাথে। আজ চুপ করে থাকতে পারলে না বলল,

—ডোণ্ট বি পার্সন্যাল,—অ্যাণ্ড, অ্যাণ্ড, ইনসাল্টিং।

—স্টেটমেণ্ট অফ ফ্যাক্টস। অপমান করবার কথাই ওঠে না। যাই, একজন জাত সাহেববাড়ির মেয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্সে—সেখানে যাই।

বেট্সিদি বললেন,

—তুই বড়ো ছেলেমানুষ রয়ে গেছিস বেবি, কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়ে বসিস।

—আমি ঝগড়া বাধালুম? ঠেস দিয়ে চিপটেন কাটবে একজন, আর আমি চুপ করে থাকব?

বলতে বলতে বেবির চোখ জলে ভরে উঠল। অপমানে নয়, ওর নিজের দিদিও ওর দিকে নেই দেখে।

আমি বললাম,

—এত মুশকিল মন্দ না! দিদি বকুক, ঝকুক, যাই করুক, কিন্তু টিনএজারদের চোখে জল আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

বলে রওনা দিলাম।

যেতে যেতে শুনলাম, বেবি বলছে,

—দেখলে দিদি, আরেকবার ইনসাল্টিং কথা বলে গেল? আমি টিনএজার? কচি খুকি?

এবার আর চোখে জল নয়, রাগেই বোধ হয় টাইট ফ্রকের তলায় বুক দুটো ধড়াস ধড়াস করছে। বেবির বয়স সঠিক জানা ছিল না, তবে কুড়ি একুশের নিচে নয়, এটা চেহারাতেই মালুম।

আমি নিছক খ্যাপাবার জন্যে টিনএজার বলেছিলাম। আর লক্ষ্য করেছি ধুমসি অবিবাহিতো মেয়েদেরও ও সমাজে মা'রা কচিখুকি বলে চালিয়ে দিতে উৎসুক, জামা-কাপড়ও পরান সেই মাপে, ডাকেন 'Pussie durling' বলে। অসহ্য।

হসপিটাল কোচে এসে দেখি, ডঃ ঘোষ টেম্পারেচার নিচ্ছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

—রাতে টেম্পারেচার নেওয়া হয়েছিল ?

আমি ভায়োলেটের মুখের দিকে তাকালাম। সে বলল,

—সাহেব ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে গিয়েছিল বটে, তবে আমি ত সারাক্ষণ কপালে হাত দিয়ে থেকেছি, রাতে জ্বর হয় নি বলে মনে হয়।

কথা শেষ হবার আগেই সতীশ ঘোষ খিঁচিয়ে উঠলেন ওঁর চিরা-চরিত পদ্মাপারের ভাষায়।

—মনে লয়! ছাই মনে লয়। ডাক্তারি ডাক্তারগো উপর ছাইরা দিলেই ভালো করতেন মা ঠারাইন, নিজের হাতে লওনের কাম কি আছিল! পোলার রাত্রেই তাপ উঠছে—অখনত জ্বর আছেই।

বলে থার্মোমিটার মুখ থেকে বার করলেন ডঃ ঘোষ।

—এই ত একশ ডুই পয়েণ্ট চাইর, মানে কথা একশ-চাইর, মুখের তাপ এক ডিগ্রী বাদ দেওন লাগে। যাউক, ব্যাজার হইবেন না, লগে অষুধ আছে। কিছু ভাইবেন না, আর কাঁইদা কাইটা ভাসাইবেন না। থার্মোমিটার ডা ধুই রাখ ত মাস্টার—

বলে থার্মোমিটার আমার হাতে দিলেন।

চোখের জল যেন আমার পেছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ও কামরায় একজনকে ফেলে এলাম, এখানে ইনি শুরু করলেন। ভায়োলেটদি নির্বাক, শুধু চোখের জলে দু'গাল ভেসে যাচ্ছে।

ডঃ ঘোষ এবার 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'তে নেমেছেন।

—কাইন্দো না মাইয়া, রুগী নার্ভাস হইব। আর কি করতা

তুমি, রাইতে জ্বর আইছে জানলেও? যত শীঘ্র সম্ভব আমরা আইয়া পরছি—যা করনের আমরাই করুম। যাও, ঐ কোনডাতে ওয়াশবেসিন আছে, মুখে চোখে জল ছিটাইয়া আস গিয়া।

ভায়োলেটদি বোকা নয়, উঠে গিয়ে চোখ মুখে জল দিয়ে ভব্য হয়ে এসে বসল। ডাক্তার ঘোষ ওষুধের কাবার্ডে একটা ইনজেকশন তৈরী করতে লেগে গেলেন।

গাড়ি এখনো ছাড়ছে না। বেলাও বাড়ছে। এঞ্জিন থেকে স্টীমের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আমি চট করে নেমে গার্ডকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম। গার্ড বলল,

—কমিশনার সাহেব আসবেন, তিনি এলে গাড়ি ছাড়া হবে।

ডাঃ ঘোষ বললেন,

ততক্ষণ না হয় তোমরা ঐ কামরায় গিয়া অগো লগে কথাবার্তা কও। ডর নাই, আমি ত আছিই।

অনিচ্ছুক ভায়োলেটকে হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে আমি আবার বেট্‌সিদিদের কামরায় এলাম।

সদ্য কান্নাধোওয়া পদ্মপলাশ বেট্‌সিদির চোখ এড়ায় না। বলেন,

—কি লো ছুঁড়ি, কেঁদে ভাসাচ্ছিলে বুঝি? ঘোষের মতো ডাক্তার এ তল্লাটে নেই, শুধু বড্ড ঠোঁটকাটা, আর ঘোর বাঙাল। কিন্তু ওঁর গালাগাল শুনলেই রুগীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ভায়োলেটদি কেমন ধন্দধরা মতো হয়ে গেছে। আপন মনে বিঁড়বিড় করে বলছে,

—থার্মোমিটার ত দিলই, টেমপারেচার নিলুম না! কেন, কেন, কেন! দিদি, জানো রাতেই জ্বর এসেছে, আমি শুধু মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম—

—বেশ করেছিস। রাত্তিরে কাকে পেতিস? জ্বর উঠেছে জানলেও বসে থাকতে হোত, সেই সকালবেলা ডাক্তার না আসা পর্যন্ত!

এই সময় সেলুনের বাইরে অনেক লোকের আসবার আভাস পাওয়া গেল। বেট্সিদির বাবা, ডাটা, রুণু, শ্যালো, সবাই এসে গেলেন। মিঃ দেব বললেন,

—গ্রীন আর্মিটেজ্ ওই ঘরে গেছে। কোনো ভাবনা নেই। সতীশ চার্জ-এ, আমি নিশ্চিন্ত বোধ করছি। আর হ্যাঁ, দু'খানা টেলিগ্রামের জবাব এসেছে। সানি আজই আসছে, বিশু কাল। ওদের চাটর্গা প্রসীড করবার ব্যবস্থা করে আর ব্যবস্থাই বা কি— আমি ত থাকছিই। ওদের নিয়ে আমিই ফিরব। তোমরা ছেলেটিকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও তা'হলে। একস্-রে করতে হবে, দেরি না হয়ে যায়।

বাবা আসছেন আজই, ভায়োলেটদি যেন এক সেকেণ্ড দোটানায় ঘুরপাক খেয়ে মনস্থির করে ফেলল।

—তাহ'লে আর একটুও দেরি নয়, গাড়ি ছাড়বার হুকুম দিয়ে দিন।

শ্যালো দেবসাহেবের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চাইল। দেবসাহেব স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন,

—অফকোর্স। গার্ড নিয়ে অ্যাকম্পানি করছ। তবে ফর্মাল প্রসীডিওর অবজার্ভ করার দরকার নেই। freedom of movement as a normal citizen. Not much of freedom, though. হাসপাতালেই আটকা থাকতে হবে কিছুদিন।

শ্যালো চলে গেল। ও গার্ডের গাড়িতে উঠবে।

ভায়োলেটদি বলল,

—আমি তবে হস্পিটাল কার-এ যাই।

—যদি ডাক্তাররা অনুমতি দেন। মনীশ, যাও ত, জিজ্ঞেস করে এসো।

আমি গিয়ে কালা ধলা দুই ডাক্তারের মত চাইলাম। সাহেব ডাক্তার দোনা-মনা করছিলেন, কিন্তু সতীশ ডাক্তার সাহেবের

মুখের দিকে তাকিয়ে, যেন মনে মনে তার হুকুম নিচ্ছেন, বললেন,

—আছুক না। বইয়াই ত থাকবো ছেমরি!

গ্রীন-আর্মিটেজ লাক্‌সামে নেমে কুমিল্লা চলে যাবেন। তিনি কোনো আপত্তি তুললেন না। আমি ডঃ ঘোষকে নীচু গলায় বললাম,

—আর আমি?

—তুমিও এহানেই থাইকো মাস্টার, কান্দলে টান্দলে মাইয়ারে সামলাইবো কেডা।

—তবে যাই, ভায়োলেটদিকে নিয়ে আসি। রুণুর বাবা বলেছেন, গাড়ি এখনই ছাড়বে।

ভায়োলেটকে আনতে গিয়ে শুনলাম, খানসামারা ফ্রামজি থেকে খাবার-দাবার জিনিস এনে সেলুনের কিচেন ভরছে। দু'দশ মিনিট দেরি হবে। এক রাউণ্ড এমনি চা এ ঘরে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তারদের জন্যেও গেছে। শ্যালো তখনো স্বস্থানে যায় নি, দেবসাহেবরা উঠি উঠি করছেন।

ভায়োলেটদি বললেন,

—বাবা এলে, আর ওর বাবা এলেও, খবরটা,—

—তার করে জানাবো, বললেন দেবসাহেব।

শ্যালো উঠে জঙ্গী কেতায় বিদায় নিয়ে গার্ডের গাড়ির দিকে চলে গেলো। দেবসাহেব ও ডাটাও উঠলেন। বললেন,

—রুণু যাক তোমাদের সাথে। ওর, ওর এখানে কোনো দরকার নেই থাকবার। তোমার মাকে বলে দিও পরশু সানি আর বিশুকে নিয়ে আমি ফিরছি। আর হ্যাঁ,—

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—সুরেশকে সব ডিটেলস্ বোলো। সরকারী খবর পাবেই, তার বাইরে যা সব—

মাথা নেড়ে বিনীতভাবে জানালাম, হাঁ, বলব।

এঞ্জিনের আর্তনাদ শুনে বুঝলাম গাড়ি ছাড়বার জন্যে তৈরী। ভায়োলেটদিকে বললাম,

—চলো।

—আমার ভ্যালিস্‌টা ?

—ও ঘরেই আছে, এখানে আনি নি।

বেট্‌সিদি ভায়োলেটের চিবুক নেড়ে দিয়ে বললেন,—কাঁদিসনি, জ্বালাতন করিস নি, ভগবান আছেন। বেবি বজ্র দৃষ্টিতে দিদির দিকে তাকালো।

গাড়ি ছাড়ল। সোজা থামলো এসে লাকসাম জংশন। এখান থেকে চাটগাঁ আর আসামের লাইন দুভাগ হয়ে গেছে। কুমিল্লা আসাম লাইনে পড়ে। সাহেব ডাক্তার লাক্‌সামে নেমে গেলেন। আমাদের গাড়ির কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, তখুনি আবার ছেড়ে দিল।

'হেনি' 'হেনি' শুনে বুঝলাম ফেনী স্টেশন এসে গেছে। নোয়াখালী যারা যায় তারা এখানে নামে। তা ছাড়া, ফেনী ও একটা সাবডিভিশন। কিন্তু আমাদের গন্তব্য সোজা চাটগাঁ, এখানেও আমরা এক মিনিটের বেশী দাঁড়ালাম না।

ডাক্তার ঘোষ একটা টুলে বসে ঢুলছেন। ঘুম নয়, কর্তব্যে অসাধারণ সজাগ তিনি। এমনিই, আর কিছু করবার নেই এখন, তাই গা ঢিল দিয়েছেন আর কি। যতীন আচ্ছন্ন মতো হয়ে শুয়ে আছে, ভায়োলেটদি মাথার কাছে বসে। গায়ে মাথায় হাত বুলোতে ডাক্তার বারণ করে দিয়েছেন। অজানতে দু-একবার যতীনের মাথার দিকে ওর হাত উঠে যাচ্ছে, আবার সংবিৎ ফিরে নামিয়ে নিচ্ছে। আর টুল নেই আমি কখনো জানালার কাছে দাঁড়াচ্ছি, আবার কখনো মেঝেতে বসে পড়ছি। আমার শতরঞ্জির বিছানাটা মেঝের এক কোণে ছড়িয়ে নিয়ে ছিলাম।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে ডাক্তার ঘোষ বললেন,

মা ঠারাইন, ওই পোলার শতরঞ্জডার উপর গরাইয়া লও খানিক। মাস্টার, তুমি আইয়া টুলে বও। রাইত জাগছে, খানিকক্ষণ জিরাও মা লক্ষ্মী!

ভায়োলেটদি বোধহয় শরীর মনে অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে ছিলো। ডাক্তারের হুকুম শুনে শতরঞ্জির বিছানায় গা ঢেলেই ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নই দেখতে লাগল কিনা কে জানে, ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে থর-থর করে কাঁপতে লাগলো।

ডাক্তার ঘোষ বললেন,

মাইয়া একিবারে নবেজান হইয়া গেছে। মেণ্টাল স্ট্রেস অ্যাণ্ড উওরি। বিশ্রাম না লইলে ব্রেকডাউনও হইতে পারে। অখন, ঘটনাডা কি, কও ত মাস্টার।

রেখে ঢেকে যতদূর বলা যায় আদ্যোপান্ত গল্পটা বললাম। শুনে গম্ভীর মুখে সতীশ ঘোষ বললেন,

—হুঃ, বুঝজি! দেশী-বিলাইতির কাইজ্জা!

তারপর হঠাৎ স্বর আরও গম্ভীর করে বললেন,

—মাইয়া ঘুমাইয়া পরছে ত? হ', অঘোরে ঘুমাইতেয়াছে। পেশেণ্ট কইল ট্রাবল দিতে পারে, বোঝলা মাস্টার। অহন চল ত দেহি, ছবিতে কি কয়। জ্বরডা আইয়াই ত ভাবাইয়া তুলছে।

আমি শঙ্কিত হয়ে বললাম,

—ফেটাল হতে পারে বলে ভয় পাচ্ছেন?

ডাক্তার কপালের রেখা কুঁচকে চুপ হয়ে গেলেন। লক্ষণ খোলাখুলি জবাবেরও বাড়া। আশঙ্কায় ও গভীর বিষাদে আমিও মুহ্যমান হয়ে রইলাম।

ধুম স্টেশনে গাড়ি থামতেই খাবার ডাক পড়ল। ভায়োলেটদিকে তুলে আমরা দু'জন সেলুন গাড়ির দিকে গেলাম। আমাকে একা

আড়ালে ডেকে এনে ডাক্তার বললেন জ্বর আরও বেড়েছে, তবে আর কাউকে যেন না বলি।

বলব কাকে? ভায়োলেটদিকে? সে কথনো নয়। নিজে শুনে নিজের মন থারাপ করা ছাড়া আর কি করতে পারি আমি। অথচ, চোথমুখের ভাব মোটামুটি প্রফুল্ল রাথতে হবে। সেটা খুব শক্ত, তবু পারতেই হবে। অভিনয়ে অভ্যস্ত নই, তবু আর একজনের মনে যাতে দুশ্চিন্তা না জাগে, তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে প্রস্তুত। এই মনোভাব নিয়েই থাবার আসরে পেঁৗছে গেলাম।

রীতিমত কেতাদোরস্ত থানা। সুপ, ফিসফ্রাই, কাটলেট, স্টু, পুডিং। সবাই গোগ্রাসে গিলতে লাগল। ভায়োলেটদি না থেলে নয় এমনি ভাবে, বিশেষ করে বেট্‌সিদির আদরে, যা পারলো কিছু থেল। কিন্তু আমি বেচারা ওদের কেউ নয়, আমার মুথে থাদ্য রুচল না।

—তুই যে থাচ্ছিস না কিছু বড়ো?

—কেমন গা বমি বমি করছে বেট্‌সিদি, থেতে পারছি না।

—ওমা, তাই নাকি! বেবি, ওকে স্মেলিং সলটের শিশিটা দে'ত। নে, শুঁকে এক কোণে চুপচাপ পড়ে থাক।

ভায়োলেটদি বলল,

—মন্, চল ও ঘরে যাই। এবারে তুই বিছানায় শুয়ে পড়িস, আমি মাথার কাছে বসব।

দিদি বললেন,

—সে ত বেশ কথা। তাই যা তা হলে।

আমরা দু'জনে আবার হসপিটাল কারে ফিরলাম। ডাক্তার ঘোষ ততক্ষণ থেয়ে নিয়েছেন। গার্ডের গাড়ি থেকে হাত বার করে শ্যালো জানালো তারও থাওয়া হয়ে গেছে।

গাড়ি আবার ছাড়লো। এবারে থামবে সীতাকুণ্ড, তার পর সোজা চট্টগ্রাম। এথন থেকে লাইনের দুই ধার অতি সুদৃশ্য। ছোট বড়ো টিলা আর পাহাড়, মাঝে মাঝে সমতল সবুজ মাঠ। পশ্চিম

দিকে সমুদ্র যে বেশী দূরে নয় তারও আভাস পাওয়া যায় সীতাকুণ্ডের কাছাকাছি এসে।

আমাকে ভায়োলেটদি শুতে বলেছিল, কিন্তু শোব কি, আমার আকাশ-পাতাল চিন্তা। শতরঞ্চিতে গা ঢেলে চোখ বুজলাম বটে, কিন্তু ঘুমের ধার-কাছ দিয়েও গেলাম না। খালি ভাবতে লাগলাম, যদি ডাক্তারের আশঙ্কা ঠিক হয়, তবে তার পরে কি হবে। মনে মনে আমিও ভগবানকে ডেকে বলতে লাগলাম, হে ভগবান, ওদের বাবাদের আসা পর্যন্ত কিছু যেন না ঘটে।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ চাটগাঁ পৌঁছে গেলাম। স্টেশনে বাবা ত এসেছেনই, তা ছাড়া সরকারী আমলা ফয়সলা অনেক। এদিকে দেখি আমার মা ও বেট্‌সিদির মা দুজনেই উপস্থিত।

ভায়োলেটদিকে বেট্‌সিদিদের বাড়ি যেতেই হবে, সেও অবস্থা গতিকে নিমরাজি। কিন্তু প্রথমে সে যেতে চায় হসপিটালে। একেবারে কোট ধরে বসল।

বেট্‌সিদির মা, আমার বাবা মা, অনেক বুঝিয়ে ওকে রাজী করালেন এখনকার মতো কমিশনারের টিলায় যেতে। বাবা বললেন,

—ঘণ্টাখানেক পর মণি গিয়ে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। ততক্ষণ—সতীশ, X-Ray হয়ে যাবে ত?

ডাক্তার ঘোষ ঘাড় নেড়ে জানালেন হ্যাঁ।

ওঁরা, সঙ্গে শ্যালো আর দু'জন গার্ড, চলে গেলেন হাসপাতালে। আমরাও যে যার বাড়িমুখো হলাম।

বাবা বললেন,

—ছেলেটি বিশুর ছেলে শুনেছি। বিশ্বেশ্বর রায়, আমাদের সময়কার সবচেয়ে ভালো ছেলে। ভারী তেজি; এখন কোথায় যেন প্রিন্সিপ্যাল, তাই না?

জানালাম, হ্যাঁ, হাজারিবাগ কলেজে।

—আর মেয়েটি ? ডি, এন, মিটার মানে সানি মিটারের মেয়ে। আজন্ম বিলেতে।

মা বললেন,

—দুর্গা প্রতিমার মতো চেহারা। দেখলেই সম্ভ্রম করতে ইচ্ছে হয়। চালচলনে মোটেই ফিরিঙ্গি নয় ত !

আমি বললাম,

—কথায় বার্তায় মাঝে মাঝে ইংরেজি বুকনি কাটা ছাড়া ফিরিঙ্গিয়ানার কোন লক্ষণ নেই ওর ! তবে ওর মা বোন ঘোর সাহেব, বাবাকে দেখিনি।

—তোর সাথে এত পরিচয় হলো কোথায় ?

—বা রে, যতীন আর আমি ত এক মেসেই থাকি। ভায়োলেট-ই যতীনকে খুঁজতে এসে আমার পরিচয় বার করে নিয়েছে। ওদের বাড়িতে গেছি একদিন।

—আচ্ছা, বাড়ি চল, সব গল্প খুঁটিয়ে শুনব।

—শোনবার মতোই গল্প। অবাক হয়ে যাবে মা তুমি শুনলে। রীতিমত নাটক, ট্র্যাজেডির দিকে ঝুঁকছে।

—কেন কেন ? ট্র্যাজেডি কিসের ?

—যতীনের বাঁচবার আশা কম।

কথা ছিল ঘণ্টাখানেক পর আমি গিয়ে ভায়োলেটদিকে সাথে করে নিয়ে হাসপাতালে যাব। সেই ঘণ্টাখানেক যেন আর কাটে না।

তিন মাথাওয়ালা ছোটোখাটো পাহাড়, ও অঞ্চলে টিলা বলে, তারই এক মাথার ওপর আমাদের বাসা। ওটার নাম টেম্পেস্ট হিল। প্রশস্ততর আর এক মাথায়, যার নাম ফেরারি হিল, যাবতীয় কোর্ট কাছারি। আর একটা মাথার নাম মনে নেই, সেটায় সিভিল সার্জেনের ডেরা। আমাদের বাংলো থেকে পশ্চিমে ডাব্‌ল মুরিং-এর দিকে তাকালে পরিষ্কার বঙ্গোপসাগর দেখা যায়। চূড়াগুলোর মধ্যে আমাদেরটাই উঁচু।

.ঐ তিন মাথাওয়ালা পাহাড়টাই শহরে সবচেয়ে বিস্তৃত প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ দখল করে আছে। উত্তর থেকে পূব বরাবর রাস্তা গিয়ে নন্দনকানন পল্লীতে পৌঁছেছে, সেইখানে কমিশনারের টিলা। দক্ষিণ দিকের রাস্তা কলেজিয়েট স্কুল থেকে অন্দরকিল্লা, পশ্চিম থেকে পূব হয়ে দক্ষিণে বেঁকে গেছে। অন্দরকিল্লায় চাটগাঁ শহরের যাবতীয় দোকানপাট, হাসপাতাল, পুরোনো বাসিন্দাদের বাড়ি, মিউনিসি-পালিটি সব। অন্দরকিল্লার রাস্তা মোটামুটি সমতল, চাটগাঁর অন্য অংশের মতো চড়াই উৎরাই নয়।

আমাদের তখনো কোনো মোটর, কিংবা অন্য কোনো গাড়ি নেই। যানবাহনের মধ্যে সাইকেল। সাইকেলে শহরের সর্বত্র চলাফেরা করা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। উৎরাইয়ে নামতে বেশ স্বচ্ছন্দ, কিন্তু চড়াইয়ে উঠতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার অবস্থা। বয়স অল্প ছিল, দুঃসাধ্যকে সাধ্য করতে কোনো পরিশ্রমই আমলে আনতাম না।

সাইকেল নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম নন্দনকাননমুখো। কমি-শনারের বাড়ি হয়ে হাসপাতাল যাব।

সেখানে পৌঁছে টিলার নিচে এক ভদ্রলোকের বাসায় সাইকেল রেখে ওপরে উঠলাম। পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে যে মোটর ট্র্যাক করা আছে, তা দিয়ে নয়, বেপথে খাড়াই রাস্তায়।

গিয়ে দেখি ভায়োলেটদি হাসপাতাল যাবে বলে তৈরী হয়ে বসে আছে। বলল,

—তোর এই বুঝি একঘণ্টা ? এত দেরি করলি কেন ?

রুণুর মা বললেন,

—গাড়ি রয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে হাসপাতাল যেতে। মনীশ, তুমি কিসে এলে ?

—সাইকেলে, নিচে রেখে এসেছি। আশুবাবুর বাসায়। ওঁর ছেলে মানিক আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত।

—তা বাবা, বেশ করেছ। অচেনা অজানা জায়গায় রেখে এলে চুরি-টুরি হয়ে যেতে পারে।

কাগজে কলমে হয়ত পারে, কিন্তু তখনকার দিনে চুরি-চামারি কম হোত। তা ছাড়া আমাদের অন্য পরিচয় যাই থাক, স্থানীয় স্কুলের ছেলে, মুখ চেনে প্রায় সবাই। আমাদের সাইকেল চট করে চুরি যাবার আশঙ্কা কমই ছিল।

ভায়োলেটদির সাথে কমিশনার সাহেবের গাড়িতে হাসপাতাল পৌঁছতে মিনিটপাঁচেক লাগল। সেখানে গিয়ে ডঃ ঘোষের কোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়ালাম দুই জনে। বললাম,

—তুমি অপেক্ষা কর ভায়োলেটদি, আমি দেখে আসি।

—না, আমি যাব! চল।

বাধা দেওয়া বৃথা, দু'জনেই চললাম। হাসপাতালের কিছুই জানি না, কোনোদিন আসি নি। কোন দিকে যে যতীনকে রেখেছেন ওঁরা, খুঁজে-পেতে বার করতে হবে।

করিডরে একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আঙুল দিয়ে বারান্দার সব শেষের ঘরটা দেখিয়ে দিল। কিন্তু ঘর বন্ধ। আমরা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ডঃ ঘোষ, সাথে আরেকজন ডাক্তার, বেরিয়ে এলেন। আমাদের দেখে মুখে কিছু বললেন না, ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বললেন।

আমরা বারান্দা ছেড়ে তলাকার লাল সুরকির রাস্তায় দাঁড়ালাম। রেলিং দেওয়া, দক্ষিণে খানিকটা নীচু জায়গার পরে অনেক ছোটো ছোটো টিলা। মনে পড়ল। ওরই একটা টিলায় আমি আগে গেছি, কবি জীবেন দত্তর বাড়ি। তিনি সে আমলের পরিচিত কবি, চেহারাটাও কবিজনোচিত, পোশাক-আশাকও তাই। মানে ঠাকুরবাড়ির নকল। ছিপছিপে দাড়িওয়ালা বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশের

যুবাপুরুষ, আলখাল্লা আর কটকি চটি পরতেন। মোটেই মিশুকে ছিলেন না, নিজের মত থাকতেন।

ভায়োলেটদিকে আঙুল দিয়ে জীবেনবাবুর বাড়ি দেখিয়ে বললাম,

—ওখানে একজন কবি থাকেন। খুব মিষ্টি মিষ্টি কবিতা লেখেন। ভারতবর্ষ, প্রবাসীতে বেরোয়।

ভায়োলেটদি কবি বিষয়ে আদৌ কোনো উৎসাহ দেখালো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে বলল,

—এখন আর একবার খোঁজ করো না গিয়ে।

—সতীশ ঘোষকে ত দেখেছো ভায়োলেটদি। তিরিক্ষে দুমুখ মানুষ। খোঁচাতে গেলে খেপে যাবে।

—তা হলে সাথের ঐ আরেকজন ডাক্তারকে,—

ভায়োলেটদির কথা শেষ হবার আগেই ডাঃ ঘোষ ডাকলেন আমাদের। বললেন,

—তিনটে রিব ভাঙছে, তবে ভয় নাই। সিভিল সার্জন আইতেয়াছে। হেয়্ থাকতে আমগো কিছু করনের নাই। অপারেশন কইরা ইউনিয়ন করতে হইব, পেশেণ্টরে লম্বা দিন হাসপাতালে থাকতে হইব। তরা আর কি করবি এহানে, অহন যা গিয়া। পেশেণ্টরে ঘুম পারাইয়া রাখছি।

ভায়োলেটদির মন যাই বলুক, মুখ দিয়ে বুদ্ধিমতীর মতো কথাই বেরোল।

—তবে চল, তোদের বাড়ি যাই।

—চলো। বাড়ি যাবার আগে শহর ঘুরে দেখবে? একটু বেড়ালে মনও ভালো থাকবে।

ফিরে গাড়িতে এসে ড্রাইভারকে বললাম, পাহাড়তলির দিকে যেতে।

গাড়ি অন্দরকিল্লা ছাড়িয়ে কলেজ ঘুরে আস্করদীঘি পার হয়ে সাহেবদের ক্লাব ডাইনে রেখে পাহাড়তলির রাস্তা ধরল। ক্লাবের পেছনে বাটালি হিল বলে একটা পাহাড় চোখে পড়ে। চূড়ায় একটি মাত্র গাছ। সাহেবরা One Tree Hill বলে।

পাহাড়তলি যেতে রেল পাড়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সুন্দর রাস্তা, বাড়িগুলোও ছবির মতো, সবই ওপরতলার সাহেব-সুবোর আস্তানা।

ভায়োলেটদি বলল,

—এ যে বাংলাদেশের মতোই লাগছে না। যেন বিলিতি কোনো শহরের সেক্‌শন কেটে এনে বসানো।

—চাটগাঁ সত্যিই সুন্দর শহর ভায়োলেটদি। ছোট বড়ো পাহাড়, দুর্ধর্ষ কর্ণফুলী নদী, দূরে বে অফ বেঙ্গল—সদর ঘাট ধরে পোর্টের দিকে যেতে দেখবে, বাসিন্দাও কতো জাতের। বর্মী, জাপানী, পর্তুগীজ, স্কচ, ইংরেজ, চীনে,—

—স্টীমারে আসতে দুধারে যে সব গ্রাম দেখেছি তার সাথে এ শহরের কিছু মিল নেই।

—একেবারে না। তবে এখানেও গ্রামাঞ্চল আছে, সেগুলো অন্য সব গাঁয়েরই মতো কিন্তু শহর থেকে দূরে।

পাহাড়তলি রেলোয়ে কলোনী। এখানে ছিটেফোঁটা বড়ো সাহেবের আবাস থাকলেও ছোট ও মাঝারী কর্মচারীর কোয়ার্টারই বেশী। কিন্তু কোম্পানীর শহর, সুবিন্যস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে। পাহাড়তলিতে সরকারী অস্ত্রাগারও একটি আছে। উত্তরকালে প্রসিদ্ধ আর্মারি রেড যেখানে হয়—

ও অঞ্চল ঘুরে আমরা ডাকবাংলো, স্টেশনে এসে পশ্চিমে সদর-ঘাট ধরে কর্ণফুলীর ধার দিয়ে ডাবল মুরিংস পর্যন্ত গেলাম।

বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। উচ্ছ্বাস নেই, স্থির সুবিশাল অন্তহীন জলরাশি। বালু-বেলায় অজস্র সামুদ্রিক প্রাণী, জেলিফিস, রংবেরঙি

কাঁকড়া, জীবন্ত ঝিনুক। মাছ খেকো গাঙশালিক উড়ছে। বন্দরে দু' একখানা বিদেশগামী মালজাহাজ, আর স্থানীয় তৈরী স্লুপ দাঁড়িয়ে আছে। এই সব মাস্তুল পাল লাগানো এঞ্জিনহীন সমুদ্রযান তৈরী হয় চাটগাঁতেই। এদের মালিকেরা অধিকাংশই স্থানীয় বিত্তবান দু'ভাষ সম্প্রদায়। এঁরা জাতিতে মুসলমান, হয়ত অতীতে দো-ভাষীর কাজ করতেন। এখন প্রতিপত্তিশালী বণিক।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ভায়োলেটদিকে বলতে চাইছিলাম না, যে চলো এবার ফিরি, দেখলাম বেশ ভুলে আছে। কিন্তু ড্রাইভারটা ভগ্নদূত। বলল,

— এবারে ফিরলে হয়। শিগগিরই সূর্য ডুববে।

সমুদ্রের ধারে সূর্য ডুবলেও ঘন অন্ধকার নেমে আসে না। মাঝশহরে যখন প্রথম রাত, সমুদ্রের ধারে তখনো বিকেল মনে হয়। অতটা জলে খোলা আকাশের প্রতিচ্ছায়া, তা ছাড়া ছোট ছোট বীচিবিভঙ্গে ফসফরাস জাতীয় উপাদানের মালার মত আলোর খেলা। অন্ধকার জমবার অবকাশই পায় না।

ড্রাইভারের কথাই চকিত হয়ে ভায়োলেটদি বলল.

—চলো শিগগির ফিরে চলো। আমরা অনেকক্ষণ বেরিয়েছি।

ফিরতি পথে দেখলাম সদরঘাটের রাস্তায় স্ট্রীট ল্যাম্প জ্বলে উঠেছে। আমাদের মোটর হাসপাতালের চাতালে পৌঁছে গেল।

ডাঃ ঘোষ নিজে কোয়ার্টারের বারান্দায় বসেছিলেন। আমাদের বসতে বললেন। আমরা বসলাম।

ডাঃ ঘোষ বললেন,

—দেবসাহেব ফিরা আইছে। ইস্টিমার সার্ভিস ত বন্ধ, যাগো আওনের কথা আছিল তাগো মধ্যে একজন আইছে। তারে লগে লইয়াই দেবসাহেব, না যেন কেডা—

—বাবা এসে গেছেন? কিন্তু আপনার পেশেণ্ট কেমন আছে?

—অখনো ঘুমাইতেছে, জ্বর আছে। আমি অখনি অপারেশন

করতে চাই, সিভিল সার্জন না করে। আমার মনে হয় লিভার কি স্প্লীনে চোট লাগছে, ফ্যাকচার হইবার পারে। ইণ্টারনাল হেমারেজ হইছেই—তা না হইলে টেম্পারেচার উঠত না।

—ভাল হয়ে উঠবে ত?

—পন্ড্র আনা আশা নাই—তবে অপারেশন না কইরা ত কিছু কইতে পারি না।

—অপারেশন করছেন না কেন?

—জিগাও গিয়া সিভিল সার্জনেরে। আমার উপ্রালা কিনা, সবই আমার থিকা বেশী বোঝে।

বলে ডাঃ ঘোষ চুপ করলেন।

ভায়োলেটদি বলল,

—মন, চল একবার বাড়ি যাই। বাবাকে বলে দেখি।

—চলো।

আমরা বাড়ি চললাম। ডাঃ ঘোষ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

বাড়িতে ফিরে ভায়োলেটদি দৌড়ে এসে বাবার সন্ধানে গেল। আমি রুণুর সাথে বারান্দায় বসে কথা বলতে লাগলাম।

একটু পরেই আমার ডাক পড়লো। ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখি দেব পরিবারের সবাই সেখানে উপস্থিত। একটা কোণে মিত্তিরসাহেব বসে আছেন, আর তাঁর কোলে মাথা গুঁজে ভায়োলেটদি মাটিতে বসে আছে।

স্টীমার সার্ভিস বন্ধ, কি করে এলেন জিজ্ঞেস করতে বললেন,

—জলপুলিশের ছোট স্টীমার একটা, ডাক নিয়ে আসছিল। পরিচয় দিয়ে, দেবের কথা বলে, জায়গা করে নিলাম একটু। তাই ত পৌঁছতে পারলাম। কিন্তু চাঁদপুর পৌঁছে দেখি সি আর দাস সস্ত্রীক জেলেডিঙি চড়ে চলে এসেছেন। রওনা হয়েছেন দুদিন আগে অবশ্য—কিন্তু কি সাহস। বর্ষার ভরা নদী, ঝড়ঝাপটা লেগেই আছে। আর মাঝিগুলোরও সাহসের বলিহারি যাই।.. আমাকে

ত কোনো মাঝি নিতেই চাইল না। বরং বলল, দেশবন্ধুকে নিয়ে যে দু'জন মাঝি গেছে, তারা বলেই গেছে দেশবন্ধুর সাথে ডুবে মরলেও তাদের স্বর্গবাস হবে। আমার বেলা ত আর সে প্রলোভন নেই।

দেবসাহেব বললেন,

—চিত্ত এসেই ত বিপদ বাধিয়ে দিল। যা করবার তাটাই করবে চাঁদপুরে। আমরা একসঙ্গে আই. সি. এস, দিয়েছিলাম, আমি আর মুল্লী গুপ্ত (জে. এল. গুপ্ত) চাকুরি পেয়েছিলাম। চিত্ত সব কটা পেপারে বসেই নি। আজ সে কোথায়—

মিত্তিরসাহেব বললেন,

—হাসপাতালে কি খোঁজ নিয়ে এলে তোমরা ?

আমি সতীশ ঘোষের কথা আনুপূর্বিক বললাম। তিনি যে অপারেশান করতে চান এখুনি, যা এক আনা বাঁচবার আশা আছে, বিনা অপারেশানে সেটা হবে না। তবে মেজর স্যাণ্ডস অমত করেছেন।

দেবসাহেব বললেন,

—ডাক্তারদের ঝগড়া ওদের মেটাতে দাও। আর এর মধ্যে বিশুও এসে পড়বে। তাকেও পুলিশ লঞ্চে যাতে আনে, সেজন্য তার করে দিয়ে এসেছি। আর যতীনকেও বলে এসেছি—

যতীন মানে জে. এম্. সেনগুপ্ত। চাঁদপুরের ধর্মঘটের একচ্ছত্র নেতা। আজ ভাব্‌লে অবাক লাগে, ইংরেজের চাকুরে আর ইংরেজের শত্রুপক্ষের মধ্যে ভব্যতার বন্ধন তখনো অটুট ছিল।

ভায়োলেটদি তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে বলল,

—কিন্তু, কিন্তু—দেরি হয়ে যায় যদি—

—মন খারাপ করিস্ নে পাগ্‌লি, বিশু আসুক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভায়োলেটদি হতাশ হয়ে চুপ করল।

সেটা টেলিফোনের যুগ নয়, মফস্বল টাউনে টেলিফোন হয়ই নি। দেবসাহেব বললেন,

—বোসো তোমরা, আমি স্যাণ্ড্স্‌কে একটা স্লিপ্ পাঠাই। শুনি, কি করতে চায় ওরা।

বলে আপিস কামরার দিকে উঠে গেলেন।

মিত্তিরসাহেব বললেন,

—তারপর, তুমিই সুরেশের ছেলে? বাবা কি করছেন? উনি কি জানেন আমি এসে গেছি?

—তা ত বলতে পারি না। আমি আর ভায়োলেটদি এতক্ষণ হাসপাতাল, আর শহর বেড়ানো, এই করছিলাম।

—বেশ করেছো। আমি এসেই শুনেছি তোমার কথা এঁদের মুখে। বেট্সি মায়ি ত তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তুমি হ্বাইয়ের জন্যে যা করেছো আর কর্‌ছ আপন মায়ের পেটের ভাইও করে না। তুমি একদিন গিয়েছিলে বরানগরে—আমি ছিলাম না।

আমি মাথা নীচু করে রইলাম।

সত্যি বলতে কি, আমার কিছু ভালো লাগছিল না। সতীশ ঘোষ পনেরো আনা জীবনের আশা নেই বলেই দিয়েছেন। ঠোঁট কাটা লোক, অপ্রিয় কথা বলতে আটকায় না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, মিথ্যা স্তোক দিয়ে কীই বা লাভ ছিল তাঁর? আর ভায়োলেটদিকেও দেখলাম, ওই প্রাণচঞ্চলা মেয়ে আসন্ন সমূহ সর্বনাশের আভাসে কেমন মুষ্‌ড়ে গেছে। এর প্রতিকারের কোনো রাস্তাই তার হাতে নেই, ডাক্তাররা ছাড়া কারো হাতেই নেই। একজন ত প্রায় কবুল জবাব দিয়েই দিয়েছেন, আরেকজনের কাছে স্লিপ্ যাচ্ছে। জানা যাক্ তিনি কি বলেন।

ঠিক এই সময়ে মা বাবা দু'জনেই এলেন। আমি বললাম,

—ভায়োলেটদি, আমার মা—আর বাবা—

বাবাকে প্রণাম করে ভায়োলেটদি মার কাছে যেতেই তিনি

দুহাতে ওকে কোলে জড়িয়ে ধরলেন। কেন জানি না, এইবার ভায়োলেটদি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মা বললেন,—শান্ত হও মা, বিচক্ষণ ডাক্তারের হাতে রয়েছে, ওঁরা যা করবেন তার বাড়া ত আর কেউ করতে পারবে না। তুমি শান্ত হও।

রুণুর মা বললেন,—জানো ইন্দু, আমিও তাই বলছি, উনি বেট্‌সি, সবাই তাই বলছেন।

ভায়োলেটদি চোখ মুছে খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের ভিড় তার ভালো লাগছিল না। লাগা সম্ভব নয়। আমি গুটি গুটি ওর পেছন পেছন গেলাম।

দূর সমুদ্রের রেখা যে দিকে চিক্‌চিক্ করছে, সেই দিকে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে চেয়ে রইল ভায়োলেটদি। হঠাৎ কি জানি কেন চাটগাঁর আকাশ আজকে ক্ষণেকের জন্যে হলেও ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আষাঢ় মাসে এম্‌নিতে চাটগাঁয়ে প্যান্‌পেনে বৃষ্টি, নামে ত আর থামতে জানে না। মুষলধারে নয়, টিপ্‌টিপ্, ঝুরঝুর চলছে ত চলছেই। আজকের ব্যতিক্রমে চারদিক ভারি পরিষ্কার দেখাচ্ছে। ভায়োলেট একটি কথাও বলছে না, আমি গায়ে পড়ে কথা কইতে গিয়ে ওই ধ্যানমগ্নার বিঘ্ন ঘটাব কেন? আমিও চুপ করে আছি।

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ জানি না—ওই ভাবে নির্বাক হয়ে দু'জনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার মন কু গাইছিল। কে যেন আমাকে বলছিল যতীন বাঁচবে না। সেকথা আমি মুখ ফুটে বলি কি করে?

ভায়োলেটদি মুখ ফেরাল। কি শান্ত সমাহিত মূর্তি। যেন শ্বেতপাথরের স্ট্যাচু। তার মনেও কি একই প্রতীতি বাসা বাঁধছিল?

ভায়োলেটদি ডাকল আমাকে। এ কোন মানুষ? সমস্ত

তরঙ্গ-বিক্ষোভ থেমে গিয়ে শান্ত সমুদ্রের মৌন আত্মকথনের মতো লাগল ওর সুর। বলল,—মন্, তোর মনে কি হচ্ছে আমি জানি। আমারো তাই মনে হচ্ছে। যে বইটা তোকে জাহাজে পড়তে দিয়েছিলাম, ওয়েনের কালেক্‌সন, তার একটা কবিতা একটু ঘুরিয়ে মনে পড়ছে—

'His days are worth forgetting more than not.
He sings along the march
Which we march taciturn, because of dusk,
The long, forelorn, relentless trend
From larger day to huger night.'

—ঘুরোলে কোথায়? কবিতায় ত ঠিক ওই কটা লাইনই আছে।

—ঘুরোলাম সমস্ত কবিতাটার মানের দিকে থেকে। জিৎকেও ভুলব, নিজেকেও ভুলব। Larger day to huger night—সেইখানেই যাব আমরা। যাক্, চল্ দেখি, সিভিল সার্জেনের কোনো জবাব এলো নাকি দেবসাহেবের স্লিপের।

—চলো।

এ পনের মিনিট আগেকার ভায়োলেটই নয়। ঘরে গিয়ে বলল,

—কোনো খবর এলো?

রুণুর বাবা বললেন,—সিভিল সার্জেন হাসপাতালে গেছেন।

—তবে আমরাও যাই। মন্, যাবি?

—হ্যাঁ।

মিত্তিরসাহেব বললেন,—চলো হ্বাই, আমিও আসছি তোমাদের সাথে।

হাসপাতালে গিয়ে দেখি বড়ো, ছোট দুই ডাক্তারই রুগীর ঘরে। সে তল্লাটে আর কারো যাওয়া বারণ। আমরা ডাঃ ঘোষের কোয়ার্টারের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসলাম।

ধীরেন মিত্তির সাহেব, পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন,- প্যানজিকে, তোমার মাকে একটা তার পাঠাতে ভুলে গেছি। ট্রাব্‌ল্‌ড টাইম,—ভাবতে বসবেন হয়ত—

—মন্‌ গিয়ে এখুনি করে দিক। ও ত message specialist. চাঁদপুর থেকে তোমাদের ঐ ত তার পাঠিয়েছিল।

আমার মতামতের কোন আবশ্যক আছে বলে ওঁরা এবং আমি কারোরই মনে আসা অবান্তর মনে হলো। বললাম,—কি বলতে হবে?

—এই, পৌঁছে গেছি। হ্বাই ভালো আছে। এই আর কি!

—জিৎএর কণ্ডিশন প্রিকেরিয়াস, এ কথাও জানিয়ে দিস মন্‌।

মিত্তিরসাহেব একটু লজ্জিতবোধ করলেন নিজেই কথাটা না তুলে। সেরে নিলেন, বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমিও ঐ কথা বলতে যাচ্ছিলুম। হ্বাইয়ের মা সব জানেন কিনা—

হাসপাতাল থেকে টেলিগ্রাফ অফিস বেশ দূর। সাইকেল আনা হয় নি, হেঁটে যেতে হবে।

টিলা থেকে নেমেই অন্দরকিল্লার রাস্তায় একটা ফীটন পেয়ে গেলাম। চাটগাঁয়ে অন্য যানবাহন নেই, খালি ফীটন।

টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছে তার পাঠানোর পর মনে হলো বাড়ি থেকে সাইকেলটা নিয়ে যাই। কমিশনার সাহেবের গাড়িতে স-কন্যা মিত্তিরসাহেব ফিরবেন, আমি ত আর সে বাড়ি ফিরব না।

বাড়ি গিয়ে দেখি মা ফিরে এসেছেন, বাবা আসেন নি। মা জিগগেস করলেন—কেমন আছে ছেলেটি?

—ডাক্তাররা ওর ঘরে। ঘর বন্ধ। কারো যাওয়া বারণ। ভায়োলেট আর তার বাবা বসে আছেন সতীশ ঘোষের বারান্দায়। আমি মিসেস্‌ মিত্তিরকে একটা টেলিগ্রাম করতে এসেছিলাম।

—ছেলেটির বাবার তার এসেছে। তিনিও পৌঁছলেন বলে।

দেবসাহেব সুব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, সরকারী লঞ্চে আর স্পেশ্যাল ট্রেনে আসছেন। হয়ত এতক্ষণ পৌঁছেও গেছেন।

—তবে আমি কি দেবসাহেবের বাড়ি যাব?

—না রে, তিনি তোর বাবাকে তার করেছেন। আমাদের এখানেই উঠবেন হয় ত। উনি তাঁকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে যাবেন বলে স্টেশনে অপেক্ষা করছেন।

—তবে মা, আমি স্টেশন দেখে ভায়োলেটদের খবর দিই গে যাই।

—তা আয় গে। হ্যাঁরে—ছেলেটা ভালো হয়ে উঠবে ত?

—মা, সত্যি কথা শোন। সতীশ ঘোষ বলেছেন, সেও অনেক আগে, যে অপারেশন করলে হয়ত ভালো হতে পারত, কিন্তু সিভিল সার্জন বারণ করেছিলেন তখন। এখন ত দু'জনেই রুগীর ঘরে কি করছেন, কেউ বলছে না। সতীশ ঘোষের শেষ কথায় কোনো আশ্বাসই ছিল না মা, যতীন খুব সম্ভব বাঁচবে না।

মার চোখে জল এসে গেল।

—আহা বাছা রে। আর মেয়েটা, ও ত পাগল হয়ে যাবে।

—যাবে কেন, হয়েই আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য জানো, একটুও আকুলি-বিকুলি করছে না। যতীনকে ধরে রাখা যাবে না, এটা মেনে নিয়েছে। আর সাথে সাথে স্থির হয়ে গেছে হাব-ভাবে। কেমন ধন্দ ধরা মতো হয়ে আছে।

—আহা, অমন মেয়ের কপালে ভগবান এত দুঃখ লিখে রেখেছেন! আগে ভাগে দু'জনার খোলাখুলি পরিচয় নেওয়া হয়ে থাকলে ত আর ছেলেটি পালিয়ে এসে ভলান্টিয়ারিতে যোগ দিত না, এমন বিপদেও পড়ত না।

আমার অল্প বয়স, আজকের আমি হলে হয়ত বলতাম, প্রাক্তন সে কে খণ্ডাবে বলো! কিন্তু মার কথায় বললাম,—দোষ ত

যতীনেরই। ও কেন তার বাবার কাছ থেকে তাঁর বন্ধুর নামটা জানতে চাইল না? তা হলেই ত সব মিটে যেত।

—বিধিলিপি কে কাটিয়ে উঠতে পারে বল, এখন শুধু মেয়েটার কপাল, আর সতীশ ঘোষের হাতযশ—

—তিনি ত অপারেশন করতে পারলে বাঁচাতে পারবেন বলেই ছিলেন। ওই গোমুখ্য স্যাণ্ডস্ সাহেবই ত গোলযোগ বাধালো। ওপরওয়ালা! ওপরওয়ালা না ছাই—আচ্ছা, আমি যাই মা।

সাইকেল নিয়ে তরতর করে টিলার গা বেয়ে নেমে গেলাম তামাকু মণ্ডির রাস্তায়—খাড়া টিলা, মা ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, —এইটুকু সাইকেলটা হাঁটিয়ে নামাতে পারিস নে—

ততক্ষণ আমি রাস্তায় নেমে গেছি। জবাব দিতে গেলেও মা শুনতে পাবেন না।

ডাইনে বাঁক ঘুরে রেলস্টেশনে যেতে পাঁচ মিনিট। বাবা পায়চারি করছেন। সরকারী স্পেশ্যালের খবর হয়েছে, তখনো আসে নি। ওটা কোনো গাড়ির সময় নয়, স্টেশন ফাঁকা।

মিনিট দশেকের মধ্যে একখানা গাড়ি টেনে একটা এঞ্জিন এসে গেল। প্রৌঢ় যে ভদ্রলোক নামলেন, তাঁর পরনে ধুতি, গলাবন্ধ কোট, কাঁধে চাদর। হাতে ছোট একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। ছোট্ট হোল্ডলে বিছানাও ছিল গাড়িতে, নেমে কুলির জন্যে এদিক ওদিক তাকাতেই আমি গিয়ে প্রণাম করে বিছানা নিয়ে নামলাম। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—তুমি?

নাম পরিচয়, বললাম। জানালাম বাবাও এসেছেন,—ওই যে—

—সুরেশ?

—বিশু—এসো ভাই—

দুজনে অনেকক্ষণ কোলাকুলি করলেন। বিশ্বেশ্বর রায় ম'শায় বললেন,—যতীন আছে ত?

আমি যা জানি, সব বললাম। তিনি বললেন,—তা হলে হাসপাতালেই যাই আগে।

বাবা বললেন,—চলো, ফীটন দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

ফীটনে ওঁর জিনিসপত্র তুলে দিয়ে আমি আগে-ভাগে সাইকেলে বেরিয়ে গেলাম। বাবা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, শুনতে পেলাম না।

হাসপাতালে পৌঁছে ওঁর আসার খবর দিলাম।

ভায়োলেটদি বলল,—ডাক্তাররা এখনো ঘর থেকে বেরোয় নি! কি করছে ওরা ?

—ভায়োলেটদি, তুমি উতলা হয়ো না—

—না, হব না। কিন্তু একটা করে মিনিট এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। মন্, আমার মন বলছে—

—ভায়োলেটদি !

—আচ্ছা বলব না।

মিত্তিরসাহেব এগিয়ে গেছেন রাস্তার দিকে। একটু পরেই বাবা, বিশুবাবু, মিত্তিরসাহেব ফিরে এলেন।

ভায়োলেটদি বিলেতে মানুষ, তবু প্রণাম করার কথা কাউকে বলে দিতে হয় নি। বিশুবাবু ওর চিবুকে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। বললেন,—জন্মক্ষণ থেকেই তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী। ধীরু, মায়ের জন্ম ত তুমি বিলেত যাবার পরে—

—যাবার বছরই। ১৯০১ সালে।

—যতীনের থেকে তিন বছরের ছোটো।

বাবা এর মধ্যে কখন গিয়ে রুগীর ঘরের খবর নিয়ে এসেছেন। বললেন,—বিশু, ডাক্তাররা বলছে এখুনি ঘর খুলবে—

বলতে বলতেই সতীশ ঘোষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ডাঃ ঘোষ ও মেজর স্যাণ্ডস্ দু'জনেই বেরিয়ে এলেন। মুখ দু'জনারই গম্ভীর। সতীশ ঘোষের মস্করা মেশানো বাঙাল কথা বন্ধ

হয়ে গেছে। বাবাকে বললেন—পেশেণ্টের বাবা এসেছেন, শুনলাম। তিনি একবার ভেতরে যান। আর হ্যাঁ, সেই মেয়েটি—এই যে মা লক্ষ্মী—তুমিও যাও। আর কেউ না।

ভায়োলেটের হাত ধরে বিশুবাবু যতীনের ঘরের দিকে গেলেন। সতীশ ঘোষ সাথে গেলেন।

মেজর স্যাণ্ডস্ বাবার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন,—No hope, Question of time—not much though.

বলেই সাহেব যেন হাত পা ধুয়ে কর্তব্য সমাধা করে বেরিয়ে গেলেন।

আমি নিষেধ সত্ত্বেও দৌড়লাম যতীনের ঘরের দিকে। বাবা ও মিত্তিরসাহেবও আস্তে আস্তে আসতে লাগলেন।

ঘরে গিয়ে দেখি আপাদমস্তক ঢাকা যতীনের কেবল চোখ দু'টো খোলা। সে চোখে কোনো ভাবপ্রকাশ নেই। সতীশ ঘোষ মুখের কাপড় একটু নামিয়ে দিলেন।

বাবাকে, আর তাঁর সাথে ভায়োলেটকে দেখে যতীনের ঠোঁটের কোণে কী অপরিসীম তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। ঠোঁটের হাসি মেলানোর আগেই চোখ দুটো বুজে এলো। দামাল ছেলে দুষ্টুমী আর হুটোপাটির পর মায়ের বুকে যেমন পরম আশ্বস্তিতে চোখ বোজে।

এক সেকেণ্ড। সতীশ ঘোষ কাপড়টা টেনে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। বললেন, —Finished.

আমি এক ছুটে বাইরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। যতীনের বাবা আর ভায়োলেট কি করছেন দেখতে পাইনি, চাইও নি।

ফুরিয়ে গেল। রীতিমত রোম্যান্স হয়ে যা মধুর পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারত তেমনি একটি কাহিনী শেষ হলো শোকাবহ ট্র্যাজেডিতে। আমার কান্নার আবেগ ক্ষীণ হয়ে এলে চোখ মুছে উঠে দেখলাম হাসপাতালের চত্বর অনেক লোকে ভর্তি।

ভায়োলেটদিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার মা ডঃ ঘোষের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন। সেখানে মিসেস্ দেব, বেট্‌সিদি, বেবি। পুরুষেরা বারান্দার লনে চলাফেরা করছেন। শ্যালোকে দেখলাম বিষণ্ণ মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। যতীনের বাবা, আমার বাবা, মিত্তির ও দেবসাহেব এক জায়গায় মৃদুস্বরে কথা বলছেন। ডঃ ঘোষ তাঁদের কি যেন বোঝাতে চাইছেন। রুণু মেয়েদের অঞ্চলেই ঘুরঘুর করছে।

যতীনের বাবা বিশুবাবু ধীরপদে শ্যালোর কাছে গিয়ে, একবার কেশে, বললেন—পোস্ট মর্টেম যদি করতেই হয়, করুন। আমার আপত্তির কোনো দাম নেই। আমার অনুরোধ রাখতে সুরেশ কি দেবসাহেবকে আইন বিরোধী কাজ করতে হবে, কাজেই সে অনুরোধ আমি করব না। চলো সুরেশ, এবারে ওঠা যাক, মা লক্ষ্মীকে আমার সাথে রাখতে চাই কিছুক্ষণ—যদি তিনি রাজী হন। তোমার আপত্তি নেই ত ধীরেন?

সানি মিত্তির ঘাড় নেড়ে জানালেন কোনো আপত্তি নেই। বিশুবাবু ও তিনি মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেলেন। সানি মিত্তির ডাকলেন,

—ভায়োলেট, হুশই—

মার কোল থেকে মাথা তুলে ভায়োলেটদি দাঁড়ালো। এ কোন্ ভায়োলেট? অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। কখন যেন চোখ দিয়ে জল পড়েছিল, তার দাগ শুকোয়নি। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে থাকতে থাকতে চিবুকের ওপরখানায় লাল উল্কির মতো ছক কাটা দাগ পড়েছে। মুখে রক্তের চিহ্নমাত্র নেই, কেষ্টনগরের সরস্বতী প্রতিমার মুখের মতো ধবধবে সাদা।

মিঃ মিত্র বললেন—বিশু বলছিল,—

—শুনেছি বাবা। আমি ওঁর সঙ্গেই যাই।

দেবসাহেব বললেন—আমার গাড়ি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে

আসুক। তারপর সময় করে একবার সবাই এসো আমার বাংলোয়।

আমি ওদের সাথে গেলাম না। আলাদা একাই হাঁটা পথে রওনা দিলাম। হাসপাতালের গেট থেকে অন্দরকিল্লার রাস্তায় পড়বার আগে শুনতে পেলাম গেটের দরোয়ানের ঘরে একটা টোট্ট্যাঙ ডাকছে। টোট্ট্যাঙ মানে তক্ষক, চাটগাঁয়ে ঘরে ঘরে তক্ষক। তক্ষককে সাপ বলেই শাস্ত্রে লেখে, আসলে এক ধরনের বিষাক্ত গিরগিটি। জনশ্রুতি যে কামড়ালে মোক্ষম, কিন্তু তক্ষকের কামড়ে কাউকে মরতে শুনিনি ছ'বছরের চাটগাঁ প্রবাসে। অথচ প্রায় ঘরে ঘরেই তক্ষকের আস্তানা।

হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে বড়জোর দশ কি বারো মিনিট লাগে, কিন্তু আমার ইচ্ছে করছিল না তখুনি বাড়ি যেতে। পথে কোহিনুর প্রেসের মালিকের ছেলে মেদিনী দাস সহপাঠী, তার ওখানে হানা দিলাম, বাড়ি নেই। দু চারজন সদাগর, দোকানদার,—তাঁরাও আমার পরিচিত, কেউ কেউ বন্ধুস্থানীয়। চশমাওয়ালা সামসু সাহেব, খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা মীরসাহেব, বড়ো মনিহারি দোকানের মালিক আনোয়ারসাহেব। সবার ওখানেই একবার করে ঢুঁ মারতে মারতে চললাম। চাও কয়েক পেয়ালা খাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু কোথায়ও মন বসল না। কি মহার্ঘ দ্রব্য যেন আমার হেলাফেলা, খোওয়া গেছে, এমনি একটা বিষাদ মেশানো হতাশা আমাকে পেয়ে বসেছে।

অথচ যতীন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে কেউ নয়। ভায়োলেটদিকে চিনেছি খুবই অল্প কয়েকদিন হলো, প্রথম দেখার ক্ষণ থেকেই অনুগতদের দলভুক্ত হয়েছি—কিন্তু সেও আমার জীবনে আগন্তুকা মাত্র, আজ আছে, কাল চলে যাবে, শুধু মধুসিঞ্চন করে যাবে ক্ষণিক অবস্থিতির কয়েকটি মুহূর্ত।

কিন্তু ওদের ঘিরে যে নাটকটি জমে উঠছিল, আমি যে নেপথ্যে থাকলেও সেই পালার কুশীলবদের মধ্যে একজন, এই অনুভূতিই

বোধহয় আমার মনকে এমন করে নাড়া দিচ্ছিল। আমার জীবন থেকে অচিরেই সে নাটকের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যাবার মুখে, এই নিরাশই আমাকে উদাস করে দিয়েছিল। বয়স তখন অল্প, মনে একবার দাগ কাটলে সহসা মিলিয়ে যেতে চায় না। মানুষের সুখ দুঃখ ভয় ভাবনা ট্র্যাজেডি কমেডি সব তাতেই নিজের যেন বড়ো অংশ আছে বলে মনে হয়। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনপটের চলচ্চিত্রের দর্শকমাত্র হয়ে থাকার মতো। শিল্পীজনোচিত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত হয় নি।

বাড়ি ফিরলাম তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। বসবার ঘরে তখনও সবাই রয়েছেন। কি যেন একটা আলোচনা হচ্ছিল, আমি ঢুকতেই তাতে সাময়িক ছেদ পড়ল।

ভায়োলেটদি বলল,—তুমি মাকে সব বুঝিয়ে বোলো বাবা, আমি ওঁর সাথে ক'দিন হাজারিবাগ থেকে আসতে চাই।

প্রিন্সিপ্যাল রায় ভায়োলেটের হাত দুখানা ধরে ওকে কাছে টানলেন।

মিঃ মিত্র বললেন—সে ত খুব ভাল কথা। তবে আমরা ত এখন দিন দু'চার যেতে পারব না হুবাই। পোস্ট মর্টেম আছে, সৎকার আছে।

—সে ক'দিন আমিও থাকব। মন্, তুমি কবে কলকাতা যাবে?

—যত শিগগির জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

—সে ত শুনেছি কাল থেকেই হবে।

বাবা বললেন,—স্ট্রাইকের একটা মিটমাট হয়ে যাবে, আজকালের মধ্যেই, জে. এম. এমনি আভাস দিয়েছেন। তাহলেই রেল-স্টীমার যথারীতি চলবে। দেখি, খবরটা এসে পৌঁছল নাকি।

বাইরে টিলার ঘোরানো সড়ক বেয়ে মোটর ওঠার শব্দ কানে এলো। বাবা বললেন,—বোধ হয় কমিশনার আসছেন।

বলে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দু চার মিনিট পরেই দেবসাহেব আর শ্যালো ঘরে ঢুকলেন। দেবসাহেব বললেন,—সতীশ ঠিকই ধরেছিল। লিভার আর স্প্লীন রাপচার হয়ে ব্লিডিং হয়েছিল ভেতরে ভেতরে। স্যাণ্ডস্ ধরতে পারে নি।

ভায়োলেটদির হাত ধরে তাকে নিয়ে মা ভেতরে চলে গেলেন।

—খুব আর্লি অপারেট করলে হয়ত সুফল হতে পারতো, কিন্তু এখন ওসব ভাবা বৃথা।

আমার ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে বলি, তবে কেন করা হলো না অপারেশান। একটা সাহেব ডাক্তারের গোঁয়ারতুমির জন্যে জলজ্যান্ত জোয়ান ছেলেটা মরে গেল, এর কোনো শাস্তিই কি নেই?

বিশুবাবু হতভম্বের মতো বসে আছেন। সানি মিত্তির দাঁত কিড়মিড় করছেন, আর অস্পষ্ট গলায় বলছেন—স্কাউণ্ড্রেল—যত সব স্কাউণ্ড্রেল এই সাহেব ডাক্তারগুলো।

বাবা বললেন,—স্যাণ্ডসের কথা না শুনেই সতীশের স্টেপ নেওয়া উচিত ছিল।

শ্যালো বলল,—But he couldn't have done it. The Civil Surgeon is his superior in rank—

সেই লাল ফিতের জটিল গ্রন্থি! সুপিরিয়র ইন র‍্যাঙ্ক—অতএব মাতব্বর, সবজান্তা!

মনেই এসব কথা ঘুরছে, মুখ ফুটে বলতে পারছি না। বাবা এবং পিতৃস্থানীয় অতগুলো গুরুজনের সামনে ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে সহবতে বাধছিল।

শ্যালো প্র্যাক্‌টিক্যাল। বলল,—তা হলে বডি এখন আপনারা আনতে পারেন। ক্রিমেশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করার ভার—

বাবা বললেন—সে ত ঠিক কথা। মিঃ মিটার, বিশু চলো আমরা সেই সব ব্যবস্থা করিগে। আমার মনে হয় এখানে এনে তারপর শ্মশানে—

বিশুবাবু বললেন,—তার দরকার নেই সুরেশ। ওখান থেকেই সোজা যাওয়া যাবে। ভায়োলেট মা আমার যাতে ভেঙে না পড়েন, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

—না, না আমি ভেঙে পড়ব না। আমিও ক্রিমেশনে যাব।

—যাবে বৈ কি মা। আমি ত বাবা, আমি কি ভেঙে পড়েছি?

বলে প্রিন্সিপ্যাল রায় ভায়োলেটদিকে কাছে নিয়ে এলেন।

দেখলাম বাবার এবং উপস্থিত আরও কারো কারো চোখ ছল-ছল করছে। বাবা গলা ঝেড়ে বললেন,—সে হয় না। আমার এখানেই আগে নিয়ে আসি। বিশু মানো কিনা জানি না, বোধ হয় মানো না,—কিন্তু শবযাত্রার আগে আনুষ্ঠানিক কিছু কাজকর্ম আছে। পণ্ডিতমশাইকে ডেকে পাঠাই।

কৈলাস বিদ্যানিক আমাদের কলেজিয়েট স্কুলের সংস্কৃতের হেড পণ্ডিত। শাস্ত্রমতে ক্রিয়াকর্ম করে থাকেন, শিক্ষিত মানুষ, পাস-কোর্সে বি. এ. পাস। বাবার সাহেবির আড়ালে হিন্দুমতে অনুষ্ঠান-প্রবণতা ছিল, লোকাচার ত মানতেনই, হয়ত নিহিতার্থেও ক্রিয়া-কাণ্ডের সার্থকতাও মানতেন।

দেবসাহেব, মিঃ মিত্র এঁরা কিছু বললেন না, কোনো বাধাও দিলেন না। বিশুবাবু বললেন,—নিশ্চয় ডেকে পাঠাবে। আমি মানি, কিন্তু বিদেশ বিভূঁয়ে থেকে সব পালন করে উঠতে পারিনে। আর যতীনের মায়ের পর ত কোনো শাস্ত্রীয় কাজ কর্মের দরকার হয় নি। তিনিও গেছেন বহুদিন আগে, কলকাতায়।

কি কথা থেকে কি কথা এসে পড়ল। বিশুবাবুর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ওদিকে মা কাঁদছেন, ভায়োলেটদি কাঁদছে, এই সব দেখে আমারও আর একবার কান্না ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল।

বিশুবাবু বলে চললেন,—এইটুকু রেখে যতীনকে, ওর মা চলে

গিয়েছিলেন। আমিই ওর বাবা ওর মা হয়ে এতদিন আগলে এসেছিলাম। আজ আর আমার কেউ রইল না।

—আমি আছি বাবা—আজ থেকে আমি তোমার কাছে তোমার হয়ে থাকব।

বলে ভায়োলেটদি চোখ মুছল। আঁচল দিয়ে বিশুবাবুর চোখ সোজাসুজি মিঃ মিত্রের দিকে চেয়ে বলল,—কথা দিয়ে ছিলে, কথা ত ফেরত নাও নি বাবা? আমি আমার নতুন বাবার মেয়ে হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে থাকলে আর যে যাই বলুক তুমি নিশ্চয় আপত্তি করবে না।

এ সব পাগলের মতো কি বলছে ভায়োলেটদি! এ প্রস্তাবের অকার্যকর দিকটা আমার মতো অল্পবয়সীব মনে জাগলেও, বয়স্করা দেখলাম এটাকে কিছুই অসম্ভব মনে করেন নি। মিত্তিরসাহেব ঘাড় নেড়ে বললেন,

—নিশ্চয় মা। বিশু তোমাকে মেয়ে বলে নিয়ে গেলে আমি খুশী হবো। তাছাড়া হ্বাই, তুমি বড়ো হয়ে গেছ, তুমি যা বুঝ্‌বে, করবে, আমি তাতে কখনো 'না' বলতে যাব না।

শ্যালো বলল,—আমি যাচ্ছি। Proper Release যাতে হয়, সেগুলো করিয়ে নিচ্ছি।

বাবা বললেন, এই slipটা সদর এস্ ডি ওর নামে দিচ্ছি, ওটা নিয়ে যাও শ্যালো।

দেবসাহেব এসব কথায় কানই দিচ্ছেন না। বললেন, মিসেস্ দেব আর বেট্‌সি আসবার কথা ছিলো, এখনো এলো না—

আবার টিলার নিচে থেকে গাড়ি ওঠবার শব্দ হলো। দেব-সাহেবদের নামিয়ে দিয়েই গাড়ি ওদের আনতে চলে গিয়েছিলো টের পাই নি।

মিসেস্ দেব এসেই কথাবার্তার মোড় কোনমুখো এঁচে ফেললেন সব মার কাছে শুনে।

বললেন,—মিঃ রায় যদি নিয়ে গিয়ে মেয়েকে কাছে রাখেন সে ত বেশ হয়। আমি সব শুনেছি বেট্‌সির কাছে। ওরা ত রামায়ণ মহাভারত পড়েনি, তাও মেয়ে আমার সাবিত্রীকেও ছাড়িয়ে গেলো। সাবিত্রীর তবু পণ ছিল সত্যবানকে বাঁচিয়ে ফিরে আনবার—

মা বললেন,—থাক দিদি, ওসব কথা আজকে নয়। এখন ওঁরা ব্যবস্থা করছেন দেহ এখানে আনবার, এখান থেকে শুভ সংকল্প করে শ্মশান যাওয়া হবে। চলুন, আমাদের কি কি করবার আছে দেখে নিই গে।

—তোমার ত নারায়ণ টাট আছে ইন্দু, না?

মা ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ।

এমন সময় চাপরাশী এসে একখানা সরকারী লেফাপা বাবার হাতে দিয়ে গেল। বাবা পড়ে বললেন,

—স্টীমার কাল থেকে চলাচল শুরু করছে। সি. আর. দাশ চাঁদপুর থেকে মাদারীপুর চলে গেছেন। ডাটা লিখেছে।

দেবসাহেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মনে হলো। বললেন,

—যতীন কি স্ট্রাইক কল্ অফ্ করেছে?

—সেনগুপ্তের খবর আমি পেয়েছি। আজ রাত থেকেই নর্ম্যাল হয়ে যাবে জানিয়েছে।

—Principal Roy-এব ছেলেব পলিটিক্যাল Involvement নিয়ে কোনো—

—না না, কোনো আগেকার পুলিশ রিপোর্ট নেই। আর এখানকার ব্যাপার, সে শ্যালো মিটিয়ে দিয়েছে—

—ভেরী গুড্, ভেরী গুড্। আচ্ছা এবার তাহলে আমি উঠ্‌ছি। Leaving thing, entirely in you hands. সব যেন সুষ্ঠুভাবে হয়, সুরেশ।

ভায়োলেট শেষ পর্যন্ত হাজারিবাগ গেল। আমি কলকাতা ফিরলাম।